তিন টাকা আট আনা

দ্বিতীয় মুদ্রণ

উৎসর্গ

শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ দেব

'মরু-তৃষা' শেষ হ'ল,—
আমার জীবনে এলো
নূতন অধ্যায়।
ছিল না যা কোন দিন,
কোন কল্পনায়।
উৎসর্গে জুড়ে দিনু
তাই সেই নাম।
তার সাথে দিনু তাঁরে
ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

—পুষ্প

কৈফিয়ৎ

"মরু-তৃষা" উপন্যাসখানি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। কিন্তু বড্ড দেরীতে। ইহার একটা ছোট্ট কৈফিয়ৎ "মরু-তৃষা" তৃষিত পাঠক সমাজের নিকট আমাকে দিতে হইবে।

সেটা এই, পুস্তকখানি প্রকাশের সঙ্গে তাহা কর্পূরের মত বাজার হইতে উপিয়া গিয়াছিল; গ্রন্থ-কর্ত্রী সে সুসমাচারটা জানিতেন না। তখন তিনি ছিলেন হাজার মাইল দূরে। শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহাশয় পাননি হদিস! কাজেই সুধী পাঠকবর্গের সঘন-তাগিদে বইখানি পুনঃ মুদ্রণের ইচ্ছায় ওঁরা কেবল লেখিকাকে তল্লাসী করিয়াই ফিরিতেছিলেন। এবং ত্রুটীহীন এই প্রচেষ্টা পাত্তাহীন লেখিকাকে একেবারে ধরাইয়া দিল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বুকের উপর স-গৃহে। "মরু-তৃষা"র আত্মপ্রকাশের বাধামুক্ত হইল। তাঁহার প্রিয় পাঠক গোষ্ঠীর সম্মুখে সে হাজির; কানে পশিছে তাঁহার স্বাগতম বাণী।

এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে যিনি ছিলেন অক্লান্ত তাঁহাকেও আমার সহস্র ধন্যবাদ! সশ্রদ্ধ নমস্কার! ইতি শিবম্।

১৩ই শ্রাবণ
১৩৫৯ সাল

লেখিকা

মরু-তৃষা

১

সারা রাত্রি ধরিয়া দুর্য্যোগ চলিয়াছে। আকাশের বুকে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্র-বিদ্যুৎ মিলিয়া এমন কাণ্ড স্থুরু করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, মানুষের কর্ম্ম-চক্রকে অচল করিয়া দিতে তাহারা যেন ভীষণ ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সে মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে! বর্ষণের বেগ মন্দা, বাতাসের গর্জ্জন কমিয়াছে এবং মেঘের ঘন-কৃষ্ণতা ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

রমেশের শয়ন-ঘরের ঘড়িতে সশব্দে এ্যালার্ম বাজিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে লাগিবামাত্র রমেশের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল। স্প্রীংএর মত লাফাইয়া তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। করতলে দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে খাট ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া অর্গল-মুক্ত কপাট খুলিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিলেন। রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া একতালার পানে চাহিতেই দেখিলেন, নীচে গৃহিণী অমলা।

অমলা সদ্য স্নান সারিয়াছে। আর্দ্র বসন, সিক্ত কেশ। গত রাত্রের ঝড়ে তুলসী-মঞ্চের বেড়াটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অমলা তাহার সংস্কার করিতেছিল।

উপর হইতে হাঁকিয়া রমেশ বলিলেন, "রত্নাকে ডেকে দেছ ?"

স্বামীর কণ্ঠ শুনিয়া অমলা মুখ তুলিয়া চাহিল ; কহিল, "সকাল হোক !"

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "সকাল হোক, মানে ? সকাল হয় নি নাকি ? আটটায় ট্রেণ—তা মনে আছে ? বলিয়া ক'পা অগ্রসর হইয়া একটা রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "রত্না, রত্না, উঠে পড়্ মা ! কাল অত করে বলে রাখলুম—"

ঘরের ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "উঠ্ চি বাবা, এই তো সবে পাঁচটা।"

রমেশ বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "হ্যাঁ, এই সবে পাঁচটাই বটে ! সব সমান !"

সকাল হইতে এই যে-বকুনি সুরু হইল, বেলা বাড়িয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অমলা জানে। তাই অঙ্কুরেই এ বকুনির উচ্ছেদ করিতে নীচে হইতে অমলা গজ্ গজ্ করিয়া উঠিল। কহিল, "সকাল না হতেই আরম্ভ হয়েছে ! পোড়া আকাশ মানুষের সঙ্গে বাদ সাধছে, তার সঙ্গে ঘরের মানুষও আবার, কোমর বেঁধে পাল্লা সুরু করলে !"

রমেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বোধ করি, এরূপ ভাষণের জন্য ! ইহার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কহিলেন, "পাল্লা সুরু কি রকম ? আকাশের সঙ্গে আমি ষড়্ করেছি ! তোমরা ঘুমোতে পাও নি, আর আমিই ঘুমিয়ে কাতর হয়েছিলুম !"

অমলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "ঘুমোও নি কেন ? কি রাজ্য-জয়ের মন্ত্রণা করছিলে ? মানুষকে তো মেরে ফেলছিলে ! এ-ফরমাস্ সে-ফরমাস্ ! কারুর মেয়ে তো আর পাশ করে নি—কেউ কখনো কলেজে ভর্ত্তিও হয় নি ! তোমার মেয়েই যা—"

কথাটা শেষ হইল না। উপর হইতেই হাত-মুখ নাড়িয়া রমেশ প্রতিবাদ তুলিলেন, "পাশ করে নি তো! আমার মেয়ের মত ক'টা মেয়ে পাশ করেছে? এই চব্বিশ হাজার ছেলে এগজামিন দিলে—হুঁঃ! কুড়ি টাকা জলপানি—এ কি সাধারণ কথা! এর দাম যদি বুঝতে তাহলে কি আর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে।"

ব্যঙ্গের স্বরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতুম, শুনি? ইস্কুলে মাষ্টারনীগিরি!" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সদ্য অগ্নি-সংযোজিত উনানের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনা-কলহে মার খাওয়ার মত পত্নীর প্রচ্ছন্ন শ্লেষ রমেশকে হতভম্ব করিয়া দিল। বিমূঢ়ের মত অন্ধকার ঘরে অদৃশ্যপ্রায় পত্নীর দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র! পরক্ষণেই প্রচণ্ড ক্রোধে পদ-নখ হইতে কেশাগ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিপক্ষকে পাণ্টা আক্রমণে পরাভূত করিবার মত তীক্ষ্ণ কঠিন শর নিজের তূণে রমেশ হাতড়াইয়া পাইলেন না। নিষ্ফল রোষে অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া শুধু বলিলেন, "হুঁ!"

এমন সময়ে পৃথিবীর বুকে প্রভাতের আগমনের মত রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া রত্না বাহিরের বারান্দায় আসিল; এবং উঠানের ধূমরাশির পানে চাহিতেই পূর্ব-আকাশের রক্ত-রাগ তাহার সুগৌর মুখখানিকে লজ্জার আভার মত রঞ্জিত করিয়া তুলিল!

মাকে উদ্দেশ করিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "ইস্! তোমার উনুন ধরে গেছে মা! তুমি চায়ের জল চড়িয়ে দাও। আমি এখনি কাপড় ছেড়ে আসচি।"

আক্রোশের পাত্র যখন হাতছাড়া হইয়া যায়, তখন সম্মুখে যাহাকে পাওয়া যায়, তপ্ত-চিত্তে তাহারই উপরে ঝাল মিটাইয়া লইতে চায়।

অপ্রত্যাশিত ধমকের স্বরে রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "খুব হয়েছে! তোমাকে আর চা করতে যেত হবে না! যার কাজ সে পারে, হবে— নয় তো পড়ে থাকবে। কাল তো তুমি থাকবে না। যাও, এখন স্নান করে এসো, এখন অনেক কাজ তোমার বাকী।"

রত্না অবাক্! এই বাদলায় প্রাতঃস্নান, এ যেন যূপকাষ্ঠে নীত হইবার পূর্ব্বে অবগাহনের মতই আতঙ্ককর! ভীত হরিণ-শিশুর মত বিস্ফারিত চোখের চকিত দৃষ্টি পিতার মুখে ন্যস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে সে কহিল, "স্নান করবো বাবা?" স্বরে তাহার একরাশ অনিচ্ছা!

কন্যার মুখখানাকে চোখে না দেখিলেও অমলা রান্নাঘরে বসিয়া সেই বিপন্ন মুখের চেহারার আভাস পাইলেন। গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ যাবার দিন স্নান করে না! স্নান করে যাত্রা করতে নেই!" স্বরে আদেশের ইঙ্গিত।

বর্ষার আকাশে শরতের আলো আসিয়া পড়িল। রত্নার বিপন্ন মুখ পলকে আনন্দ-দীপ্ত হইল। নিষ্কৃতির উল্লাস মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে-কুণ্ঠিত স্বরকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। পিতার পানে চাহিয়া সে কহিল, "তবে আজ আর নাইবো না বাবা—"

মেয়ের মুখে যে আনন্দের ছোপ লাগিয়া আছে, রমেশের পিতৃ-হৃদয়ও যেন তাহার আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। শান্ত-মুখেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তিনি কহিলেন, "বেশ, তোমার মা যখন বারণ করছেন—"

হৃষ্টমনে ত্বরিতপদে রত্না হাত-মুখ ধুইতে গেল। বলিয়া গেল, "আমি এখনি এসে চা করবো মা!"

২

কাপড় কাচিয়া হাত-মুখ ধুইয়া মিনিট দশেকের মধ্যে রত্না প্রস্তুত হইয়া আসিল। রান্নাঘরের রোয়াকে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ছোট কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া রত্না চা করিতে বসিতেই অমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ঠাকুর-ঘরে নমস্কার করতে গেলি নি খুকী ?"

কাঁচ-মাচু মুখে রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। "যাচ্ছি মা" বলিয়া পা বাড়াইতেই রমেশ বাধা দিয়া কহিলেন, "পরকালের কাজ করতে আর বৃষ্টিতে ভিজে ছুটতে হবে না। যিনি সে-চিন্তা নিয়ে আছেন, তিনিই তা করুন।"

এতক্ষণে রমেশের মনের উষ্ণতার হেতু বুঝা গেল। সকালে ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে পত্নীকে বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখিয়াই যে মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইহাতে এতটুকু সংশয় ছিল না। তাই দ্বিতীয়বার পিতার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া ভিজিয়া ছাদের উপর ঠাকুর-ঘরে যাইতে রত্নার সাহস হইল না। ধপ্ করিয়া কাঠের পিঁড়িটায় বসিয়া অধোমুখে পিতার জন্ত সে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

নিকটেই বেতের মোড়ার উপর রমেশ বসিয়াছিলেন। মেয়ের হাত হইতে চায়ের কাপটা লইয়া তিনি কহিলেন, "তোমার চা আজ না করলে নয় ? জানো, কত কাজ বাকী ! নাও, চট্ করে খেয়ে নাও।"

চকিত নেত্রে রত্না হেঁসেলের দিকে তাকাইল। অমলা তখন স্বামী ও কন্যার দিকে পিছন করিয়া উনানে বাতাস দিয়া ডাল-ভাত ফুটাইতে ব্যস্ত। রত্না দেখিতে পাইল না, সে-মুখে অনুমতি বা অসম্মতি— কিসের চিহ্ন !

রমেশ চা খাওয়া শেষ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "ও কি, এখনো তুই চুপ করে বসে! তোর চা জুড়িয়ে গেল।"

"খাচ্ছি" বলিয়া রত্না উষ্ণ বাষ্প-উত্থিত গরম চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজিতেই বাড়ীতে চাঞ্চল্য জাগিল। কন্যার চা হইতে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কাজগুলা নিষ্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রমেশের হাঁক-ডাক, সোর-গোলের অন্ত রহিল না! এটা টানিয়া ওটা নামাইয়া গোছালো কাজটাকে অগোছালো করিয়া, অগোছালোকে গোছ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন যে, সামান্য ত্রুটি ধরিয়া সমস্ত বাড়ীখানা যেন রসাতলে যাইবে! যাহাকে সামনে পাইলেন, তাহাকেই বড়-গলায় শুনাইয়া দিলেন, সে পাড়াগেঁয়ে ইস্কুল নয়। কলকাতার নামজাদা কলেজ—ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া সেখানে হাজিরা দিতে হয়।

গোপাল কৃষাণ জানিতে আসিল, ইষ্টিশানে দিদিমণি পায়ে হাঁটিয়া যাইবে—না, অকলু মোড়লের গো-যান আসিবে?

রমেশ আকাশের দিকে চাহিলেন। দিবালোক স্ফুটতর হইলেও মেঘ-ভার কাটে নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে আকাশ ফুঁড়িয়া বর্ষণ হইতে পারে! সেই সম্ভাবনাই যেন বেশী। কিন্তু কালই তিনি রত্নার জন্য বর্ষাতি-কোট কিনিয়া আনিয়াছেন—গ্রামের লোকের সম্মুখে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জামা গায়ে দিয়া মেয়ে যদি পথ হাঁটিতে না পাইল, তবে দু'কুড়ি টাকা খরচ করিয়া ও-জামা কিনিবার সার্থকতা কি?

ইতস্ততঃ করিয়া রমেশ কহিলেন, "অকলুর গাড়ীতে আর কি হবে গোপাল? পোয়াটাক পথ তো।"

গোপাল মাথা নাড়িল—"সে কি বড়বাবু, এই জল-কাদায় রত্নাদিদি হেঁটে যাবে কি! না, না, ও গরুর গাড়ীই ভালো।"

"তা ভালো! জুতোটা নতুন! তবে জলের জন্য ভাবি না, চল্লিশ টাকা খরচ করে কাল ওয়াটারপ্রুফ কিনে এনেছি। এ তো আমাদের এখান নয় গোপাল যে, টোকা মাথায় দিয়ে মাঠ পার হবে—চলতে বাধবে না! এ হলো কলকাতা সহর, বুঝলে কি না!"

প্রতিবেশী রামময় বসিয়াছিল। গৃহস্থ প্রতিবেশী। রমেশের আনুকূল্যে পুষ্ট। অভাবের সংসার! রমেশের কৃপায় অনেক অভাব মোচন হয়। সকাল হইতে গোটা দশেক মুদ্রা কর্জ্জের প্রত্যাশায় সে আসিয়া বসিয়াছিল। সোৎসাহে রমেশের কথার সমর্থন করিয়া সে কহিল, "নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে বড়বাবু? সে-বার কলকেতায় গেছনু! ইস্, কি ভীড়। মানুষকে যেন চিঁড়ে-চেপ্টা করে দিচ্ছে! মোটর, টেরাম, বাস—কোন্ মুখ দিয়ে কোন্টা কখন ছুটে ঘাড়ে এসে পড়ে তার ঠিকানা নেই। ব্যাটাদের প্রাণে ভয় নেই যে, শ্রীকৃষ্ণের একটা জীব হত্যা হবে! আর ভগবান্কে কি তোয়াক্কা করে? সে সব কায়দা-কানুনই আলাদা!"

রমেশ কহিলেন, "মিথ্যে বলো নি রামময়! তোমাদের মত মানুষ কি সেখানে থাকতে পারে? তবে রত্নার কথা আলাদা! এই দেখ না, আমার ইস্কুল থেকে তো দশটা ছেলে পাঠিয়েছিলুম, ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হলেও জলপানি পেলে না কেউ! আর রত্না একেবারে কুড়ি টাকা করে জলপানি পাবে।"

রামময় কপালে হাত ঠেকাইয়া কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইল, ঠিক বুঝা গেল না। উল্লসিত কণ্ঠে কহিল, "রত্না-মাকে আপনি এখনো ঠিক চেনেন নি বড়বাবু, আমি চিনেছি! মা আমাদের স্বয়ং মা-সরস্বতী!

আপনাদের মেয়ে হয়ে এসেছেন! উনি কি সাধারণ মেয়ে! এমন পিরতিমের মত মুখ, আর দুধে-আলতা রং—এ কি মানুষের হয় গা!"

কন্যা-গর্ব্বে রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সস্মিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তা তুমি কিছু মিথ্যে বলো নি রামময়! কলকাতার সবচেয়ে বড় কলেজ—বুঝেছো কি না, সরকারী কলেজ—রত্নার দরখাস্তখানি আগে নিয়েছে। এখন ত্যাখো না, চিঠি দিয়েছে—" বলিয়াই বুক-পকেট হইতে একখানা কার্ড টানিয়া বাহির করিলেন, করিয়া কহিলেন, "কি রকম লিখেছে একবার ত্যাখো—" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে পাইল না!

অ-দৃষ্টপূর্ব্ব ছাঁদে সাজিয়া রত্না পিতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। তাঁতের একখানা রঙিন শাড়ী বেড় দিয়া ঘুরাইয়া নূতন ছন্দে পরিয়াছে, কিন্তু আনাড়ী হাতে শাড়ী পরিবার সুনিপুণ কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহাতেই সে মহা-খুশী! নূতন-কেনা হিল্-উঁচু জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ে বর্ষাতি-কোট—এ সবে যতখানি উল্লাস, গর্ব্ব এবং গৌরব তার চেয়ে অনেক বেশী!

মেয়ের পানে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, "এই যে রেডি! এসো, অকলু গাড়ী এনেছে।"

গাড়ীর নাম শুনিয়া রত্নার মুখে মেঘের ছায়া পড়িল। সে কহিল, "গরুর গাড়ীতে যাবো বাবা?"

পিতা কন্যার মন বুঝিলেন। তাঁহারও আন্তরিক ইচ্ছা, এই ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বিবর্ণ আকাশ—এ বৃষ্টি-মেঘ অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামশুদ্ধ নর-নারীর বিস্মিত কৌতূহলী ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া পিতা-পুত্রী পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিবেন! সে চলার একটা সুখ আছে, গর্ব্ব আছে। কিন্তু বিপদ বাধাইল করুণা-প্রত্যাশী রামময়।

হাত জোড় করিয়া জিদ ধরিয়া রামময় কহিল, "সে হয় না বড়বাবু।

কথা রাখুন, এমন মেম-সাহেব সেজে মা-লক্ষ্মী কি ভিজতে পারে? মাকে আপনি ওই ছাউনি-গাড়ী করেই নিয়ে যান।"

গো-যানে চড়িবার রুচি রত্নার ছিল না। রমেশও গো-শকটে চড়িবার পক্ষপাতী নন। তথাপি ঢেঁকি-গেলার প্রবচনের মত সময়ে সময়ে অন্যের অনুরোধে জোয়ালে মাথা গলাইতে হয়! হাজার স্বাধীন হইলেও মানুষ সব সময়ে নিজের ইচ্ছায় না চলিয়া অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়! ইহা মানুষের ধর্ম্ম।

মাকে প্রণাম করিতে রত্না রান্নাঘরের দিকে গেল। রমেশ কোটের পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া রামময়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন—"এই নাও রামময়! এর বেশী এখন পাচ্ছি না। আর তোমাকে দেওয়াও তো অনেক হয়ে গেল।"

ত্রস্ত হস্তে নোটখানা গ্রহণ করিয়া রামময় কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিল। কহিল, "কি করি বলুন বড়বাবু। মেয়েটার সূতিকা-রোগের জন্যই। জামাই যা পায়, নিজের মেস-খরচা রয়েচে—পঞ্চাশ টাকা মাইনে! হদ্দ দশ টাকা পরিবারের রোগের খরচা বলে দেয়, অথচ আমার নিজের অত কাচ্ছা-বাচ্ছা, মেয়েটারও ছানাপোনা—"

রামময়ের বহুবার-বর্ণিত-দুঃখের কাহিনী আর এক বার শুনিবার স্পৃহা রমেশের ছিল না। তার অবকাশও নাই! ত্বরিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "বুঝেছি সব। আরও কিছু দিতুম। কিন্তু এখন বড্ড টানাটানি—রত্নার জন্যে অনেক টাকা—"

মাথা নাড়িয়া কৃতার্থ কণ্ঠে রামময় কহিল, "সে তো নিশ্চয়, আমরা তাই বলাবলি করি বড়বাবু, যে আপনি সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ, রত্না-মা আমাদের হাকিম হয়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে!"

এক-গাল হাসিয়া রমেশ কহিল, "কি যে বলো রামময়! মানুষের

উপকার করা ত ভাগ্য! তা রত্না—হ্যাঁ, সে কথা খুব ফেল্‌না বলো নি। ওর বুদ্ধি যা—বড় হলে দেখো, ও বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী হবে। ওর ঠিকুজিতেই লেখা আছে—"

"এ্যাঁ! তাই নাকি? বলেন কি বড়বাবু! আহা, ভগবান্ যেন দয়া করে সে-দিন পর্য্যন্ত আমায় বাঁচিয়ে রাখেন!"

রমেশ হাঁকিলেন, "হলো রে রত্না?"

"যাই বাবা!" বলিয়া রত্না ডাকিল, "মা!"

অমলা আসিল না। সকরুণ স্নেহ-কণ্ঠে কহিল, "এই চচ্চড়িটা সাঁত্‌লে নিচ্চি রে, তোর কাকা-কাকীকে ততক্ষণ নমস্কার করে আয়।"

কথাটা রত্নার মনঃপূত হইল না। উষ্মার সহিত সে কহিল, "দেরী হয়ে যাবে মা!"

অমলা বলিল, "না, না আর দেরী হবে না। শুভ কাজে যাত্রা মা—প্রণাম করবে বৈ কি!"

মায়ের কথায় অঙ্গনের শেষে বাঁশ-বেড়া-দিয়া-ভাগ-করা উঠানের আগড় ঠেলিয়া রত্না খুল্লতাত-গৃহে পদার্পণ করিল।

হরিশের গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার। গরম খিচুড়ীটাকে উঃ-আঃ করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। রত্নাকে দেখিয়া কহিলেন, "ইস্, আমার বীণাপাণি মা যে!" পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিলেন, "ওগো, দ্যাখো, কে এসেছে!"

প্রতিভা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রত্নাকে দেখিয়া সস্নেহ হাস্যে কহিলেন, "চল্‌লি মা! আটটার গাড়ী বুঝি? তবু রোজ একবার ক'রে আসতিস্, ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াতিস্, কত উপকার হতো।"

ক্লিষ্ট হাস্যে রত্না কহিল, "তোমাদের সকলের জন্য বড্ড মন কেমন করবে কাকিমা!"

কাকিমা কহিল, "ও মা তা আর করবে না? তবে পড়ার চাপে মা-কাকিকে চিঠি দিতে ভুলো না বাছা।"

রত্না কহিল, "হরিমতী কোথায় কাকিমা?"

"এই যে ভাঁড়ারে পান সাজচে মা! ও মতি, ওরে, তোর রত্নাদি এসেছে যে!"

ক্ষুদ্র আহ্বান-ধ্বনি কানে পৌছিবামাত্র হরিশের ছেলে-মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। সমস্বরে সকলেই কহিতে লাগিল, "রত্নাদি' চল্‌লে?"

"হ্যাঁ ভাই চল্‌লুম।" রত্নার স্বর আর্দ্র।

বুলু কহিল, "রত্নাদি', ওটা কি জামা পরেছো?"

বিজ্ঞের মত হাস্য করিয়া হরিশ কহিলেন, "হুঁঃ, দেখেছিস্ কখনো অমন জামা? একে ওয়াটার-প্রুফ বলে। বৃষ্টিতে গায়ে জল লাগবে না।"

"সত্যি রত্নাদি'?" উৎসুক চক্ষে ভাই-বোনেরা রত্নার জামায় হাত বুলাইতে লাগিল।

হরিশ কহিলেন, "ওটা তো আমিই দেখে সে-দিন দাদাকে কিনে দিলুম। চল্লিশ টাকা দাম পড়লো।"

হরিমতী অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে কহিল, "ওঃ বাবা!"

প্রতিভা কহিল, "সেখানে কোথায় থাকবি রত্না?"

"হোষ্টেলে থাকবো কাকিমা। মেয়েদের হোষ্টেল আছে কি না! তা গোটা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আমার সবশুদ্ধ মাসে খরচ পড়বে।"

হরিমতী দুই ভ্রূ ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিল, "এত টাকা!"

হরিশ কহিলেন, "তা মানুষ হতে যাচ্ছে। মেয়ে কেমন! কুড়ি টাকা করে জল পানি পেলে! চালাকি নাকি?"

রত্না কহিল, "হরিমতীকে আপনি পড়তে দিলেন না কাকাবাবু, বড় হয়েছে বলে। কিন্তু ও আমার চেয়ে এক বছরের ছোট।"

হাসিয়া হরিশ কহিলেন, "ও কালো মেয়ে। ওর এতখানি বিদ্যেতে কি হবে? তুমি জন্মেছ সরস্বতী-প্রতিমা হয়ে, তোমার কথা আলাদা!"

কথায় কথায় বিলম্ব হইতেছিল, সহসা ও-দিক হইতে রমেশের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তোর হলো রে রত্না? সব-তাতে দেরি করিস্!"

রত্না ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কাকাবাবু, তোমাকে নমস্কার করবো না?"

"আমি খাচ্ছি। তুই হাত তুলে নমস্কার কর্ মা, তাতেই হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই এবার ফার্ষ্ট হবি।"

রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "এ্যাঁ, এখনো হয় নি?" বলিয়া নূতন-কেনা হাত-ঘড়িটার পানে চাহিলেন—"ইস্! ভয়ানক লেট হচ্ছে।"

হরিশকে প্রণাম করিয়া রত্না ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "কাকিমা!"

কপালের উপর মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া কাকিমা কহিল, "পায়ে জুতো! ছুঁস্ নি মা! রান্নাঘরে যাবো, অম্‌নিই নমস্কার কর্।"

আর একবার তাড়া দিয়া রমেশ কহিলেন, "কুইক্! কুইক্! ও কি, জুতো খুল্‌ছিস্ কেন রত্না? না, না, অমনি সেরে নাও। দামী মোজা-জোড়া নষ্ট হয়ে যাবে। উঃ, বড্ড লেট্ হচ্ছে!"

পিতার কথায় রত্না থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জুতা আর খোলা হইল না।

রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "নাও, গাড়ীতে উঠে বসো।"

কুণ্ঠিত মুখে রত্না কহিল, "মাকে নমস্কার করে আসি বাবা!"

বিরক্ত রমেশ কহিলেন, "খুব হয়েছে! আর নমস্কার করতে হবে না। ট্রেণ মিস করবো শেষে!"

মিনতি-ভরা কণ্ঠে রত্না কহিল, "এখুনি ছুটে আসবো বাবা।"

রমেশ রাগিয়া উঠিলেন, "না, না। আর এক-মিনিট দেরী নয়।"

৩

রেলগাড়ীতে বসিয়া সারা পথ রত্নার মনে এই চিন্তাটাই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল যে, আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া আসা হইল না! শ্রাবণের মেঘ-মেদুর আকাশের মত দারুণ বিষণ্ণতা তাহার চিত্তে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া রত্না আজ মায়ের মলিন মুখ দেখিয়াছে! এখন মানস-নেত্রে দেখিতে লাগিল, সেই ম্লান মুখ কন্যা-বিরহ-বেদনায় আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বর্ষণোন্মুখী হইয়াছে! কামরার জানালার দিকে মুখ করিয়া রত্না চাহিয়া ছিল—সম্মুখে পলকে-অপসৃয়মান বর্ষার বারি-স্ফীত নদী, প্রান্তর, শস্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ তৃণাচ্ছন্ন গোচারণ-ভূমি! আর্দ্র বায়ু তাহার উপর দিয়া বেগে প্রবাহিত! দিবালোক যেন বেদনাতুর! আকাশ যেন এই মাত্র কাঁদিয়া-কাটিয়া চোখ মুছিয়াছে; কিন্তু ক্রন্দনের কালিমা-রেখা মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই! সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রত্নার দুই চোখ সলিলার্দ্র হইয়া উঠিল। নির্ব্বাসিতের চক্ষে যেমন আজন্মের স্নেহদাত্রী ধরিত্রীর প্রতি-ধূলিকণা অকস্মাৎ পবিত্র হইয়া ওঠে, সুখ-দুঃখের বাস জন্মভূমির শুষ্ক গুল্ম-লতা অবধি অপূর্ব্ব মমতা-রসে সিক্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তরকে আপ্লুত করিয়া তোলে, তেমনি এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য ভালোবাসার পারাবারে স্নান করিয়া গ্রাম, পথ, শস্য, ক্ষেত্র সব-

কিছু আচম্বিতে তাহার সহিত নিবিড় সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া বসিল। এবং এই স্নেহের আদান-প্রদান এইখানেই শেষ হইল না। রত্নার চোখের সম্মুখে তাহারা যেন রত্নার সুদূরস্থিত মাতৃ-মুখের বিষণ্ণতা মাখিয়াই করুণ চোখে চাহিয়া রহিল! একা শূন্য গৃহকোণে ম্লান সন্ধ্যার মত স্তব্ধ মূর্ত্তিতে মা বসিয়া আছেন! সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের কাতরতা রত্না সব-কিছুর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল! গাড়ীর চাকার ঘর্ষণের ছন্দানুগতির কলরব যেন অস্ফুট কান্নার সুরে তাহার দুই কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল!

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে মনে মনে একাধিক বার সে কহিল, বড্ড ভুল! বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা। আসবার সময় একটিবার তোমাকে দেখা—

এমনি উতল আবেগের অশ্রুপ্রবাহ তাহার নবীন-জীবনের রাঙা উষাকে মেঘাবৃত করিয়া রাখিল। আনন্দের দ্যুতিতে চরাচর সমুজ্জ্বল না হইয়া নিগূঢ় অভিমানের বেদনায় যেন মুখ ঢাকিয়াছে!

বহুক্ষণ রত্না এমনি আবিষ্টের মত বসিয়াছিল। আরও হয় তো কতক্ষণ থাকিত, আবেশ ভাঙ্গিল পিতার কণ্ঠস্বরে!

ব্যস্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, লিলুয়া পার হয়ে এলুম রে! গাড়ী হাওড়ায় পৌছলো বলে।”

পথে ছোট-বড়-মাঝারি ষ্টেশনগুলাতে গাড়ীর গতিতে নিমেষবিরতি ঘটিতেছিল। এসব ষ্টেশনে যাহারা উঠিতেছিল নামিতেছিল, তাহাদের ভীড়—কোলাহল-কলরব রত্নার তন্ময়তাকে ডিঙ্গাইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই! অত্যন্ত অবহেলায় সব-কিছু তাহার মনের বাহিরে পড়িয়াছিল, এতটুকু কৌতুক বা আগ্রহ সংগ্রহ করিতে পারে নাই!

অসংখ্য রেল-লাইনের লেখাজোখার মধ্যে দিয়া লাইনের দু’পাশে রাশীকৃত গাড়ীর ভীড় পার হইয়া রত্নার ট্রেণ হাওড়ায় আসিল। গাঢ়

নিদ্রার মাঝে স্বপ্নের জমজমাটি-ভাঙ্গার মত আকস্মিক আঘাতে রত্নার চিন্তাও নিমেষে নিঃশেষ হইয়া গেল।

বিরাট প্লাটফর্মে গাড়ী প্রবেশ করিতেই রত্না যেন চমকিয়া উঠিল! কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্য ও-দিকে অজস্র আলোক-ধারায় দশ দিক্ যেন প্লাবিত করিয়া দিয়াছে!

রত্নার দেহ-মনের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত বিপুল বিরাট ষ্টেশনের প্রচণ্ডতার মাঝখানে তাহার বিস্ময়াহত অন্তর নিমেষে নিমগ্ন হইয়া পড়িল! বিমূঢ়-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রুদ্ধনিশ্বাসে সে শুধু চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই! এখানকার মানুষ-জন যেন কাজের নেশায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! এই বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিরাম-বিরতিহীন উৎকণ্ঠা সময়ের প্রতি পল-অনুপলের উপর নির্ম্মম ভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছে! তাহার অদৃশ্য উগ্র তাড়নায় প্রত্যেকেই যেন অস্থির, চঞ্চল! কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ ছুটিতেছে। পৃথিবীর কত জাতি কি ব্যস্তসমস্ত ভাবেই না যাতায়াত করিতেছে! পাশের অপরিচিতের প্রতি কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই! কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, কে কোথায় চলিয়াছে—জানিবার এতটুকু ঔৎসুক্য নাই! দৈবাৎ যদি কোনো নেত্র-কোণ হইতে এতটুকু কৌতুক বা বিস্ময়-দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য কোথাও ন্যস্ত হয়, সে ঐ পলক-মাত্র! বাতাসে-ওড়া ধূলার মত চকিতে আবার তাহা গুলাইয়া সরিয়া যায়। এতটুকু মনের স্পর্শ পায় না!

আত্মবিস্মৃতির বিভোরতায় রত্না বীচি-বিক্ষুব্ধ বারিধির মত এই অখণ্ড চঞ্চলতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনের নূতন অধ্যায়ের প্রবেশ-পথে হঠাৎ এই কর্ম্ম-ছবির অচিন্ত্যনীয় বিরাট রূপ তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে কেমন আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

পিতার স্পর্শে রত্নার হুঁস হইল। চকিতে মনে হইল, উদ্‌ভ্রান্তের মত এমন করিয়া থাকা শোভন নয়!

ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "চলো।"

রমেশ কহিলেন, "তাই তো ডাকচি।" বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে কুলীর মাথায় লগেজ-পত্র। রমেশ কহিলেন, "একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক, কি বলিস্? হাজার হোক, অত-বড় কলেজে গিয়ে উঠতে হবে। এ্যাঁ!"

"বেশ, তাই চলো।" বলিয়া রত্না পিতার সহিত প্ল্যাট্‌ফর্মের বাহিরে আসিল।

ট্যাক্সিতে চাপিয়া রমেশ কহিলেন, "কলকাতা হলো বড়লোকের জায়গা, বুঝলি! এখানে কঞ্জুষপনা করলে লোকে হাসবে। না হলে আমাদের এই সামান্য মালপত্র একখানা রিক্সা কি ঘোড়ার গাড়ী হলে চলে যেতো। কিন্তু তাতে প্রেস্‌টীজ থাকে না!"

মাথা নাড়িয়া পিতার কথার অনুমোদন করিল।

উৎসাহিত হইয়া রমেশ কহিলেন, "তোমার মার মাথায় এ-সব ঢোকে না। বলে, আমরা যেমন! আরে বাপু, তা বললে কি চলে! যেখানে যে-রকম দস্তুর! তা ছাড়া মানুষকে সব সময়ে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়! পাঁচ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা পাবার কোন সুযোগই ত্যাগ করতে নেই। বরং সেই মাহেন্দ্রক্ষণটুকু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমার বাবা দিন-মজুরী করতো, আমি কেন সদর-আলা হবার স্বপ্ন দেখবো? হুঁঃ! এ সব কথা অচল।"

রত্না নীরব রহিল। তাই বলিয়া রমেশের কথা বন্ধ হইল না।

তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন, "আমার ইস্কুলের ছেলেগুলো কল কাতায় পড়তে এলো, আর আমার মেয়ে স্কলারশিপ্ হোল্ড করে নন-

কলেজিয়েট হয়ে লেখাপড়া করবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না! এ আমি ভাবতে পারি নি রত্না! হুঃ! তোমার মা, দু'দিন তাঁর কষ্ট হবে! তার পর সয়ে যাবে। সইতে হবে।"

মৃদু স্বরে রত্না কহিল, "মা বড় একা! ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে!"

"আরে বোকা মেয়ে, সে কথা কি বুঝি না! তুমি আমার শুধু মেয়ে নও! ছেলে নেই—তোমাকে দিয়ে ছেলের অভাব আমি পূরণ করতে চাই! কাজেই নিজেদের সুখের দিকে চেয়ে তোমার ভবিষ্যৎ দেখবো না? নিজের একটুখানি তৃপ্তির জন্য এত বড় গৌরব হারাবো, এ কোনো মতেই হতে পারে না মা!"

ট্যাক্সি আসিয়া কলেজের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। অগত্যা রমেশের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল।

কন্যাকে লইয়া রমেশ যেখানে ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, তার বাঁ-দিকে লনের মধ্য দিয়া সরু পথ—সেই পথে খানিকটা গিয়া সোপান-শ্রেণী। রত্নার পা কাঁপিতেছিল, বুকের মধ্যেও দুরু দুরু স্পন্দন! কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রমেশ মৃদু হাস্য করিলেন। রত্না আর একটু সরিয়া পিতার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

একদল মেয়ে ভর্ত্তি হইয়া বাহিরে আসিল, উৎসাহে দীপ্ত তাহাদের মুখ-চোখের পানে চাহিয়া রত্নার ভিতরের আড়ষ্টতা শিথিল হইয়া আসিল। অভিভূত মন ধাক্কা খাইয়া নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া লইল।

মেয়েকে লইয়া রমেশ অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। জানাইলেন, কার্ড পাইয়া তিনি আসিয়াছেন।

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! হ্যাঁ, আপনার মেয়ের সীট কলেজে আছে। হোষ্টেলেও থাকবার সুবিধা হবে। আপনি তো সেখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার?"

রমেশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হ্যাঁ! আমি এ-বার দশ জন ছাত্র পাঠিয়েছিলুম, সকলেই ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "তার চেয়ে বলুন আপনার মেয়ের কথা—উনি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছেন।"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সোৎসাহে তিনি কহিলেন, "আমি ওকে কোচ করতুম। ফার্ষ্ট ই হতো! তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এগজামিনের আগের দিনে হলো ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস!"

রত্না ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বাপের পানে তাকাইয়া রহিল। মনের অলিগলি খুঁজিয়াও সে মনে করিতে পারিল না, কবে তাহার জ্বর হইয়াছিল! তবে বছর দুই পূর্ব্বে দিন কয়েক সর্দ্দিজ্বরে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল বটে! কিন্তু সেটাকে কোন মতেই পরীক্ষার ফলাফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অথচ সত্যানুরাগী বলিয়া পিতার মনে বিশেষ গর্ব্ব আছে!

হেড ক্লার্ক মাথা নাড়িলেন—"দুঃখের বিষয়! আশা করি, আগামী পরীক্ষায় আপনার কন্যা আমাদের কলেজের নাম রাখবেন।"

রমেশ কহিলেন, "সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার মেয়ে বলে বলছি না, আমি তো জানি ওর শক্তি!"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "খুবই আনন্দের কথা। হ্যাঁ, তাহলে আপনার কন্যার এখানকার অভিভাবক কে হবেন? তাঁর নাম দিতে হবে। মানে লোকাল গার্জ্জেন! এখানে আপনার কোন আত্মীয়?"

"আত্মীয়!" রমেশ চমকিত হইলেন! এত বড় সহরে এমন কেহ নাই, যাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন, এ চিন্তা যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার মত মনে বিঁধিল! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুঞ্চিত ভ্রূতে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। নাম মনে পড়িল। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে

কহিলেন, "নিশ্চয় আছেন! তিনি হলেন মিষ্টার এস, পি, গোস্বামী বার-এট্-ল! তাঁর নাম লিখে নিন, তিনিই আমার মেয়ের লোকাল গার্জ্জেন।"

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! তা মিসেস্ গোস্বামীর সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপালের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। মিষ্টার গোস্বামী আপনার কি-রকম আত্মীয় হন?"

রমেশের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল। একটা ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "তিনি আমার বাল্য-বন্ধু।"

ভর্ত্তির নজর-আনা, মাহিনা, হোষ্টেলের চার্জ্জ—সব-কিছু দিয়া খাতায় সই দিয়া বিধিমত ব্যবস্থাগুলা সুসম্পন্ন করিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তার পর রত্নার দিকে চাহিলেন। বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! খোদিত প্রতিমার মত রত্না বসিয়া আছে। এত দিন স্নেহে, শাসনে, আদরে, উৎসাহে গড়িয়া-পিটিয়া যাহাকে তিনি বড় করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কন্যাহীন শূন্য পুরীতে তাঁহাকে ফিরিতে হইবে! রমেশের দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। কন্যাকে ছাড়িয়া একটি দিনও তিনি কখনও দূরে থাকেন নাই!

আর্দ্রকণ্ঠে রমেশ ডাকিলেন, "রত্না—"

রত্না পিতার হাত চাপিয়া ধরিল। এই পরিচয়হীন নূতন আবাসে পরের সহিত এখন হইতে তাহাকে বাস করিতে হইবে পিতামাতাকে ছাড়িয়া, ঘর-দ্বার ছাড়িয়া! এ কথা মনে হইতেই এক অজানা আতঙ্কে বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইল! মুখে একটুও স্বর ফুটিল না! শুধু অদম্য রোদন-বেগকে ভিতর দিকে ঠেলিতে দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া কাঠের মত সে কঠিন হইয়া রহিল।

নিরুদ্ধ স্বরকে পরিষ্কার করিয়া রমেশ কহিলেন, "কোন ভয় নেই খুকী! অনেক বন্ধু পাবি। বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। আর আমাদের নিয়মিত চিঠি দিতে ভুলিস্ নে! সাবধানে থাকবি! বুঝলি! এখানে দেখবার বা বলবার আপন-জন তো কেউ নেই।"

নতমুখে ঘাড় হেলাইয়া রত্না জানাইল, সে সব বুঝিয়াছে।

রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ, এখানকার গার্জেন তোমার করে গেলুম এস, পি, গোস্বামীকে। তিনি খুব ভালো লোক। মস্ত বড় ব্যারিষ্টার।"

সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা নেত্রে রত্না পিতার মুখের পানে তাকাইল।

রমেশ সে চাহনির অর্থ বুঝিলেন। কহিলেন, "সত্যপ্রসাদ রে! তোর সুকুদিদির ছেলে। ওঃ, আমার সঙ্গে কি ভাবই না ছিল— ছোটবেলায় মামার বাড়ী যখন আসতো, আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতো না। সে বকুলতলাও গেছে! সুরেন অধিকারীও মরেছে!" রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

রত্না কিন্তু পিতার দীর্ঘ বক্তব্যের এতটুকু অর্থ ভেদ করিতে পারিল না। বিমূঢ়ের মত তাঁহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

রমেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন, "সে থাকে ওই উড্বার্ণ পার্কে। মস্ত-বড় বাড়ী করেছে। তিনিই তোমার দেখাশোনা করবেন।"

সত্যপ্রসাদ সম্বন্ধে এই বিশদ পরিচয়েও রত্নার বোধোদয় হইল না।

রমেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন। মেয়ে বুঝিতে না পারুক, বুঝিবার ভাণ করিলেও সম্ভ্রম বজায় থাকিত!

রমেশ কহিলেন, "ভুলে গেছ মা! আমাদের জ্যোতিষবাবু—বড় তরফের ভাগনী—তোমার সুকুমারী দিদি—তাঁর স্বামী। তিনি কলকাতায় মস্ত এটর্ণী ছিলেন না?"

এতক্ষণে রত্না পিতার বাল্যবন্ধুর হদিস পাইল।

সুকুমারী দিদি? অর্থাৎ জমিদারের বড় সরিকের মেয়ে! ছেলেবেলায় মায়েদের সঙ্গে একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। এবং গৃহে ফিরিয়া মা ও পাড়া-পড়শীর দল যখন সমস্বরে সুকুমারী ঠাকুরঝির সৌভাগ্য-ঐশ্বর্য্যের জয়-গানে গৃহকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পৃথিবীর এক-ভাগ স্থল ও তিন-ভাগ জল পড়া-মুখস্থ ভুলিয়া হাঁ করিয়া রূপকথা শোনার মত সুকুমারী দিদির অদৃষ্ট-বৈভবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে তার তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! প্রাচীনারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, জন্মান্তরের সুকৃতি! কেবল জন্ম-মুহূর্ত্তে শুভলগ্নের সংযোগ থাকিলে মানুষ এমন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে! রত্নার তখন শুধু মনে হইয়াছিল, এমনিতর একটা নক্ষত্র কি তাহার জন্ম-কুণ্ডলীতে নাই? সে কি সুকুমারী দিদির মত বিভবশালিনী হইতে পারে না? এখন পিতার কথায়·বিদ্যুতের চকিত-আলোয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিমেষে দেখিয়া লওয়ার মত অতীতের সেই সব ঘটনা চোখের সাম্নে নিমেষের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে রত্না কহিল, "হ্যাঁ, মনে আছে! তাঁকে তুমি আমার অভিভাবক করে দিলে?"

খুশী-ভরা কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ মা। তিনিই এখানে তোমার খবরাখবর নেবেন।"

রাত্রির মেঘাবৃত আকাশ সকালের উজ্জ্বল আলোতে হাসিয়া-ওঠার মত রত্নার বিষাদ-মলিন মুখের উপরে আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল।

রত্না কহিল, "তাঁকে বলে দিয়ো, তিনি যেন মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে যান!"

"বলবো মা! এখন তবে আসি।"

রত্না নত হইয়া পিতার পদধূলি লইল। রমেশ সে-ঘর ত্যাগ করিলেন।

রত্না বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পথে ঐ চলিয়াছেন পিতা! পিতার মূর্ত্তি যতক্ষণ না দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল, নিষ্পলক নেত্রে খোদিত প্রতিমার মত স্থির হইয়া রত্না সে চলন্ত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল।

খোলা জানালার দিক দিয়া ম্লান রৌদ্রের ঝলক আসিয়া রত্নার পাশের দেওয়ালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সেই মৃদু আভা রত্নার অবয়বে পড়িয়া তাহাকে যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ব্রোঞ্জের পুতুলের মত অপূর্ব্ব-সুন্দর করিয়া তুলিল!

ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। রত্নাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমিই হোষ্টেলে থাকবে? তোমারই আসবার কথা ছিল?"

অস্ফুট কণ্ঠে রত্না কহিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার নাম?"

"রত্নাবলী।"

লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ গুহ রত্নার দিকে চাহিয়া সপ্রশংস-নেত্রে কহিলেন, "গ্রামের মেয়ে এমন সুন্দর হয়! আশ্চর্য্য!"

রত্নার লজ্জা করিতে লাগিল। গ্রামে নিজের গৃহে আত্মীয়-স্বজনের মুখে বহু বার সে তাহার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে! কিন্তু এমন করিয়া সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন শোনে নাই। নত মুখে সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মিস্ গুহ কহিলেন, "এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো। তুমি টেনিস খেলতে জানো?"

মৃদুকণ্ঠে রত্না কহিল, "না।"

"আচ্ছা, দু'দিনে শিখে নেবে'খন। এসো।"

কারারুদ্ধ বন্দী যেমন নিঃশব্দে প্রহরীর অনুগমন করে, তেমনি ভারাক্রান্ত চিত্তে নিরুৎসাহ মুখে রত্না মিস্ গুহর অনুসরণ করিল।



নামের স্লিপ পাঠাইবার অনেকক্ষণ পরে মিষ্টার গোস্বামীর ঘরে রমেশের ডাক পড়িল।

সুবৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবলের উপর রাশীকৃত কাগজ-পত্র ভাঁজে-ভাঁজে রক্ষিত—কতকগুলা খোলা; পাশে ঘোরা-শেল্‌ভে মোটা মোটা আইনের বই। মিষ্টার গোস্বামী নিবিষ্ট মনে মকর্দ্দমার ব্রীফ্ পড়িতে-ছিলেন। ব্রীফে এমন তন্ময় যে ডান হাতের কাছেই পাইপ পড়িয়া আছে, তুলিবার খেয়াল নাই!

রমেশ ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার নূতন জুতার মস্ মস্ শব্দে ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, রমেশের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই! বোধ হয় জানেন না, জুতার এ-আওয়াজ ফ্যাশন দুরস্ত নয়! তাই কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া মিষ্টার গোস্বামীর টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া রমেশ তাহাতে বসিলেন।

মিষ্টার গোস্বামী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, "আপনি কি চান?" 'আপনি' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপ-করা ব্রীফের কাগজগুলার উপর চশমা-পরা চক্ষু-যুগলের দৃষ্টি আবার আঁটিয়া গেল।

রমেশ একটু থতমত খাইলেন। এমন সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁহার পক্ষে কেমন কঠিন হইল! এ ধরণের প্রশ্নের জন্য তিনি

মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না; তাই মনের মধ্যে যা কিছু গড়িয়া-পিটিয়া উৎফুল্ল চিত্তে এ ঘরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বাতাসের মুখে এলো-সূতার মত জট পাকাইয়া সে সবের খেই হারাইলেন।

এক দিন যাহার সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকে—কিশোর-চিত্তের অমল ভালোবাসা, স্বার্থ-কলুষহীন নিবিড় প্রীতি—দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সময়-স্রোতের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে অকস্মাৎ কোথায় যে তাহা মাটী চাপা পড়িয়া সমাহিত হয়, তাহার উপর নূতন নূতন কত সৌধ গড়িয়া ওঠে, তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না! কিন্তু সেই ধ্বংস-স্তূপ যদি ভূগর্ভের আশ্রয় হইতে মাথা তুলিয়া অকস্মাৎ নিজের দাবী জানায়, তখন সে মস্ত হেঁয়ালি হইয়া ওঠে!

সত্যপ্রসাদের মুখ দিয়া এমন প্রশ্ন বাহির হইবে, রমেশের তাহা কল্পনার অতীত ছিল! কিন্তু ইহা লইয়া দোষারোপ করিতে গেলে অবিচার করা হয়। সমসাময়িকদের মধ্য হইতে যে উঁচু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, চারি পাশের দৃষ্টি গিয়া নিবদ্ধ হয় সেই উন্নত শিরে। কিন্তু তাহাদের পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত ক্বচিৎ-দৃষ্টি মুখগুলাকে চলার পথে সব সময়ে মনে থাকে না। কালের ধর্ম্মই বিশিষ্টকে বুকে ধারণ করিয়া রাখা—তথাপি মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণের দিকটা কেহ সহজে মাড়ায় না। তাই মানুষ প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, এটা অহমিকার তাচ্ছল্য!

কুণ্ঠিত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমি হরিপাল থেকে আসছি।"

"হরিপাল! ও! হুঁ, জানা জায়গা বটে! তা আপনি কি করেন?" কথাগুলা অবশ্য গোস্বামী-সাহেব মুখ না তুলিয়াই কহিলেন।

মুখ নীচু করিয়া রমেশ উত্তর দিল, "ওখানকার স্কুলের আমি হেড মাষ্টার।"

আবার সেই নীরবতা। মিষ্টার গোস্বামী কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া

গেলেন। সে জমাট-কঠিন স্তব্ধতা রমেশের আত্মমর্য্যাদার উপর যেন রূঢ় আঘাতের মত ভয়ঙ্কর হইয়া বাজিল! নিজেকে এমন ছোট করিয়া ফেলিবার কি প্রয়োজন তাঁহার ছিল? এ দুর্ম্মতি তাঁহার কেন হইল। যে-মানুষ তাঁহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, বন্ধু বলিয়া সেই ধন-মর্য্যাদাশীল ব্যক্তির পরিচয় ধরিয়া কেন তিনি নিজের সম্ভ্রম-বৃদ্ধির অমন প্রয়াস পাইলেন? নিজের কাছেও হাস্যাস্পদ হইলেন। কঠিন ধিক্কারে দুঃসহ আত্মগ্লানিতে রমেশের আহত অন্তর বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "আমি তাহলে আসি।"

কাগজের উপর তেমনি দৃষ্টি রাখিয়াই গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "কৈ, প্রয়োজনের কথা, দেখা করার উদ্দেশ্য—কিছুই তো বললেন না আপনি!"

রমেশ বুঝিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে। সাক্ষাতের কৈফিয়ৎ একটা দিতে হয়। ব্যারিষ্টার-সাহেবরা দামী সময় অযথা ব্যয় করেন না!

পরিত্যক্ত আসনে রমেশ আবার বসিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন!"

"চিন্‌তে পারবো!" মিষ্টার গোস্বামী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া বিস্মিত চোখের সন্ধানী দৃষ্টিতে রমেশের পানে মুহূর্ত্ত-কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। পরিচয় বলুন ত!"

তীব্রতর অপমানে রমেশের কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত জলন্ত লোহার মত আরক্ত হইয়া উঠিল।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মাপ করবেন, এসে আপনাকে ডিস্‌টার্ব করলুম!"

গোস্বামী-সাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা হোক, কিন্তু আপনি যে বললেন, চিন্‌তে পারবেন। পরিচয় দিন তো!"

রমেশের মুখ দিয়া ফশ্‌ করিয়া কথা বাহির হইল, "আমার মনে হয়, সে কথা আর উত্থাপন না করাই ভালো।"

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি! অথচ এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন! দেখা করতে আসার প্রয়োজন বলুন।"

রমেশের মনে যেন আগুনের জ্বালা! তিনি বলিলেন, "এই অপেক্ষা করা ভুল হয়েছিল। চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল!" রমেশ থামিলেন। ইচ্ছা করিয়া না হইলেও আত্মসম্ভ্রমের ক্ষুণ্নতা অজ্ঞাতে কণ্ঠকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কণ্ঠের এ বিকৃত স্বর নিজের কানে বিশ্রী লাগিল। নিক্ষিপ্ত শরকে ফিরানো যায় না। তাই যত দূর সাধ্য, কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া রমেশ কহিলেন, "নমস্কার, তবে আসি।" কথাটা বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিষ্টার গোস্বামী বিস্ময়ে অবাক্‌। জীবনে অনেক রকমের মানুষ দেখিয়াছেন! ভাবিলেন, হয় তো কোনো প্রত্যাশা লইয়া ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন! তার পর প্রত্যাশার কথা বলিতে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়াছে! কিন্তু হরিপালের নাম করিলেন! তাঁহার বাল্যকালের শত-স্মৃতি-ঘেরা হরিপাল!

তাই তিনি বলিলেন, "আপনি হরিপালের কথা বলছিলেন যে!"

রমেশের মনে হইল, একটা তীব্র শ্লেষে গোস্বামীকে বিঁধিলেন। তিনি বলিলেন, "হরিপালের কথা মনে আছে?"

মিষ্টার গোস্বামী বলিলেন, "বিলক্ষণ! সেখানে আমার মামার বাড়ী! কত বার সেখানে গেছি—তখন অবশ্য মা বেঁচে ছিলেন। ছোটবেলার কথা।"

রমেশের মুখে যেন মুক্ত বাতায়ন-পথের আলো আসিয়া পড়িল। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন, "হরিপালে একটা মস্ত পোড়ো বাড়ীর কথা আপনার মনে আছে? কবিরাজের বাড়ী?"

প্রসন্ন হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "নিশ্চয় আছে। আচ্ছা, প্রমাণ দিচ্ছি! একটি বউ সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আহা, বউটি ভারী ভালো ছিল—কত কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা আম খেতে দিত আমাদের।"

রমেশের মনের মেঘ লঘু হইয়া স্বচ্ছ হইল। তিনি কহিলেন, "আর সেই বাড়ীর পাশের মাঠে বকুল গাছ—কোকিলের ছানা?"

ছেলেবেলাকার স্মৃতির দোলায় ব্যারিষ্টার-সাহেবের গম্ভীর মুখ হাসির জ্যোৎস্নায় যেন ঝল্ মল্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "নিশ্চয় মনে আছে। আচ্ছা, আপনি হরিপালে থাকেন, সেই বকুল গাছটার খবর কিছু জানেন?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন, "সে বছর পুরী গেছলুম। সেখানে একটা মঠ আছে। সে মঠে বকুল গাছ দেখিয়ে সেখানকার পাণ্ডারা বললে, "এইখানে বসে মহাপ্রভু মালা জপ করতেন, প্রণাম করুন। পাণ্ডার কথায় প্রণামী-সমেত প্রণামটা বকুল গাছকে নিবেদন করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল হরিপালে আমাদের বকুল গাছের তলায় আড্ডার কথা।"

পূর্ণিমার চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘ সরিয়া দশ দিক্ যেন আলোর প্লাবনে ভরিয়া গেল!

রমেশের ম্লান মুখ নিমেষে দীপ্ত হইয়া উঠিল। উল্লসিত অন্তরে তিনি কহিলেন, "গাছটার সঙ্গে আপনার আর কিছু মনে পড়ছে না?" ঔৎসুক্যভরা দুই চোখের দৃষ্টি ব্যারিষ্টার-সাহেবের গুম্ফহীন মুখের উপর রমেশ মেলিয়া ধরিলেন।

গোস্বামী-সাহেব হাসিলেন। ঝর্ণার জলে সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া যেমন দ্যুতি বিকিরণ করে, তেমনি অনাবিল আনন্দ-দীপ্তিতে তাঁহার মুখ ঝল্ মল্ করিয়া উঠিল। বলিলেন, "নিশ্চয় পড়ছে! কত কথা!" বলিয়া তিনি একটু থামিলেন। বোধ করি, এই নীরবতার মধ্য দিয়া স্মৃতির গহনে চকিতের জন্য এক বার চাহিয়া লইলেন। সেখানকার বিস্মৃত, অবিস্মৃত, মলিন, দীপ্ত, ছোট-বড় সংখ্যাতীত ছবি!"

বলিলেন, "আচ্ছা এক জনের খবর দিতে পারেন? তার নাম বল্টু। ভালো নামটা মনে পড়্ছে না! তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। মামার বাড়ীর দেশের সে ছিল আমার প্রধান সঙ্গী। যেমন চমৎকার গান গাইত, তেমনি নাচতো! যাত্রার দলে রাণী সাজতো। কি চমৎকার! সে ছিল আমার আদর্শ। আপনি চেনেন তাঁকে?"

ঈষৎ হাসিয়া রমেশ কহিল, "চিনি।"

"ও! এবার বুঝেছি। সে আপনাকে পাঠিয়েছে? হ্যাঁ, তা সে এখন কি করছে?"

"ইস্কুলের হেড্মাষ্টারী।" রমেশের চোখে-মুখে হাসির বিদ্যুৎ-রশ্মি!

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন, "আপনি—মানে, তুমিই বল্টু! আ রে! চেনার জো কি, বলো! এমন দাড়ি-গোঁফের সখ হলো কোথা থেকে? সে দুধে-আলতা রং তামা মেরে গেছে!"

আনন্দের হাসিতে বল্টুর ওষ্ঠাধর ভরিয়া উঠিল। কৈশোরের বন্ধুকে গোস্বামী-সাহেব অবহেলা করেন নাই! এই উপলব্ধিই রাত্রি-শেষে আকাশের রাঙা উষার মত মনের সব অভিমান-কুণ্ঠা-উষ্মাকে ধুইয়া অন্তরকে স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল করিয়া দিল।

রমেশের দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া গোস্বামী-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। কহিলেন, "তার পর বণ্টু, হঠাৎ এত দিন পরে আবির্ভাব। আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল কবে? তখন বোধ হয় আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠেছি—বয়স আমার চৌদ্দ—সেই ফিরে এসেই মা মারা গেলেন।" গোস্বামী-সাহেবের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

প্রশান্ত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমার বয়স তখন পনেরো, মনে আছে, আমি এণ্ট্রান্সে স্কলাসিপ পেয়েছি! তোমার মামাবাবু তোমার কাছে কত সুখ্যাতি করলেন। তার পর সেই বকুল-তলাতে নাচ শেখা! তুমি পারতে না! সুরেন অধিকারী—"

গোস্বামী-সাহেব সবেগে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "খুব মনে আছে। ছেলেমেয়েরা এখন সব নাচ শিখছে। মিসেস্ গোস্বামী "নৃত্যশালা" স্কুল খুলেছেন—নাচে তাঁর ভারি ঝোঁক! কিন্তু আমি তো দেখি শুনি—মনে মনে হাসি! সে কালের কথা ভাবি। এক দিন তোমার সঙ্গে নাচছিলুম, মা এসে পড়লেন। উঃ, কি বকুনী! সে কি দুর্গতি! শেষে মার অবধি খেলুম। আচ্ছা বণ্টু, সেই সুরেশ, না সুরেন অধিকারী—তার যাত্রার দল আছে তো? মিত্তির-পাড়ার সেই আখড়া?"

"না! সে সব কোথায় ভেঙ্গে-চুরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। খুঁজলে এখন তার কঙ্কালও পাবে না ভাই! সেই হরিপদ গাঙ্গুলী—সে এখন কোথায় একটা গানের ইস্কুলে বুঝি চাকরী নিয়েছে। দেশের পাট মুছে দেছে। সে সুরেন অধিকারীও মরেছে। তার দলবলও শেষ! রমেশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল। রমেশ কহিলেন, "আর ভাই, দেশের

লোক এখন খেতে পায় না! দু'বেলা দু'টো অন্নের সংস্থান করবে, না আমোদ-প্রমোদ করবে?"

"তা সত্যি! বলিয়া গোস্বামী-সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এবং এই স্বল্প নীরবতার ফাঁক পাইয়া মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষণেকের জন্য অসংখ্য স্মৃতি। সে-সব স্মৃতির কোন রেখা মস্তিষ্কের কোন কোণে আঁকা আছে কি না, ব্যারিষ্টার-সাহেবের মনে সংশয় ছিল।

তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, বিমনা ভাব লক্ষ্য করিয়া রমেশ কহিলেন, "ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ—বছর বছর একটা-না-একটা—সেকালের বর্গীর আক্রমণের চেয়েও দুর্দ্দান্ত হয়ে মানুষকে নাস্তানাবুদ করছে। এদের তাড়াবার কোন রাস্তাই খোলা নেই। এই আমি একটা স্কুলের হেডমাষ্টার—কত ছেলে আমার হাত দিয়ে পার হচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কীর্ত্তিমান্ না হয়েছে, এমন নয়। একজন শুনেছি মস্ত বৈজ্ঞানিক। সাগর-পার পর্য্যন্ত খ্যাতি এসেছে। কিন্তু দেশকে এরা বর্জ্জন করেছে। সাত পুরুষের বাস্তু-ভিটা সংস্কারের অভাবে পড়ে ভূমিসাৎ হচ্ছে। শোবার ঘরে বট-অশথের জঙ্গল। কে দেখবে? সে ছাতি কোথা? সে ছাতি কার আছে? এমনি করেই আমরা আমাদের শ্রী-সম্পদ হারাচ্ছি!"

ঈষৎ শুষ্ক হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোমার অভিযোগ মিথ্যে নয় বন্টু! কিন্তু দোষী কি এক-পক্ষই? গ্রাম কি এখনো সে গোঁড়ামি ত্যাগ করেছে? সেই যে অজরামর অচলায়তন, তার সংস্কার কৈ? বিদ্রোহ মনোভাব নিয়ে তার সঙ্গে হাতাহাতি না করে কেউ যদি চলে আসে, সে তো সনাতনকে সম্মান দিয়েই এসেছে।"

অল্প উত্তেজিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তোমার কথা অযথার্থ না হলেও যুক্তি বলে মানা চলে না। আপনার জন মন্দ বলেই পরিত্যাজ্য হবে,

এ যে ঘোর স্বার্থপরের কথা! আমি যাদের মধ্যে দিয়ে এসেছি, আমার বড় হবার মূলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যেমন করে যে ভাবেই হোক না কেন, তাদের অল্প বিস্তর চেষ্টা সাহায্য ছিল তো! সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেকে কেউ গড়ে তুলতে পারে না। অনুকূল কোথাও কিছু ছিল বই কি! ভালো বীজ হলেও সার-মাটী না পেলে, জল না পেলে খোরাক সে পাবে কোথা বাঁচবার জন্য? বিচার তার পরে—কিন্তু যাক্ তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করছি!"

গোস্বামী-সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন, "আর এক দিন এ-সব আলোচনা হবে। এখন তোমার কাজের কথা বলো!" বলিয়াই তিনি কহিলেন, "সুরেন অধিকারীর কথা থেকে আর একটা কথা মনে পড়ছে।"

রমেশ কহিলেন, "কি কথা?"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "আজকাল এখানে একটা কীর্ত্তনের রেওয়াজ উঠেছে! যেন মহাপ্রভুর রিফর্ম্ম যুগ। বড় বড় ঘরে খোলের আওয়াজ হচ্ছে! কিন্তু সে বছর য়্যাসেমব্লির ফেরৎ দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে গেছলুম। সুরেন অধিকারীর "মাথুর" পালা আমার মনে ছিল। হ্যাঁ গান শুনলুম বটে সাধকের কণ্ঠে! সে সুর দেহকেই শুধু রোমাঞ্চিত করে তোলে নি—মনে হচ্ছিল, অধ্যাত্ম-রাজ্যের এক সূক্ষ্ম অনুভূতি-লোকে নিঃশব্দে যেন টেনে নিয়ে চলেছে! সেই যে কবি বলেছেন, 'সুরের হাওয়ায় জগৎ গেল ছেয়ে'—তা যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি হলো!"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "রক্তের ধারায় যে বীজ রয়েছে, তুমি তাড়াবে কি করে? অনুকূল আবহাওয়া পেলেই সে সবল হয়ে মাথা চাড়া দেয়। তোমার দিদিমা, দাদামশাই তো শেষ জীবনটা শ্রীবৃন্দাবনেই কাটিয়ে গেছেন।"

মাথা নাড়িয়া গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "যা বলেছো। আজ অনেক দিন পরে সেই পুরানো দিনগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি। দিদিমা ঠাকুর-ঘরে তাঁর গোপাল-গোপীবল্লভকে প্রণাম কচ্ছেন! সেই পাথরের ঠাকুরকে প্রণাম করে কি আনন্দই তিনি পেতেন! জীবন্ত গোপাল আমি লুব্ধ নেত্রে সেই পাথরের রেকাবীর মাখন-সন্দেশগুলোর দিকে চেয়ে আছি! দিদিমাকে খুশী করতে পাথরের মেঝেয় ঢুম্ ঢুম্ করে মাথা ঠুকে প্রণাম কচ্ছি। যাক, অনেকখানি সময় ধরে রাখলুম বাজে কথায়! এবার বলো—"

"বলি।" বলিয়া রমেশ থামিলেন।

সত্যপ্রসাদ রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "কি এত ভাবচিস্ বল্টু, আমি সেই সত্য রে—কোকিলের বাচ্ছার জন্য তোর কম খোসামোদ করেছি। ইস্কুলের টীমে নাম-করা ফুটবল-প্লেয়ার, অথচ গাছে চড়তে জানতুম না!"

রমেশ দীপ্ত-মুখে কহিলেন, "সেই সব ভেবেই তো আগে এখানে এলুম। মেয়েটাকে কলেজে দিলুম কি না!"

বিস্মিত কণ্ঠে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোর মেয়ে?"

"হ্যাঁ। রত্না। কুড়ি টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছে। সারা জীবন শুধু পরের ছেলেই পিটে পিটে পড়িয়ে এলুম! একটা সাধ তো!" রমেশের কণ্ঠে যেন জবাবদিহির সুর!

গোস্বামী-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "ভেরী গুড গার্ল! কুড়ি টাকা! বলিস্ কি বল্টু! আমার ছেলেদের সকলে ভালো বলে—তারাও যে পায় নি—শুধু ঐ ফার্ষ্ট ডিভিসন আর লেটার! বেশ করেছিস্ কলেজে দিয়ে!"

কন্যা-গর্ব্বে রমেশের বুকখানা ভাদ্রের নদীর মত স্ফীত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিলেন, "হোষ্টেলে রাখলুম। কিন্তু আমার তো আসবার বড় একটা সুবিধা হবে না! এখানকার অভিভাবক বলে তোমার নামটা দিলুম! ওকে একা রেখে যাচ্ছি। মনটা—মানে, কখনো তো—"

সব কথা রমেশ বলিতে পারিলেন না। গোস্বামী-সাহেব কথার মাঝখানেই খুশী কণ্ঠে বলিলেন, "দ্যাট্‌স্ রাইট! খোঁজ-তল্লাস নেবো বই কি—নিশ্চয় নেবো। মিসেস্ গোস্বামীকেও বলে দেবো। এখন তিনি বাড়ী নেই! না হলে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতুম।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "অন্য সময় হবে'খন। রত্না চমৎকার গান গায়। তার গান মিসেস্ গোস্বামীর নিশ্চয় ভালো লাগবে।"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তাই না কি? মিসেস গোস্বামী তো তা হলে লুফে নেবেন। হ্যাঁ বল্টু, একটা কথা—" বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার এক ছেলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছে। একটি ব্যারিষ্টার। পরিচয় দিয়ে রাখলুম। বাল্যবন্ধু, অথচ ছেলে-মেয়েদের পরিচয় আমরা জানি না, লজ্জার কথা!"

রমেশ হাসিলেন, "নিশ্চয়।"

৬

উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে ইন্দ্রপুরীর কথা রত্না পড়িত, ভোজবাজির মত তাহাই যেন অকস্মাৎ চোখের উপর সুপরিস্ফুট হইয়া তাহাকে একেবারে দিশাহারা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আড়ম্বরহীন সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্তা আঠারো বছরের এই তরুণীর কাছে গোস্বামী-ভবনের ঐশ্বর্য্য-বিভব শুধু কুবের-সম্পদ্ বলিয়াই মনে হয় নাই, ইহার মোহ দুর্বার শক্তিতে অনুক্ষণ তাহাকে টানিতেছে! রত্নার

মনে হয়, মানব-জীবনের সকল সার্থকতা সব আনন্দ যেন সেখানে নিবিড় হইয়া আছে!

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রত্না দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। ইহার মধ্যে অনেক বার গোস্বামী-ভবনে যাতায়াত করিয়াছে। প্রথম ক্ষেপে গোস্বামী-সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তার পর তিনি আসিতেন না, বার-কয়েক মিসেস্ গোস্বামী আসিয়াছিলেন। এখন রত্নাকে গোস্বামী-গৃহে লইয়া যাইবার ভার পড়িয়াছে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার অনিল গোস্বামীর উপর।

মুসলমানদের পর্ব্ব উপলক্ষে কলেজ ক'দিন বন্ধ থাকিবে। সেদিন শনিবার। রত্না উৎসুক চিত্তে প্রত্যাশিত নেত্রে গোস্বামী-ভবনের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কল্পনা চাটার্জি আসিয়া রত্নার পাশে দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিয়াই সে রত্নার সন্ধানে আসিয়াছিল। রত্নার তন্ময় মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ব্যঙ্গের প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না, কহিল, "এই যে, ব্রজবিলাসিনী রাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্!"

রত্না চমকিত হইল। কাঁচুমাচু মুখে অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "কি রকমের ঠাট্টা কল্পনা!"

হাসিয়া কল্পনা কহিল, "এ ঠাট্টা নয়। সত্যি কথা বলছি। গোঁসাই-সাহেবের বাড়ী তোর কাছে যে বৈকুণ্ঠপুরী!"

"কেন? আমি কি করেছি?" রত্নার স্বর আহতের মত।

"কি না করেছিস, সেইটেই বরং বল্ রত্না! আমি একা নই—হোষ্টেলের সব মেয়েরাই এই কথা বলে।

রত্নার বিস্ময় এবার রোষে পরিণত হইল। গায়ে পড়িয়া কল্পনার বন্ধুত্ব করার মাঝে প্রচ্ছন্ন টিট্‌কারী থাকে—রত্না তাহা জানে বলিয়াই কল্পনাকে

সে সর্ব্বদা এড়াইয়া চলে! কিন্তু দুষ্ট-গ্রহের প্রভাব যেমন নানা উপায়ে ক্ষীণ করা গেলেও মুছিয়া ফেলা যায় না, রত্নার নিরীহতার মর্ম্মভেদ করিয়াও কল্পনার বিদ্রূপগুলা তেমনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে!

বিরক্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, "তাঁদের ধন্যবাদ! আমার জন্য এতখানি ব্যাকুল! আমি যাই আমার আপনার লোকের বাড়ী—"

"তা যা না—কে তোকে বারণ করছে? আর বারণ করলে তুই শুনবিই বা কেন? ঝর্ণা কিছু মন্দ বলে নি!"

ঝাঁজিয়া রত্না উত্তর দিল, "তার ভালো কথা শোনবার আমার কোন দরকার নেই।"

"ইস্, একেবারে মেশিন গান্। তা তোর গোঁসাই-বাড়ী তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না! এত মার-মুখী কেন! কর্ গে যা না রাই সেখানে তোর রাস-বিলাস!"

লজ্জায় রত্নার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ঈষৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে কহিল, "আমি বুঝি। আমার হিংসেয় সকলে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীহার আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, "তোদের কিসের ঝগড়া হচ্ছে?"

মুখ বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "ঝগড়া নয় ভাই! আমরা তো অমন আ দেখ্লা নই যে কিছু দেখলেই ভীরমি যাবো! আমার বাবা—বলে—"

রত্না কোন উত্তর না দিয়া কল্পনার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুম্ দুম্ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

নীহার কহিল, "কি হলো রে রত্নার?"

ঠোঁট বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "হার ম্যাজেষ্টি! কি মেজাজ! আমি ঠাট্টা করেছিলুম, "গোস্বামীদের বাড়ী নিয়ে, তাই চোখ-মুখ রাঙিয়ে কি তড়পানি!"

নীহার হাসিল। কহিল, "ওঃ এই! দুষ্মন্তর ভাবনায় শকুন্তলা আত্মভোলা হয়েছিল—আমিও অনেকক্ষণ থেকে দেখেছি। কিন্তু ঋষি দুর্ব্বাসা হয়ে তুই আসবি, তা জানতুম না!"

কৃত্রিম ক্রোধে কল্পনা কীল তুলিল! কহিল, "দূর, আমি দুর্ব্বাসা হবো কেন? তেমনি দাড়ি আমার? নাঃ, তোরা রত্নার রূপের সুখ্যাতি করে করে ওকে মাথায় তুলেছিস! অজ পাড়াগেঁয়ে—এলো যখন, কি করে শাড়ী পরতো! মা গো, মনে হলে এখনো হাসি পায়!"

প্রতিবাদ করিয়া নীহার কহিল, "আমি কক্ষণো মাথায় তুলি না! প্রিন্সিপ্যাল ওকে একটু ভালবাসে, তাই! কিন্তু সত্যি বলছি, আমার মাসিমার দেওরের মেয়ে ওর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর!"

"ঢের—ঢের সুন্দর অনেক আছে। নিজেকে উনি ভাবেন, ক্লিওপেট্রা!"

শিখা আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "কি রে, তোদের কিসের কমিটী বসেছে?"

কল্পনা কহিল, "রত্নার রূপের দেমাকের কথা হচ্ছে।"

শিখা কহিল, "কিন্তু ভাই, পাড়াগেঁয়ে অমন মোদ্দা কখনো দেখা যায় না। ঐ যা গোবর-গাদায় পদ্ম! তাতে কি এসে যায়—আমাদের মত য়্যারিষ্টক্রেট্‌ ফ্যামিলির মেয়ে তো ও নয়!"

কল্পনা কহিল, "নিশ্চয়ই নয়! আমার বাবা স্যার। আমরা যে ওর সঙ্গে মিশি, বন্ধুত্ব করি—"

নীহার মুন্সেফের মেয়ে। সে কহিল, "ও-কথা যাক্। রত্না আগে কিন্তু খুব ভালোমানুষ ছিল—সাত চড়ে মুখে রা বেরুতো না!"

কল্পনা কহিল, "আহা, তখন যে একটা গেঁয়ো মেয়ে ছিল। এখন

'পিয়াস' না হলে চলে না। দিশী স্নো মুখে মাখে না—ওর সমস্ত ফ্রেঞ্চ টয়লেট্। দেখেছিস ?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শিখা কহিল, "তা সব দেখতে পাই বৈ কি! রূপ থাকলে রূপোর অভাব থাকে না।"

নীহার কহিল,"আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী ওর মাসিমা হলো কি করে?"

শিখা কহিল, "তাঁর কি রকম বোন-ঝী। ওর বাবার বন্ধু!"

ব্যঙ্গের হাস্তে কল্পনা কহিল, "ওরে বাবা, তাতেই এত! একটা ঠাট্টা অবধি সইতে পারেন না! ফোঁস্ করে ওঠেন!"

বারান্দায় দাঁড়াইয়া কল্পনার দল যখন এমনি জটলা পাকাইতে ছিল, বাগানের এক প্রান্তে রত্না তখন মাধবীলতার মঞ্জরীগুলাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ঝর্ণা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল ; কহিল, "রত্নাবলীর কি হচ্ছে ?"

ঝর্ণার দিকে একবার চোখ তুলিয়া রত্না আনত মুখে গাছটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ঝর্ণা কাছে আসিল। রত্নার চিবুক তুলিয়া কহিল, "ও কি, কাঁদছিস্!"

"দেখ্ না ভাই, কল্পনা আমাকে কি রকম যা-তা বললে আমি গোস্বামীদের বাড়ী যাই বলে! বাবা তো ওঁকেই আমার গার্জ্জেন করে গেছেন।"

"কি তাতে দোষ হয়েছে? তোমার বাবার তিনি বিশেষ বন্ধু! কল্পনার কথা ছেড়ে দে। ও বড়লোকের মেয়ে। বাপ জজ বলে কাউকে ও গ্রাহ্য করে না।"

মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া রত্না কহিল, "ও বললে, তুমিও নাকি আমার নামে কি সব বলেছো!"

"আমি ?" ঝর্ণা হাসিল। কহিল, "না, না! ওদের সে দিন কথা হচ্ছিল, আমি বলেছিলুম, রত্না নিজেকে ডিঙ্গিয়ে চলছে!"

"ডিঙ্গিয়ে চলছি কি রকম ?" রত্না ঝর্ণার পানে চাহিল।

একটা লোহার বেঞ্চে রত্নাকে লইয়া ঝর্ণা বসিল। কহিল, "হ্যাঁ রত্না, নিজের দিকে চেয়ে নিজেকে একটু দেখিস্। আচ্ছা, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি, তোর টুথব্রাস থেকে সেণ্ট পর্য্যন্ত কোন্‌টা দামী জিনিষ নয়, বল্ তো ? তাই আমি বলেছি, রত্নাকে যেন বড়মানুষী নেশাতে পেয়েছে!"

রত্না নীরব হইয়া রহিল ; উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বলিয়া নয়, সুস্পষ্ট সত্য উক্তির মধ্যে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যাহাকে সহসা অস্বীকার করা যায় না। সঙ্কোচে মন বিমূঢ় হইয়া পড়ে।

ঝর্ণা রত্নার সেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টির পানে চাহিয়া কহিল, "সে যাক্ রত্না, প্রিন্সিপ্যাল সে দিন বললেন, রত্না একটা জিনিয়াস গার্ল। আমি কিন্তু বলছি—যত গোল বাধাতে সংসারে মজবুত এই জিনিয়াসের দল! কারণ, পাঁচ জনের চলা রাস্তাটাই তারা গুলিয়ে ফেলে।"

রত্না আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল। কিন্তু অধিকক্ষণ এমন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত থাকিতে হইল না। মুক্তি দিলেন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আসিয়া রত্নাকে কহিলেন, "রত্না, গোস্বামী-সাহেবের ওখান থেকে তোমায় নিতে এসেছেন! প্রিন্সিপ্যাল্‌স্-রুমে তিনি আছেন।"

চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘখানা নিমেষে সরিয়া গেল। পুলকদীপ্ত মুখে রত্না বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল স্বরে রত্না কহিল, "আসি ভাই!"

"এসো রত্না।"

বাগানের মোড় ঘুরিয়া বারান্দায় সিঁড়িতে পা দিতেই রত্না দেখিল, কল্পনার দল তখনও গুলতান করিয়া একটা মুখরোচক আলোচনায় মাতিয়া রহিয়াছে! কানে কিছু না শুনিলেও রত্না নিঃসংশয়ে অনুমান করিল, তাহারই সমালোচনা হইতেছে। নিস্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্বস্থানে যাইতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেই কানে শুনিল, জ্যোৎস্না কহিতেছে, "তা ভাই যাই বলিস্, রত্নার বরাত বটে! কত বড়লোক—"

সুষমা কহিল, "থাম্ থাম্, বড়লোক। তুইও রত্নার মত মূর্চ্ছা যাবি—না, দিনে তারা গুণ্‌বি!"

থতমত খাইয়া জ্যোৎস্না কহিল, "না, তা বলি নি! মিষ্টার গোস্বামী কিন্তু খুব সুপুরুষ! সে দিন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলছিল, আমি ভেবেছিলুম, কোন সাহেব নাকি!"

কল্পনা কহিল, "তবে আর কি! যাও বরমাল্য নিয়ে রত্নার আগে ছোটো! বাবা, হ্যাঙ্‌লা বটে তোরা!"

শান্তি কহিল, "চুপ!"

সকলে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, গম্ভীর পদবিক্ষেপে রত্না তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার মুখ গম্ভীর।

রত্না কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সহাধ্যায়িনীদের উচ্চ হাস্যরোল বোমা-ফাটার শব্দের মত রত্নার কর্ণে প্রবেশ করিল! এবং আহত চিত্তের ব্যর্থ আক্রোশ কান্নার মত গুমরিয়া বুকের মধ্যে মাথা কুটিতে লাগিল।

৭

অনিল মোটরের দরজা খুলিয়া দিতেই রত্না উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। পাশে বসিল অনিল। গাড়ী ছুটিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া অনিল কহিল, "আজ এত গম্ভীর যে!"

রত্না কোন উত্তর দিল না। পাশে পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সহাস্যে অনিল কহিল, "কি হলো? মুখ ফিরিয়ে বসে আছো যে!"

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব মিলিল না। রত্না মুখ ফিরিয়া চাহিলও না। যেমন ছিল, তেমনি রহিল।

আশ্চর্য্য হইয়া অনিল হাত বাড়াইয়া রত্নার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতেই তাহার কৃষ্ণ-তারকা-শোভিত শ্বেত পলাশ হইতে শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। যে অশ্রু এতক্ষণ নয়ন-পল্লবে সঞ্চিত ছিল, সমস্ত শক্তি দিয়া রত্না যে-অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিতেছিল, সে অশ্রু আর নিজেকে সম্বৃত রাখিতে পারিল না—ঝরিয়া পড়িল।

সাশ্চর্য্য স্বরে অনিল কহিল, "এ কি রত্না, তুমি কাঁদচো!" ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সাগ্রহে সে রত্নার চোখের জল মুছাইয়া দিল। অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, "কেন? কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?"

রত্না নীরব।

সে রত্নার হাত ধরিল। মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "আমায় বলবে না কি হয়েছে? বলো লক্ষ্মীটি!"

তবু রত্নার মুখে কথা নাই। অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা কিন্তু টানিয়া লইল না।

অনিল কহিল, "বুঝেছি। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে!"

এবার রত্নার মুখে কথা ফুটিল। এ অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণের জন্য ধরা-গলাতেই সে কহিল, "আমি তো ছেলেমানুষ খুকী নই যে, বাড়ীর জন্য বসে বসে কাঁদবো।"

পরিহাসের সুরে অনিল কহিল, "না, তুমি একেবারে আদ্যিকালের বদ্দি বুড়ী! বয়স তোমার সাতাশ হাজার কুড়ি!"

অনিলের কথা বলার ভঙ্গীতে কান্নার মধ্যে রত্না হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আপনি খালি ঠাট্টা করেন!"

হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "হুঁ, আমি খালি ঠাট্টা করি—আর তুমি কেঁদে হাট বসাও! কি হয়েছে, বলো তো? এত কান্নাকাটি কিসের?"

রত্না চুপ করিয়া রহিল। অভিমানি-চিত্তের যে-দুঃখ তাল পাকাইয়া অশ্রুর আকারে ঝরিতেছিল, তাহা কোন মতেই অন্যের কাছে প্রকাশ করা চলে না।

তরুণীর লজ্জা-রক্তিম মুখের উপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কৌতুক-জড়িত কণ্ঠে অনিল প্রশ্ন করিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে বুঝি বকুনী খেয়েছ?"

মাথা নাড়িয়া সবেগ প্রতিবাদে রত্না কহিল, "না। মিস্ গুহ আমাকে কিছু বলেন নি।"

"বলেন নি! বলো কি? তিনি তো আমায় দেখেই মুখখানা ভীমরুলের চাকের মত করেছিলেন। নেহাৎ প্রিন্সিপ্যালের আদেশ।"

"কিন্তু তিনি আমায় কোন কিছুই বলেন নি!"

"তবে কে তোমায় কি বলেছে? কি হয়েছে বলবে না রত্না? কেন তুমি কাঁদচ? অনিলের কণ্ঠে এমন জিদ, এতখানি আগ্রহ যে, তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। পরিপূর্ণ নেত্রে অনিল রত্নার মুখের পানে চাহিল।

সে-দৃষ্টির সহিত রত্নার দৃষ্টি মিলিবামাত্র রত্নার অশ্রুধৌত সুগৌর কপোলের উপর যেন দু'টি রক্ত-গোলাপ ফুটিল।

লজ্জিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, আমায় কেউ কিছু বলে নি।"

রত্নার সেই অপরূপ সুন্দর মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনিল কহিল, "তবে কাঁদছিলে কেন ?"

রত্না মুখ নত করিল। জড়িত কণ্ঠে কহিল, আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, যত্ন করেন তাই কলেজের মেয়েরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া অনিল হাসিয়া উঠিল, "ও, বুঝেছি। আমরা ভালবাসি বলে তোমায় ঠাট্টা করে ? তাই তোমার অভিমান হয়েছে। আচ্ছা আজই মাকে গিয়ে এ কথা বলবো।" অনিলের স্বরে দুষ্টামি মাখানো।

রত্না অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল—"না, না, মাসিমাকে আপনি এ-কথা বলতে পাবেন না।"

"বেশ। বলবো না। কিন্তু তুমি সর্ত্ত করো।"

"কি সর্ত্ত, বলুন ?" রত্না চোখ তুলিয়া চাহিল।

"তুমি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইতে পাবে না। 'তুমি' বলতে হবে।"

"বা রে, আমি কি বলবো—আপনাকে ?"

"আবার 'আপনাকে'! বেশ, বাড়ী চলো, কথা ফাঁশ করে দেবো। বাড়ীতে আজ আবার এক জন নতুন লোক এসেছে !"

সাগ্রহে রত্না জিজ্ঞাসা করিল, "কে নতুন লোক ?"

"বলবো না যতক্ষণ না আমাকে 'তুমি' বলবে। আর সেই নতুন লোকটির সামনে কি বলবো, জানো ?"

সবিস্ময়ে রত্না কহিল, "কি ?"

"তুমি কি রকম করে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলে-মানুষের মত কাঁদছিলে! কি রকম কাঁদুনে তুমি!"

"না কক্ষনো না।"

"কিন্তু কেঁদেছ তো! সেই আমার মস্ত প্রমাণ। সবাই ভাববে, রত্না কচিখুকী! সেই নতুন লোকটিও বলবে, একে একটা চুষি ঝুমঝুমি কিনে দিতে হবে—কলেজে পড়তে আসাই এর বিড়ম্বনা—এর এখন দেশে ফিরে যাওয়া উচিত; তার পর ডাগর হয়ে কান্না থামলে কলেজে পড়তে আসবে।"

অনিল হাসিতে লাগিল।

রত্না মনে মনে আহত হইল। ছেলেমানুষের মত রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, "না, আপনি এমন সব কথা কক্ষনো বলতে পাবেন না!"

"কেন পাবো না? তুমি আমায় ঘুষ দেবে না?"

"কি ঘুষ দেবো?" সরল কণ্ঠে রত্না কহিল।

"তুমি আমায় 'তুমি' বলবে—বলো! বেশ, বলবে না তো? আমিও বাড়ী গিয়ে আমার যা মনে আসে বলবো।"

"না, না, দোহাই আপনার! বলছি—'তোমার'—হয়েছে তো?"

"হয়েছে! চলো, আজ সিনেমায় যাই।"

"সিনেমা!"

"হ্যাঁ! দোষ কি? তুমি আমায় আনন্দ দিয়েছ, আমিও তোমায় আনন্দ দেবো!"

"আনন্দ!" রত্নার মুখ প্রদীপ্ত হইল।

মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "আজ তোমার 'আপনি' বিসর্জ্জন হলো!"

রত্না কহিল, "আপনার যত সৃষ্টিছাড়া কথা!"

কৃত্রিম বকুনির সুরে অনিল কহিল, "আবার আপনার!"

"না, না, 'তোমার'! কিন্তু দেখুন—"

"না, দেখবো না! এই মুখ ফেরালুম!"

অনিল মুখ ফিরাইল।

রত্না হাসিল। কহিল, "ইস্, রাগ হলো? কিন্তু বায়োস্কোপে যে যাবো, মাসিমা মত দেবেন?"

তখনই মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া অনিল কহিল, "মার কাছে কৌশলে মত আদায় করার ভার আমার।"

"কি কৌশল করবেন 'আপনি'—না, না, তুমি? শুনি।"

"মার শুদ্ধু টিকিট কিনবো। কিন্তু আজ শনিবার, মা তার নাচের স্কুলের জন্য যেতে পারবে না! অথচ তোমায় 'না' বলতে পারবে না!"

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অনিল আবার বলিল, "মা তোমায় অত ভালোবাসে কেন জানো?"

"কেন?"

"আমাদের বোন ছিল—মা তাকে নিজের হাতে গড়ছিল। সে নেই বলে—"

রত্নার আয়ত চোখের পিছনে বাষ্প-ভার! রত্না কহিল, "কৈ, তাঁর নাম তো শুনি না!"

"মার সামনে আমরা কেউ কখনো তার নাম করতে পারি না। মা বড্ড কাতর হয়ে পড়ে। তার পরেই তো মা নাচের স্কুল করলে। ওই সব নিয়ে ভুলে থাকে।"

"ও!" বলিয়া রত্না চুপ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী দু'জনকে দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা এতক্ষণে ফিরলে! আমি বেড়াতে যেতে পাই নি! রত্নার সঙ্গে অমিয়র আলাপ করিয়ে দেব বলেছি, কাজেই বেরুতে পাই নি।"

সপ্রতিভ কণ্ঠে অনিল কহিল, "রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল। তাই মাঠে দু'টো চক্র দিলুম!"

মিসেস্ গোস্বামীর অসন্তোষ কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মাথা ধরেছিল—খুব রাত জেগে পড়ছো বুঝি? না, না, শরীরকে যত্ন করবে। স্বাস্থ্য আগে, তার পরে যা হয়। এসো রত্না, আমার বড় ছেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। অনিল যেমন তোমার ভাই, সেও তেমনি।"

ড্রয়িং-রুমে পুত্রের সহিত মিষ্টার গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। রত্না প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে আনত হইল।

গোস্বামী-সাহেব সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "থাক্ মা, হয়েছে। বেশ ভালো আছো?"

মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া রত্না জানাইল, সে ভালো আছে।

নিজের পাশের আসনখানা দেখাইয়া তিনি কহিলেন, "বসো মা! কে আনতে গেছলো তোমাকে? অনিল?"

মৃদু স্বরে রত্না উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মিসেস্ গোস্বামী ঘরে আসিলেন। তাঁর পিছনে আসিল অনিল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্নার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে ভারী ব্যস্ত হচ্ছিলুম। অনিল তাকে নিয়ে মাঠে গেছলো! রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল।"

সহাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "বেশ করেছিল। রত্না ছেলেমানুষ! তেমন কিছু দেখতে পায় না! ওর বয়সের ছেলেমেয়েরা কত দেখে-শুনে

বেড়ায়। হ্যাঁ রত্না, আমি তোমার প্রিন্সিপ্যালকে লিখেছি, এক্সমাসের ছুটিটা তুমি এইখানে কাটাবে, বল্টুকেও তাই লিখেছি।”

রত্নার মুখ আনন্দে ঝল্-মল্ করিয়া উঠিল। সস্মিত স্বরে সে কহিল, “বেশ হবে মেসোমশায়।”

মিসেস্ গোস্বামী নির্ব্বাক্! জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, “অমিয়র সঙ্গে বুঝি এখনও রত্নার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি?”

গোস্বামী-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, “না, ও আমার সঙ্গেই কথা কইছিল। অমিয়, এটি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু বল্টু—তার মেয়ে রত্না। রত্নাকে তোমরা বোনের মত দেখবে। রত্না, অনিল যেমন তোমার ভাই হয়, অমিয়ও তেমনি ভাই। তার উপর ও আবার হাকিম।”

গোস্বামী-সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

তাপ পর কহিলেন, “রত্না খুব ভালো মেয়ে! ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা ‘স্কলারশিপ’ পেয়েছে। আই-এতেও পাবে, সে আশা আমরা রাখি।”

অমিয় এতক্ষণ পদোচিত গাম্ভীর্য্য লইয়াই কথা কহিতেছিল। তেমনই অনাসক্ত কণ্ঠেই কহিল, “ভেরী ইন্‌টেলিজেণ্ট গার্ল!”

“শুধু ইন্‌টেলিজেণ্ট নয়—ও একটা জিনিয়াস্! তোমার মাকে জিজ্ঞেসা করো, এই অতি অল্প দিনে কি রকম নাচতে শিখেছে ও।”

মিসেস্ গোস্বামী সায় দিয়া কহিলেন, “তা সত্যি। আমার ইস্কুলের কোনো মেয়ে রত্নার মত নাচতে পারে না। রত্নাকে যেমন হাতে ধরে শেখাই তাদেরও তেমনি করি তো!

গোস্বামী-সাহেব প্রদীপ্ত মুখে কহিলেন, “হবে না? কার মেয়ে রত্না! বল্টু কি রকম ভালো নাচতো! তবে শোনো, হাটে হাঁড়ি ভাঙি রত্না, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো, তুমি নারদের মত দাড়ি রেখে

এখন নিজেকে ভারিক্কি বলে পরিচয় দাও না কেন, মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, তুমি কি রকম লক্ষী ছেলে ছিলে!" বলিয়া গোস্বামী-সাহেব আনন্দের সুরে হাসিয়া উঠিলেন।

তার পর কহিলেন, সে ভারি মজার কাহিনী। মামার বাড়ীতে রাধামাধবের রাসে খুব ধুমধাম হতো। যাত্রা হবে। 'অর্জ্জুন-উর্ব্বশী'র পালা। হঠাৎ উর্ব্বশী বেচারার হলো ম্যালেরিয়া জ্বর। একদম বেহুঁস! কিন্তু তা বলে যাত্রা তো থাকবে না! বন্টু তখন লুকিয়ে সুরেন অধিকারীর সাকরেদী করে, তার নাচের মহলা আমরা বটতলাতে দেখতে যাই। সুরেন অধিকারী বন্টুকে বললে, তুমি মুখ রাখো বন্টু, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি পারবে! বন্টু প্রথমে ভয় পাচ্ছিল। সুরেন অধিকারীর জিদে শেষে উর্ব্বশী সাজতে রাজী হলো। বন্টুর বাবা এসেছেন নিমন্ত্রণে। আসরে বসে তন্ময় হয়ে তিনি যাত্রা শুনছেন—দেখছেন। মুগ্ধ হয়ে উর্ব্বশীর নাচের তারিফ কচ্ছেন! হরিপদ গাঙ্গুলী বেহালা বাজাচ্ছে আর মুখ টিপে টিপে হাসছে। মামাবাবুর ওপাশে বসে বসে আমিও যাত্রা দেখছি। বন্টুর বাবা বুঝতেই পাচ্ছেন না, ওড়না-উড়ানী বেণী-তুলুনী উর্ব্বশীটি তাঁর বন্টু! হঠাৎ এক সময়ে আমি বলে ফেলেছি, মামাবাবু, সুরেন অধিকারী বন্টুকে কেমন নাচতে শিখিয়েছে দেখছেন? বন্টুর বাবা চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে নাচতে শিখিয়েছে? আমি তখন অত বুঝি নি, বললুম, বন্টুকে! ব্যস, যে নাচে ভদ্রলোক অমন মসগুল হয়েছিলেন, এক নিমেষে তা চুরমার। ইন্দ্রের সভার কোন অনুশাসন না মেনে দেবরাজকে গ্রাহ্য না করে তখনি তিনি ছুটলেন স্বর্গের সেরা নর্ত্তকীকে জুতোপেটা করতে! সে কি হৈ হৈ হাঁ হাঁ হট্টগোল! মামাবাবু খপ করে তাঁর পাঞ্জাবী টেনে ধরলেন! আধখানা মামাবাবুর হাতে রেখে ভদ্রলোক সংহার-মূর্ত্তি ধরলেন! ভদ্রলোক

ভীষণ রাগী! উর্ব্বশী কিন্তু অর্জ্জুনের হাতের তলা দিয়ে ততক্ষণে দে চম্পট!” গোস্বামী-সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীও হাসিতেছিলেন। কহিলেন, “এমনি করেই আমাদের দেশের কলাবিদ্যাকে আমরা নষ্ট করেছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সকলেই মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

“তোমার বার্থ-ডেতে আমি অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর অভিনয় করাবো। রত্না সাজবে উর্ব্বশী।”

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, “তার পর রত্নাকে কি তার বাপের মত দুর্দ্দশা ভোগ করাতে চাও?”

অনিল কহিল, “তা কেন? রমেশবাবুর কাছ থেকে আমরা অনুমতি চেয়ে নেবো।”

অমিয় কহিল, “ছুটিটা তা হলে মন্দ কাটে না।”

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, “উত্তম প্রস্তাব।”

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “শুধু উত্তম প্রস্তাব করলেই চলবে না! তুমি সাজবে দেবরাজ, আর তোমার বন্ধু হবেন ভরত মুনি!”

গোস্বামী-সাহেব আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “চমৎকার হবে!”

৮

অমিয় বসিয়া রত্নার সহিত গল্প করিতেছিল।

সকালে চা পানের পর্ব্ব চুকিয়াছে। গোস্বামী-সাহেব ঢুকিয়াছেন অফিস-কামরায়, মাকে লইয়া অনিল বাজারে বাহির হইয়াছে, বাড়ীতে শুধু রত্না ও অমিয়। নিরবচ্ছিন্ন অবসর-ভরা পৌষের সকাল-টুকুকে

উপভোগ করিতেছে। বারান্দার গোল-টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিয়াছে অমিয়, আর তার সামনের চেয়ারে বসিয়াছে রত্না। সাশির রঙিন কাচ দিয়া সোনালী রৌদ্রকিরণ বিচিত্র আভায় রত্নার শাড়ীতে, পদতলে, অনাবৃত বাহুমূলে পড়িয়া পরীর মত তাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। অমিয় রত্নাকে বুঝাইতেছিল—আশার যেমন অন্ত নেই, মানুষকে বড় করে তোলবার মত এত-বড় প্রেরণাও তেমনি আর কিছুতে নেই! তবু মানুষ বলে, আশাই দুঃখের মূল! কিন্তু এই দুঃখেই মেলে মানুষের সুখের সন্ধান!

রত্না মৃদু হাসিল। কহিল, "আশা পূর্ণ না হলে মনে যখন আমরা বেদনা পাই, তখন বার বার আশা করে শুধু কষ্ট বাড়ানো সার হয়! তাতে সুখের পথ তৈরি হয় কি না জানি না, কিন্তু দুঃখের মাত্রা বাড়ে! তাই কোনো-কিছুর আশা না করাই ভালো নয় কি?"

"না, সে কি করে হতে পারে! যার আশা নেই, জানবে তার মৃত্যু ঘটেছে! আশাই আমাদের প্রাণের উৎস। সংসারে আমরা সব কিছুরই আশা করতে পারি। পাওয়া না পাওয়া ভাগ্য, না হয় পুরুষকার।"

স্থির নেত্রে রত্না অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে অকস্মাৎ একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহারই অদম্য বেগ দমন করিতে রত্নার কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

কথার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া অমিয় কহিল, "ও কি, একদম চুপ! কি ভাবছেন?" বলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে সে রত্নার মুখের পানে তাকাইল।

রত্না কহিল, "কি জবাব দেব খুঁজে পাচ্ছি না!"

"ও, আচ্ছা, ও-তর্ক তাহলে থাক। আসুন আমরা একটু গল্প করি। সেখানে অর্থাৎ আমার কুমিল্লার বাংলাতে এমন সময়ে কি করি জানেন?"

সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রত্না কহিল, "কি ?"

"স্নানের পর প্রসাধন-ক্রিয়া অর্থাৎ পোষাক পরা! সে এক ভীষণ ব্যাপার!"

"কেন আপনার বেয়ারা তো সব গুছিয়ে রাখে!"

"হাঁ, চাপরাশি আবদুল সব গুছিয়ে রাখে সত্যি! কিন্তু আমি নিজেই যে মূর্ত্তিমান্ বেগোছ! বিশেষ রুমাল-সংক্রান্ত ব্যাপারে। সে বেচারার দোষ নেই, আমি বুঝি! তবু রাগ হয় বিষম এবং তাকে দি বকুনি।"

"হাকিম কি না!" রত্না হাসিল।

অমিয়ও হাসিল। কহিল, "ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের মত লোকের বিচার এমনিই বটে!" বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমার এই বিদ্‌কুটে ভুলের জন্য মার কাছে ছেলেবেলায় কম বকুনি খেয়েছি! কিন্তু মাতামহের স্বভাব বিসর্জ্জন দিই কি করে? গদীর নীচে দলিল রেখে তিনি পুলিশে চুরির ডায়েরী করাতেন। তাঁর নাতি তো!"

রত্না হাসিতে হাসিতে কহিল, "খুব ভালো মানুষ ছিলেন বুঝি! কিন্তু অত বড় জমিদারী চালাতেন কি করে?"

"বুদ্ধির তো অভাব ছিল না!"

পরিহাস-মাখা সুরে রত্না কহিল, "যেমন আপনার!"

"আমার! তা ঠিক বলেছেন! কিন্তু আমায় এমন করে এ্যানা-লাইজ করলেন কেন বলুন তো?"

রত্নার মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জানত চক্ষে কি বলিতে গিয়া সে থামিল। অনিল কক্ষে প্রবেশ করিল। রত্নার লজ্জা-রাঙা মুখ এবং অগ্রজের সকৌতুক হাস্য-রেখা অপাঙ্গদৃষ্টিতে নিমেষে সে দেখিয়া লইল।

সহোদরকে দেখিয়া অমিয় কহিল, "মার্কেটটা উজাড় করে আনলে নাকি ?"

হাসিয়া অনিল কহিল,"ইচ্ছে থাকলেও ব্যাগের সে সামর্থ্য ছিল না।"

"ইস্! থাকলে তাহলে সর্ব্বনাশ হতো! আপনি ভারি উড়নচণ্ডী মানুষ।" বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে রত্না অনিলের পানে চাহিল।

"তা কি করবো! ভালো জিনিষের উপর আমার ভয়ঙ্কর লোভ!" বলিয়া সে রত্নার মুখের দিকে চাহিল।

অমিয় হাসিয়া কহিল, "সেইটেই মস্ত বিপদ! এক জন খুব কড়া হুঁসিয়ার মানুষ চাই তোমায় আগলাতে।"

অনিল হাসিল। কহিল, "কড়া মানুষ! না, তেমন কড়া আমার প্রয়োজন নেই! এমন মানুষ আমি চাই, যাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না।"

এ সভ্য সমাজ! রহস্যালাপ এখানে নূতন ধরণের! এখানকার আদব-কায়দায় চাল-চলনে রত্নার যতখানি চমক লাগে, বিস্ময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী! তবু এ সব তার খুব ভালো লাগে! ইহাতে সে আমোদ পায়!

খপ্ করিয়া রত্না কহিল, "তাহলেই মুস্কিল! তেমন লোক আপনি খুঁজে পাবেন কোথায়? আর পেলেও তার নাগাল পাবেন কি করে?"

কৌতুক-ভরা কণ্ঠে অনিল কহিল, "হয় তো খুঁজে পেয়েছি! কিন্তু নাগাল পাই নি। চাঁদকে তো হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, চোখে শুধু দেখাই যায়।" বলিয়া চকিতে সে জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিল। দেখিল, টেবিলের আস্তরণের সূচী-কার্য্যটি সহসা সে নিরীক্ষণ করিতে মনোযোগী হইয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী আসিলেন। কহিলেন, "এই যে অমি রয়েছে!

আমি ভাবলুম, এতক্ষণে মোটর নিয়ে কোন বন্ধুর বাড়ী পাড়ি দিয়েছে।"

অমিয় কহিল, "না, উঠি-উঠি করে আর উঠতে পারলুম না! হঠাৎ মিস্ বোসের সঙ্গে একটা তর্ক লাগলো।"

তর্ক নাম শুনিয়াই মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ তুলিয়া কহিলেন, "তর্ক জিনিসটা ভয়ানক বিশ্রী! ও ফিলজফি পড়ার রোগ।" বলিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, "কিন্তু অমি, মিস্ বোস্ বলছো কাকে? রত্নাকে?"

অমিয় হাসিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "না, না, সঙ্কোচ কিসের? আমি অতটা খেয়াল করি নি! রত্নার তুমি নাম ধরো না কেন? ওকে রত্না বলেই ডেকো। অনিল রত্না বলে।"

অভিযোগ তুলিয়া অনিল কহিল, "কিন্তু মা, রত্না আমাদের 'আপনি' বলে কেন? তুমি ওকে আপনি বলতে মানা করো!"

মিসেস্ গোস্বামী হাসিলেন। সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "তা ঠিক! ভায়েদের সঙ্গে আপনি বলে সঙ্কোচ স্থষ্টি করো না রত্না! 'তুমি' বলেই কথা কয়ো। লজ্জা কিসের?" বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন, "এসো অমি, জিনিষ দেখবে।"

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। এবং রত্নাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমিও চলো রত্না। মা কি আলাদা করে তোমায় ডাকবেন?"

সহাস্যে অনিল কহিল, "রত্না তাই ভাবে।"

সকলে আসিয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

বেয়ারা তখন সদ্যঃক্রীত জিনিসগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল।

একখানা শাড়ী তুলিয়া সপ্রশংস-নেত্রে দেখিতে দেখিতে অমিয় কহিল, "প্রেটি নাইস্ কলার! বেশী দামী। কত পড়লো শুনি!"

সগর্ব্বে অনিল কহিল, "একশো পঁচিশ! ভেলভেট্ সিল্ক। বাবার বার্থ-ডেতে রত্নাকে দেওয়া হবে বলে কিনলুম।"

"বেশ করেছিস! শাড়ীখানা তোমার কেমন লাগছে রত্না?"

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল, "আপনাদের পছন্দর কাছে—?"

অনিল বলিল, "কেন, তোমার পছন্দই বা আমাদের উপর যাবে না কেন? আর আপনি বলছো কাকে?"

পুলকিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "আমার খুব ভালো লেগেছে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "আগে ওই ছবির বইখানা ত্যাখো। এইখানা থেকে উর্ব্বশীর নাচের ড্রেস করাতে হবে। অনিল দর্জ্জিকে ফোন করেছো?"

"হ্যাঁ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।"

অমিয় কহিল, "রমেশবাবুকে বাবা চিঠি লিখেছেন?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, কাল ওঁকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছি; উনি তো তাঁকে আসতে নিমন্ত্রণ করেছেন। মোদ্দা একটা কথা অমি, অনিল গানের সুরগুলো দিয়ে দিচ্ছে, তুমি সব পার্ট ঠিক করে দেবে।"

অমিয় কহিল, "কাকে কোন্ পার্ট দেওয়া হবে, তুমি তো ঠিক করেছো!"

"মোটামুটি ঠিক করেছি! তুমি সেটা দেখো। অনিল ইন্দ্র সাজবে। তুমি অর্জ্জুন! উর্ব্বশীর পার্ট দিচ্ছি রত্নাকে। চিত্রলেখা, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা—আমার স্কুলের চারিটি মেয়েকে দিয়েছি! বঙ্কু সাজবে ভরত। অলক বরুণ। শচীর পার্টটা ঠিক হচ্ছে না! কাকে দি?"

অমিয় কহিল, "সে আমি একজনকে দেবো। সুশীল চ্যাটার্জ্জির বোন কল্পনা চ্যাটার্জ্জি।" বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অমিয় কহিল, "তোমার সঙ্গে পড়ে না?"

কল্পনা নামটা কানে আসিতে রত্নার মন বিরস হইয়া গেল। সংক্ষেপে সে কহিল, "হ্যাঁ।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কল্পনা মেয়েটি কেমন?"

অমিয় কহিল, "মন্দ নয়! চলে যাবে! রাণী সাজবার ঝোঁক তার খুব। সার চ্যাটার্জ্জির মেয়ে তো! অনিল, তুমি দ্যাখো নি কচ-দেবযানীতে সে দেবযানী সেজেছিল?"

অনিল কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। দেখেছি আমি তাকে। নিউ এম্পায়ারে তো? পারবে সে? ভালো কথা মনে পড়েছে—ক'খানা টিকিট পাওয়া গেছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কিসের টিকিট?"

"ওই যে 'মন্দির' হবে এম্পায়ারে! সাধনা বোস মধু বোসের দল। চলো না আজ।"

বিস্ফারিত নেত্রে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "আমি যাবো 'মন্দির' দেখতে, আর আমার অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর কি ব্যবস্থা হবে? তা ছাড়া দর্জ্জি!' এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্যেষ্ঠ সন্তানকে তিনি কহিলেন, "তুমি এখনি ফোন্ করো। কল্পনাকে আসতে বলেছো অমি? সুশীলও যেন আসে। এইখানেই সব চা খাবে। বুঝলে!"

"দিচ্ছি আমি ফোন্ করে।"

"দিচ্ছি নয়। আগে উঠে ফোন্ করো। কি জানি, কোথায় কি নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলবে।"

অমিয় আদেশ পালন করিতে উঠিয়া গেল।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, ওস্তাগর।

"আসতে বল্। অনিল তুমি ওকে কাজটা বুঝিয়ে দাও।"

বেয়ারার পশ্চাতে বাঙালী মুসলমান দর্জ্জি প্রবেশ করিল। মিসেস্ গোস্বামীকে সেলাম করিয়া সাহেবদের সে অভিবাদন জানাইল।

অনিল কহিল, "কাজটা তোমাকে সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে করিম।"

"আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিন হুজুর।"

"নাচের পোষাক। বেনারসী আর অরগাণ্ডি মিশিয়ে করতে হবে। মানে, তোমরা যেমন করো তেমন নয়, এই বইটা থেকে দেখে করতে হবে। জিনিষটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া রূপচিত্রের বইখানা অনিল খুলিল।

অমিয় আসিল, কহিল, "কল্পনাকে নিয়ে সুশীল বিকেলে তিনটের সময় আসবে। মহা খুশী, তুমি নিমন্ত্রণ করেছো শুনে!"

দুই ভাইয়ে এইবার দর্জ্জিকে নাচের পোষাক সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সুরু করিল। মাঝে মাঝে মিসেস্ গোস্বামীও ওস্তাগরকে একটু আধটু বাতলাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্না, তোমার মাপটা করিমকে দাও।"

হাতের ফিতা লইয়া ওস্তাগর রত্নার সামনে আসিল। রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়, অনিল এবং মিসেস্ গোস্বামী রত্নার কোন্খানের মাপটা কেমন হইবে, তাহার আলোচনা করিয়া দর্জ্জিকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

৯

অমলা বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন, রমেশ আসিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "ওগো, শুনেছো ?"

মুখ তুলিয়া অমলা কহিল, "কি ? হাতে ও কলকাতার চিঠি বুঝি ?"

"হ্যাঁ ! রত্নাকে নিয়ে সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে একেবারে।"

চমকিত কণ্ঠে অমলা কহিল, "কেন ? কি করেছে সে ?" মুখ তাঁহার পাংশু।"

"হুঁঃ ! তোমার কেবলি ভয় ! বলি, মেয়ে তোমার ক্ষণ-জন্মা গো ! শাপভ্রষ্টা সরস্বতী !"

অমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "কি হয়েছে ?"

"চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো, সত্যপ্রসাদ কি লিখেছে ! মেয়ের পরিচয়েই আজ আমাদের পরিচয় !"

সে-কথায় সাড়া না দিয়া অমলা কহিল, "খুকী আছে কেমন ? বড়দিনের ছুটীতে যে তাকে আসতে লিখেছিলুম ?"

রমেশ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "কেন ? তোমার বড়ি দিতে ? না, ঘুঁটে দিতে ?" তাঁহার স্বরে শ্লেষ !

স্বামীর এ কথায় অমলার রাগ হইল। ঝাঁঝালো স্বরে তিনি কহিলেন, "দোষ কি ? তার মা যে কাজ করতে পারে, তার তাতে লজ্জা কিসের ?"

"খুব, খুব লজ্জা আছে ! মা তো আর মেয়ের মত রূপ-গুণ নিয়ে জন্মায় নি ?"

"রূপ-গুণ নিয়ে জন্মালে কি করতো শুনি ? যাত্রা ? না, থিয়েটার ?"

এ কথার প্রচ্ছন্ন খোঁচা রমেশ আমলেই আনিলেন না; উৎসাহের স্বরে কহিলেন, "নিশ্চয় থিয়েটার। রত্না করবেও তাই! সত্যপ্রসাদ সেই কথাই লিখেছে।"

বিমূঢ় স্বরে অমলা কহিলেন, "পাগল হয়েছো নাকি তোমরা! গেরস্ত-ঘরের মেয়ে থিয়েটার করবে কি?"

কৃপা-দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যে রমেশ কহিলেন, "সাধে বলতে হয়, কূয়োর ব্যাঙ কি সমুদ্দূরের খবর রাখতে পারে!"

স্বামীর উপমা শুনিয়া অমলার ভয়ানক রাগ হইল। না হয় মেয়ে দু'পাতা ইংরেজী পড়িয়াছে, পিতৃ-আকৃতির বর্ণ-বর্ণ পাইয়া সুঠাম প্রতিমায় সরস্বতী হইয়াছে! তাই বলিয়া তিনি গর্ভধারিণী! প্রতি পদে কথার রূঢ় আঘাতে খর্ব্ব হইয়া শেষে কূয়োর ব্যাঙে পরিণত হইবেন! কেন?

বিরস কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "সমুদ্দুর তো চোখে দেখি নি কখনো! তার ডাক শোনবার দরকারই বা কি! মিছে আপশোষ থেকে যাবে।"

পাটীর আসনখানা রোয়াকে পাতিয়া রমেশ উপবেশন করিলেন। কহিলেন, "খালি ঝগড়া করবে? না, চিঠি শুনবে?" স্বর তাঁহার নরম।

কিন্তু অমলার মনের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নাই। উষ্ণ কণ্ঠেই তিনি কহিলেন, "মুখ্যু মানুষ, তোমার হোমরা-চোমরা মেয়ের চিঠি আমি আর কি শুনবো!" বলিয়া বড়ি-দেওয়া হাতটা পাশের গামলার জলে ধুইতে লাগিলেন।

পত্নীকে তুষ্ট করিবার জন্য রমেশ কহিলেন, "হার মান্‌চি গো! ফল দেখেই মানুষ গাছ চেনে। তুমি বুদ্ধিমতী না হলে কি আর তোমার

মেয়ে এমন বীণাপাণি হতে পারতো! ঠাট্টা করে, আমোদ করে যদি একটা কথা বলে থাকি, তাতে এমন গোঁসসা।"

এমনি বাক্য-বিন্যাসে স্বামি-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। পত্নী কহিলেন, "সত্যপ্রসাদবাবু কি লিখেছেন?"

"বাবু নয়! সাহেব। রত্নার খুব সুখ্যাতি করেছেন। সত্যর জন্মদিনে একটা নাটিকার অভিনয় করাবেন! রত্নাকে তিনি উর্ব্বশী সাজাতে চান, তাই আমার সম্মতি চেয়েছেন।"

"থিয়েটার করবে রত্না! পাঁচ জনে দেখতে আসবে?"

"তা না তো কি দোরে খিল দিয়ে থিয়েটার করবে! তোমরা যেমন ছোটবেলায় বউ বউ খেলতে গো! তা সে হলো সহর কলকাতা, সেখানে ও-সব বাছ্‌-বিচার চলে না! তারা হলো সব সভ্য, শিক্ষিত!"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "তারা সভ্য বলে কি বাপ-মা ভাই-বোন—অচেনা পুরুষ বিচার করবে না? সোমত্ত মেয়েরা সেজে-গুজে নাচবে সকলের চোখের সামনে বাইজীর মত?"

"কি তাতে দোষ শুনি। আমাদের পুরাণে নেই? বেহুলা যে ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল! তোমার মেয়ে যদি নাচে তো সে তার ভাগ্য বলে জেনো!"

অমলা উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"চললে যে!"

"ও-দিকে কাজ আছে। এ তো সাহেবের বাড়ী নয় যে বেয়ারা-খানসামা ঘুরছে। গৃহস্থের সংসার!" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার সারিয়া রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তাকিয়া লইয়া রমেশ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অমলা পাণ-দোক্তা মুখে পূরিয়া

কাছে আসিয়া বসিল। সকালে যে চাপা কলহে দু'জনের মন তিক্ত হইয়াছিল, এখন ভোজন-পর্ব্বের পর অবসর-মুহূর্ত্তে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না।

রমেশ হাসিতে হাসিতে গোস্বামি-গৃহের সম্পদ-বিভবের অপূর্ব্ব কাহিনী পত্নীর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিলেন। এবং হৃষ্ট চিত্তে রূপকথা শোনার মত মুগ্ধ বিস্ময়ে অমলা সেই বহুবার-শ্রুত প্রত্যেক কথাটি মনে গাঁথিয়া লইতেছিল।

রমেশ কহিলেন, "সোজা কথা! সত্যর এক ছেলে হাকিম, আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার—সত্যরই সে জুনিয়ার।"

কমলা কহিল, "ভগবান্ যাকে দেন, সবই ভালো দেন। এ তো আমাদের মত হতভাগার অদৃষ্ট নয়!"

মাথা চুলকাইয়া রমেশ কহিলেন, "তা বটে! দেখ না ওরা বামুন, আমরা কায়েত—এ এক মস্ত ব্যবধান! না হলে—যাক্‌গে, এই তিন আঙ্গুল জমিই সব!" বলিয়া নিজের কপালে হাত দিলেন। কহিলেন, "একটা কথা কি ভাবি, জানো?" বলিয়া চারি পাশে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "ওখানে সব ঘর-আনা ঘরের রুই-কাতলারা আনাগোনা করে! রত্নাকে সত্য নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে, যদি তার একটাকে গেঁথে দিতে পারে! আমার মেয়ের রূপ কেমন, যদি এই পাড়াগাঁয়ে আনি, তাহলে কি আর তা হবে? তুমি কি বলো?"

ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ-গৃহিণী কহিলেন, "তা বটে। তা তোমার সাহেব কি লিখেছে? মেম-সাহেবই বা কি লিখেছেন!"

"সেই আমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার কাহিনী। সত্য স্ত্রীর কাছে সে গল্প করেছে। সে ভয়ানক জিদ ধরেছে, সত্যর জন্মদিনে অর্জ্জুন

উর্ব্বশীর অভিনয় হবে—তাতে রত্নাকে সাজতে হবে উর্ব্বশী। ওর ছেলেরাও নামবে! আমাকে ভরত-মুনি সাজতে অনুরোধ করেছে! লিখেছে, ভয় নেই, গুরুজনরা থাকবেন না, দুর্দ্দশার কোনো সম্ভাবনা নেই!"

পুরানো দিনের সকল কথা অমলার মনে পড়িল। হাসিয়া সে কহিল, "তুমি যাচ্ছো তাহলে?"

"না। ইচ্ছা ছিল, যাই। কিন্তু ঘটে উঠবে না। ইস্কুল ইনস্পেকসনে আসবে, খবর এসেছে। যাই কি করে?"

হাসিতে হাসিতে অমলা কহিল, "ভরত-মুনি সাজলে দেখাতো ভালো, দাড়ি-চুল তো কিছু কম নেই।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠাট্টা! আমি যদি নামতুম, দেখাতুম, তুমিই সত্যকারের মুনি ভেবে পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে পেন্নাম করতে!"

"না হয় এখনই পেন্নাম করছি। সে দুঃখ আর থাকে কেন!"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "তোমাদের শুধু পায়ের ধূলো নিয়ে পাদোদক খেয়ে ভক্তি করা। কিন্তু ওরা জানে, যাকে ভালোবাসি, তাকে কি করে আনন্দ দিতে হয়। সত্যি লেখাপড়া না শিখলে মানুষ ভালোবাসতে পারে না।"

অমলার প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। নীরস কণ্ঠে কহিল, "তাদের ভালোবাসা তারাই বোঝে! আমরা তেমন শিক্ষা-দীক্ষা পাই নি, আর আমাদের স্বামী দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করে আনলো না তো! অল্প যা আনে, তাতে দিন-গুজরান করতেই আমাদের দিন কাটে, এতেই আমরা সুখী!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কহিল, "সুখ কিছুতেই নেই গো, সুখ মানুষের মনে! যাই, দেখি গে বড়িগুলো।"

পত্নী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। রমেশ তাকিয়াতে হেলান দিয়া গায়ের কাপড়খানা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া চক্ষু মুদিলেন—নিদ্রার চেষ্টায়।

১০

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। পল্লীবধূর শঙ্খরোল কুয়াশা-ভরা আকাশকে চঞ্চল করিয়া থামিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা সরিয়া গেলেও পিছনে চাঁদের আলো নাই—নিবিড় অন্ধকার।

গায়ের র‍্যাপারখানা মুড়ি দিতে দিতে রমেশ কহিল, "একবার হরিশের ওখানে যাচ্ছি বড়বৌ!"

ঠাকুর-ঘর হইতে অমলা কহিল, "কেন, সকালে গেলে হতো না? যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"না, বেশ করে মুড়ি দিয়েছি। এই কান-ঢাকা টুপি কিনলুম কেন? ঘুরে এখুনি আসছি।" বলিয়াই রমেশ ভ্রাতৃ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া হরিশ ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া ব্যস্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "কে? দাদা?"

রমেশ উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিল, "হরিশ ওপরে না কি?"

হরিশ ত্রস্তে বারান্দায় বাহির হইলেন। কহিলেন, "এখনি নীচে যাচ্ছি!"

"না, না, আসতে হবে না, আমিই উপরে যাচ্ছি।" বলিয়া রমেশ উঠিয়া আসিলেন।

মণি তখন এ্যালজেবরা খুলিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া অঙ্ক ভুলিয়া অবাক হইয়া চাহিল।

রমেশ কহিল, "আঁক কষছিস্! গ্যাখো হরিশ, রত্নাকে সন্ধ্যেবেলা বসে পড়াতুম, তাই এ সময়টা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ভাবি, এখানে আসি, এদের একটু—"

হরিশ যেন বর্ত্তাইয়া গেছে এমনি আগ্রহে কহিল, "তোমার কষ্ট করে আসবার দরকার কি দাদা! এরাই তোমার ওখানে যাবে।"

মণি কহিল, "জ্যাঠামণি, তুমি তো রত্নাদিকে পড়াতে, তাই সে কুড়ি টাকা করে—"

"হ্যাঁ মা, তবে রত্নার কথা আলাদা!"

হরিশ কহিল, "নিশ্চয়! রত্নার সঙ্গে কার তুলনা হয়?"

রমেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি এমনি একটা প্রসঙ্গের অবতারণাই তিনি চাহিতেছিলেন। উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন, "কিছু মিথ্যে বলিস্ নি ভাই! এই কলেজেই দেখ্ না, প্রিন্সিপাল কি রকম ওকে ভালোবাসে! আরো কত মেয়ে তো রয়েছে!"

বিস্মিত স্বরে হরিশ কহিল, "তাই নাকি! আহা, দাদা,ও যদি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাতো, তাহলে আমাদের বংশের একটা নাম রাখতো।"

রমেশ অন্তরে ঈষৎ আহত হইলেন। তাচ্ছিল্য স্বরে কহিলেন, "ছেলে-মেয়ের তফাৎ আমি মানি না! এই তফাৎ-বোধে কত ক্ষতি হয়, জানো?"

অগ্রজের মনের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে, হরিশ তাহা ভালো করিয়াই জানেন। তাই সে তর্ক ছাড়িয়া নিরীহের মত কহিলেন, "সে তো নিশ্চয় দাদা, আমাদের সমাজের ওই একটা মস্ত দোষ! গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়েতে তফাৎ করে।"

রমেশ কহিলেন, "তাই তো আমি তোমার বৌদির ঘ্যানঘ্যানানি কানে না তুলে ওকে কলেজে পড়তে পাঠালুম! কলকাতার সমাজে তাকে নিয়ে কি রকম হুলস্থুল পড়ে গেছে আজ।"

বিমূঢ় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরিশ অগ্রজের পানে চাহিল।

রমেশ বলিয়া চলিলেন, "এখন হাইকোর্টে সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার হচ্ছেন গোস্বামী-সাহেব।"

হরিশ কহিল, "সুকুমারী পিসির ছেলে না?"

মাথা নাড়িয়া রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ! আমার সঙ্গে কি ভাবটাই তার ছিল! তাই তো সত্যপ্রসাদকে রত্নার গার্জ্জেন করে এসেছি।"

অবাক হইয়া হরিশ কহিল, "এ্যাঁ, তিনি তোমায় চিন্‌তে পারলেন?"

"পারবে না? বলে, বন্টু বলতে সে অজ্ঞান! রত্নাকে কি রকম ভালোবাসে। ওর স্ত্রী তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখেন। আমার সঙ্গেই ছিল ছেলেবেলায় সত্যপ্রসাদের সব কিছু গল্প—ভাবটা আমাদের কম ছিল না তো।"

হরিশ হাঁ করিয়া রত্নার প্রসঙ্গ গিলিতে ছিল। প্রত্যেকটি শব্দ-বর্ণ—সমস্ত যেন মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল। রমেশ থামিতে সে কহিল, "এত দিন বলতে হয় দাদা, তাহলে আফিসের লোকের কাছে গল্প করতুম। এত বড় কৌঁশুলী আমার দাদার ফার্ষ্ট ফ্রেণ্ড—আমার ভাইঝী তাঁর পুষ্যি-মেয়ের মত মানুষ হচ্ছে।"

"নিশ্চয়! পুষ্যি-মেয়ে ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়। ছাখো না, সত্য চিঠি লিখেছে, তার জন্মদিনে অর্জ্জুন-উর্ব্বশী প্লে হবে, রত্নাকে উর্ব্বশী সাজতেই হবে। ওঁর ছেলেরাও নামবে। এক ছেলে আই, সি, এস; বুঝলে হরিশ, আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার।"

মাথা নাড়িয়া হরিশ কহিল, "একেই বলে ভাগ্য দাদা! রত্না ভুল

করে আমাদের ঘরে জন্মেছে, সে ওর চেহারাতেই মালুম—তার পর বিদ্যাবুদ্ধি !"

কথাটা রমেশের মনঃপূত হইল না। মুখের চেহারাতেই তাহা বুঝা গেল। কহিলেন, "না হরিশ, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে জানা চাই।"

"সে তো ঠিক কথা! হাত চাই, হাতিয়ারও চাই। হঁ্যা দাদা, ছুটিতে তাহলে রত্না এখানে আসবে না ?"

রমেশ কহিলেন, "না। কি করে আসবে ? সত্যর বার্থ-ডে পড়ছে ! আমাকেও যাবার জন্য সত্য নিমন্ত্রণ করেছে !"

"তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে! তা দেখ দাদা, তুমি যদি যাও, এ-সব ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যেয়ো না।"

"রামচন্দ্র! তারা একদম সাহেব—বাড়ীতে ঢুকলে বোঝে কার সাধ্যি যে বাঙালীর বাড়ী, কি ইংরেজের বাড়ী! কিন্তু সত্যর আসল মেজাজটা দেখলুম একটুও বদলায় নি।"

সে কথায় কান না দিয়া হরিশ কহিলেন, "ওখানে আলাপ রাখতে গেলে এক-প্রস্থ সুটের দরকার। তা আমায় টাকা দিলে আপিসের ফেরৎ চাঁদনীর চক্ হতে সস্তা দেখে তোমার কোট-প্যাণ্ট-সার্ট সব আনবো।"

সঙ্কুচিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "কিন্তু এটা শীতকাল—গরম সুট চাই তাহলে। আবার ওভার-কোট। আমি আবার ছাই টাই বাঁধতে জানি না যে !"

"ও সব কিছু ভাবনা নেই। বাঁধা টাই পর্য্যন্ত চাঁদনীর বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের আপিসে সব দেখি তো, পরে আসচে! আমি সব কিনে আনবো ঠিক !"

"হঁ্যা, সে জানি হরিশ! কিন্‌তে যদি হয় তুমিই ভালো পারবে।

আমার আবার রুমাল থেকে পায়ের সু অবধি চাই কি-না—টাকা কিছু বেশী পড়বে। মেয়েটার জন্য অত খরচ—তা ছাড়া আমার আয় তো তোমার অবিদিত নয়!"

হরিশ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "কিন্তু আয়ের হিসেব দেখে সব সময় ব্যয় করা চলে না দাদা। মাঝে মাঝে চোখ-কান বুজে কিছু দম্‌কা খরচ করতে হয় বই কি! না হলে বড়লোকের সঙ্গে ভাব রাখা যায় না!"

মাথা নাড়িয়া সমর্থনের সুরে রমেশ কহিলেন, "যুক্তিটা ঠিক। আর ওরা যেমন করে চিঠি লিখেছে—চিঠিখানা যে ফেলে এলুম ছাই!"

মণি নীরবে পিতার এবং জ্যেষ্ঠতাতের কথা শুনিতেছিল। সাগ্রহে কহিল, "যাবো জ্যাঠামণি? চিঠিখানা আনবো?"

"যাবি? তা যা! আচ্ছা, রোস্, দেখি বুক-পকেটটা!" বলিয়া সযত্নে রক্ষিত পত্রখানা পকেটের মধ্যে হাত দিয়া অনুভব করিয়া কহিলেন, "না রে, চিঠিখানা এই যে রয়েছে। তোকে আর যেতে হবে না!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

চিঠিখানা যে হরিশের দু'টি চক্ষুকে সার্থক করিয়া দিবার জন্য তিনি আনিয়া ছিলেন, হরিশ তাহা বুঝিতে পারিলেও রমেশের এ ছলনাটুকু মণির চোখে ধরা পড়িল না। আগ্রহ-সহকারে সে কহিল, "দেখি, অত-বড় ব্যারিষ্টারের হাতের লেখা!"

রমেশের হাত হইতে হরিশ চিঠি লইয়া খুলিবামাত্র পিতাপুত্রে একসঙ্গেই হারিকেনের আলোর সামনে আনত হইলেন।

মণি কহিল, "এঁ্যা, এমনি হাতের লেখা!" আজ সকালেই বিশ্রী হাতের লেখার জন্য মণি বাপের কাছে ধমক খাইয়াছিল।

আক্ষেপের সুরে হরিশ কহিল, "বড় হওয়া কপাল! আমরা

ছোটবেলা হাতের লেখা ভালো করবার জন্য কি বকুনিই খেতুম—তাই মরছি কেরাণীগিরি করে—”

রমেশ কহিলেন, “সে যুগ গেছে রে ভাই, চিঠিখানা চেঁচিয়ে পড়তো, সবাই শুনি! আচ্ছা, আমিই পড়ছি। ও হাতের লেখা তুই ভাল পড়তে পারবি না!” বলিয়া রমেশ বহুবার-পড়া চিঠি আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয় সুহৃদ্,

রত্না-মার এই ছেলের জন্মদিনে উর্ব্বশী নাটক অভিনয় হবে, মিসেস্ গোস্বামীর বিশেষ ইচ্ছা, রত্না সাজবে উর্ব্বশী। আমিও তাহলে খুব আনন্দিত হই। অপেক্ষা শুধু তোমার অনুমতির, আর সেই প্রতীক্ষাতেই রইলুম! আর আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পত্রযোগে তোমায় জানাচ্ছি। বন্ধু, এসো, ভারী খুশী হবো। সে দিন তোমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার গল্প এঁদের কাছে করেছিলুম। হাসির তোড়ে আমার ড্রইং-রুমের শিলিংগুলো অবধি কেঁপে উঠেছিল। মিসেস্ গোস্বামী তোমাকে ভরতমুনি আর আমাকে নারদ ঋষি সাজাবেন বলছেন। ওঁর হাতে পড়ে আমাকে বেহাল না হতে হয়। বন্ধু, তুমি সহায় হতে এসো। হরিপদ গাঙ্গুলীর খোঁজ নিয়ো। সুরেন অধিকারীকে তো আর পাবো না।

আশা করি তোমার সব ভাল। আমারও সমস্ত কুশল। ইতি—

তোমার

এস, পি

তাহারই নীচে ছোট অক্ষরে লেখা মিসেস্ গোস্বামীর লেখা কয়েক ছত্র।

হাসিতে হাসিতে রমেশ কহিলেন, “শোনো, তার স্ত্রী কি লিখেছে।” বলিয়া পড়িলেন—

"গুরুজনরা থাকিবেন না! নির্ভয়ে বন্ধু-যুগলে অভিনয় করিয়া আমাদের নয়ন-মন সার্থক করুন। সত্বর আসুন।"

হরিশ কহিল, "এরা তোমায় যেমন খাতির করে দাদা, তেমনি ভালোও বাসে। একটা কথা বলো তো—"

সহর্ষ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "বল্ না, কি কথা!"

"ইনসিওর কোম্পানীর একটা বড় চাকরী খালি আছে। শুনেছি, উনি বললেই হয়। বেশ মোটা মাহিনা। যদি—"

সবটা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। রমেশ কহিলেন, "নিশ্চয় বলবো, না হয় রত্নাকে দিয়ে জেদ করিয়ে তোকে দেওয়াবোই ও চাকরি। আমি কথা দিচ্ছি তোকে!

১১

গভীর রাত্রে অমলা স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিলেন, কহিলেন, "ও বড়বৌ, কি স্বপ্ন দেখছিলে? চোর এসেছে?"

"এ্যাঁ!" বলিয়া অমলা চোখ চাহিল। রমেশ গায়ে হাত দিয়া কহিল, "ইস্, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে! ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে যা এঁটে ঘরের ছ্যাদা অবধি বুজিয়ে শোয়া। জানালা খুলে দিই। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। বলি, কি স্বপ্ন দেখছিলে?"

"খারাপ স্বপ্ন।"

হাসিয়া রমেশ কহিলেন, "কি? আমি মরে গেছি?"

"কি কথার ছিরি!"

"তবে? আমি আর একটা বিয়ে করেছি?"

"করে থাকো, করেছো। তাতে আমার কি!"

"আঃ, বলো না, তবে কি? ও, বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে! সত্যর হাত ধরে তুমি চলে যাচ্ছ—আর তোমার বুকের মধ্যে বসে সতী-নারী অঝোরে কাঁদছে!"

অমলা ফুঁসিয়া উঠিল—"মরি মরি, কি কল্পনা! নিজে যেমন বন্ধুর ঐশ্বর্য্য-বিভব দেখে মুগ্ধ, ভাবো সকলেই তেমনি!"

"অয়ি সুলোচনে, অর্থের মোহিনী-শক্তি মাদকতা তুমি জানো না—তাই তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছো, কিন্তু সে মহা-বস্তু!"

"হয়েছে গো হয়েছে। দেখ, রত্নাকে তুমি থিয়েটার করতে দিয়ো না।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমেশ কহিলেন, "কেন?"

"আমি বড্ড বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।"

গভীর কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "কি স্বপ্ন?" মুখে তাঁহার বিরক্তির চিহ্ন।

মিনতির সুরে অমলা কহিল, "দেখ, যত মুখ্যুই হই, আমি তার মা। আমার চেয়ে তার মঙ্গল-চিন্তা আর কারু বড় হতে পারে না!"

বাধা দিয়া রমেশ কহিলেন, "আমি তার বাপ বড়বৌ। শুধু বাপ বললেই কথা বলা হলো না। জগতে আমার যা কিছু—আমার মরা-বাঁচা—সব ওই রত্নার উপর নির্ভর করছে! আর বড়বৌ, আমার মত রত্নাকে তুমি পারো ভালোবাসতে?"

"না, সে কথা আমি বলি নি! আমি স্বপ্ন দেখছিলুম—"

তাচ্ছল্যের ভরে রমেশ কহিলেন, "স্বপ্ন চিরকালই মিথ্যা হয়। তাই লোকে বলে, যা বাস্তব নয়, তাই স্বপ্ন! আচ্ছা বলো, তবু কি স্বপ্ন শুনি।"

"বলছি। দেখ, স্বপ্ন দেখলুম, রত্না থিয়েটার কচ্ছে—কি চমৎকার তার পোষাক—তেমন পোষাক স্বর্গের মেয়েরাই পরে! কি সুন্দর সে

নাচছে—কত লোকে তাকে ঘিরে রেখেছে—সে কি বাহবা পাচ্ছে—সকলে অজস্র ফুল দিচ্ছে, মালা দিচ্ছে—”

সাগ্রহে রমেশ কহিলেন, “তার পর ?”

অশ্রুসিক্ত স্বরে অমলা কহিল, “কে বলবে, সে আমার মেয়ে ! তারা সকলে রত্নাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রত্নাকে কত ডাকচি—কিন্তু সে এমন মাতোয়ারা যে আমার ডাক শুনতেই পাচ্ছে না !”

হাসিয়া রমেশ কহিলেন, “এ তো আনন্দের স্বপ্ন !”

“আনন্দ কি গো ? স্বপ্নে মা ছেড়ে চলে-যাওয়া খারাপ !”

রমেশ কহিলেন, “তার চেয়ে বলো মাথা খারাপ। এটুকু বুঝতে পারলে না বড়বৌ, রত্না তোমার গর্ভে জন্মালেও সে এসেছে অপ্সরা-লোক থেকে। আমার মুখে গল্প শোনো নি, নূরজাহান মরুভূমিতে জন্মালেও শেষে হয়েছিলেন ভারত-সম্রাজ্ঞী ! তোমার এই মেয়েও তাই ! না হলে সত্য তাকে এত স্নেহ করবে কেন ?”

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অমলা কহিলেন, “তাই—”

কথা শেষ হইল না।

মাথার দিকে নিম-গাছে একটা পেচক হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

১২

পোষাকের মাপ লইয়া ওস্তাগর চলিয়া গেল। মায়ের পানে চাহিয়া অনিল বলিল, “তুমি তাহলে যেতে পারবে না !” কণ্ঠে ক্ষোভের সুর।

মা কহিলেন, “কি করে হবে ! সুশীল আসবে, কল্পনা আসবে, তাদের আবার চা খেতে বলেচি !

"তবেই তো মুস্কিল !" বলিয়া অনিল উর্দ্ধে কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল। যেন সমস্যার সমাধান সেইখানে লেখা আছে।

অমিয় রত্নাকে কহিল, "তোমার সঙ্গে কল্পনার বোধ হয় আলাপ আছে ?"

কুণ্ঠিত স্বরে রত্না কহিল, "তেমন নেই।"

"তাহলে আজ আলাপ হবে! কল্পনা বেশ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তাই নাকি ? আর ও বড়লোকের মেয়ে—জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জী কম লোক ছিলেন না—ওর কথাই আলাদা !

রত্নার চোখ-মুখ নিমেষে আরক্ত হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পরিচয়-হিসাবে যে কথাগুলা বলিলেন, সেগুলা রত্নাকে আঘাত করিল। রত্নার উপর মিসেস্ গোস্বামীর যে স্নেহ-মমতা—রত্নার মনে হইল, সে শুধু কৃপা-করুণা !

ঠিক সেই সময়ে অনিল তাহার আশু অর্থহানি নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। মাকে বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? রত্না আজ চলুক। আর একখানা যা টিকিট রইলো, সেখানাতে—"

সংশয়-পীড়িত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "একা যাবে ?"

"বাঃ। একা কোথা! আমি যাচ্ছি। শচীনরা যাবে। না হলে অতগুলো টাকা নষ্ট হবে ?"

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িয়া অনুমতি দিলেন, কহিলেন, "তবে যাও, উপায় যখন নেই।"

উৎফুল্ল মুখে অনিল কহিল, "আর বুঝেছো মা, সাধনা বোসের নাচটা একবার দেখা উচিত।"

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন—"তা সত্যি, রত্না, তুমি তবে যাও।"

অমিয়র পানে চাহিয়া সঙ্কুচিত ভাবে রত্না কহিল, "আপনি?" সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটিল, জিভ্ কাটিয়া কহিল, "তুমি যাবে না?"

অমিয় হাসিল। ঔদাস্ত-সহকারে কহিল, "আপনি—তুমি—না আমি—আমার আজ যাওয়া হবে না। কি করে যাবো? বাড়ীতে অতিথি আসছে।"

"তা বটে!" বলিয়া রত্না চুপ করিল।

অনিল কহিল, "অতিথি বলে অতিথি! সম্ভ্রান্ত অতিথি। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।" বলিয়া অগ্রজের পানে চাহিয়া কহিল, "কল্পনা চ্যাটার্জ্জীকে তো এখন হামেসা আসতে হবে। তার সঙ্গে অন্য এক দিন আলাপ করলেই হবে—কি বলো?"

অমিয় ফুলদানীর গোলাপগুলো দেখিতেছিল, কনিষ্ঠের কথায় মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "সেই ভালো। আজ তোমরা বেরিয়ে পড়ো, টাইম আর নেই।"

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার পানে চাহিয়া কহিলেন, "যাওয়া যখন স্থির তখন মিছে দেরী করা কেন? যাও রত্না, উঠে পড়ো, তৈরী হয়ে নাও। সভ্য সমাজের রীতি—ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা।"

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ গোস্বামীর উপদেশ দেওয়া স্বভাব; এবং রত্নাকে পাইয়া তাকে মানুষ করিবার সব ভার নিজের হাতে লইয়া সে-ভারকে মস্ত দায়িত্বের মত দেখেন। তাই প্রতি পদক্ষেপে সকল কাজে তালিম দিয়া তাকে বুঝাইতেন—কেতা-দুরস্ত সমাজে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা করিতে কি কি প্রয়োজন! রত্না দ্বিধাহীন চিত্তে সকল উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলে। ইহাতে মিসেস্ গোস্বামী যেমন প্রীতিলাভ

করেন, অন্য দিকে এই একান্ত অনুগতা তরুণীর প্রশংসা-কীর্ত্তনেও তিনি সহস্রমুখ হন। রত্না এবার তেমন সরল চিত্তে এ কথাগুলা গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ভরিয়াই মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে এ কথাগুলা বলিলেন।

নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া কৌচের উপর রত্না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেশভূষা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। অহেতুক একটা অভিমান জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মনের মধ্যে রি-রি করিয়া জ্বালা দিতে লাগিল। মানস-নেত্রে সে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল, ঘড়িতে তিনটার ঘরে ছোট কাঁটাটা পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার সহিত কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মিসেস্ গোস্বামী মহানন্দে তাহাদের সম্ভাষণ করিতেছেন। অমিয় সেই মহামান্য ভ্রাতা-ভগিনীর আদর-আপ্যায়নে ব্যাকুল-অধীর! সম্ভ্রান্ত অতিথির সম্মুখে নিজের কোন ত্রুটি না ঘটে, মাতা-পুত্রের সে দিকে সতর্কতার সীমা নাই। সুশীল চ্যাটার্জ্জীর কন্যা—তাহাকে পিয়ানোর টুলে বসাইয়া অমিয় হয় তো কৃতার্থ নেত্রে কল্পনার মুখের পানে চাহিতেছে! এ তো রত্না নয়!

পোষাক পরিয়া অনিল রত্নার ঘরের বাহিরে আসিয়া পর্দ্দার ওদিক্ হইতে কহিল, "মে আই কাম্?"

সচকিতে রত্না কহিল, "ইয়েস্।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অনিল হতভম্ব হইয়া গেল। বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এ কি, চুপচাপ জুজুবুড়ীর মত বসে আছো! যাবে না?"

রত্না অনিলের মুখের পানে চাহিল, ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল, "তোমার হয়ে গেছে?"

অনিল কহিল, "আমি তোমার মত কুড়ে নই! চটপট কাজ

করা আমার স্বভাব। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তুমি এখনও চুলে চিরুণী দাও নি, মাটীর ঢেলার মত বসে আছো।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি! তুমি বসো। আমি এলুম বলে!” বলিয়া রত্না পাশের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

অনিল কহিল, “আমি এই ঘড়ি খুলে রইলুম। পাঁচ মিনিটের এক সেকেণ্ড যেন বেশী না হয়! তাহলে ভয়ঙ্কর বকুনি খাবে—বুঝেছো।”

রত্না কোন সাড়া দিল না। এমন পরিহাস অনিলের এই প্রথম বা নূতন নয়। কৃত্রিম শাসন-বাক্য-প্রয়োগে নিজের আধিপত্য বিস্তারের দাবী জানাইতে সে খুব পটু। এবং এ-সকলের উত্তরে রত্না শুধু সলজ্জ একটু হাসি হাসে।

আজও তেমনি রহস্যচ্ছলে অনিল বকুনি শব্দটা ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু রত্নার কানে সেটা এখন মিষ্ট লাগিল না।

মন তার সহজ ভাবে এ শাসনটুকু গ্রহণ করিল না। সত্যকারের শাসনের তীক্ষ্ণতাই যেন তাহাকে বিঁধিয়া মনকে তিক্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে রত্না যখন আবার এ ঘরে আসিল, তখন তাহার সুসজ্জিত মনোরম তনুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ নেত্রে অনিল কহিল, “বাঃ! চমৎকার!”

রত্নার কর্ণমূল অবধি আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “কি চমৎকার যে এমন চম্‌কে উঠলে?”

“সে তুমি বুঝবে না। গোলাপ জান্‌তে পারে না বাগানের সে কতখানি শোভা! দর্শকের সে কতখানি আনন্দ!”

“না, তা জানে না! জানে কেবল তার ডালে কাঁটা আছে।”

অনিল হাসিল। কহিল, "ঠিক বলেছো! কিন্তু গোলাপ যে তুলতে জানে, কাঁটা সে গ্রাহ্য করে না। হাতে ফোটে, রক্ত ঝরে, ব্যথা পায়, তবু গোলাপকে চায়!" কথাটা বলিয়া রত্নার মুখের পানে অনিল তাকাইল।

রত্না কহিল, "খুব হয়েছে! তোমার গোলাপ ফুলের ব্যাখ্যা মোটরে বসেও হতে পারে!"

"নিশ্চয় পারে! ওঃ তুমি আমাকে উল্টে বকুনি দিচ্ছ! চলো। সত্যি আর দেরী নয়!"

গাড়ীতে বসিয়া অনিল কহিল, "তোমার কোট আনো নি?"

অপ্রতিভ ভাবে রত্না কহিল, "ভুলে গেছি! আনছি।" বলিয়া নামিতে উদ্যত হইল।

অনিল হাত ধরিয়া বাধা দিল, কহিল, "পাগল হয়েছো! আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে! বেয়ারা যাক না কোটটা আনতে, না হয় আমি যাচ্ছি!" বলিয়া সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভূষণ, মিস্ বোসের কোটটা আয়ার কাছ হতে আনো তো!"

ভূষণ আদেশ পালন করিতে গেল।

রত্নার দিকে চাহিয়া অনিল কহিল, "আমি গাড়ী চালাবো।" মুখে তাহার মৃদু হাসি।

রত্না কহিল, "তুমি কেন চালাবে? ভূষণ?"

"না, আমিই চালাবো।" অনিল রত্নার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কৌতুক কণ্ঠে কহিল, "আমাদের যাত্রা-পথে ভূষণকে আবার কেন?"

"যাত্রা-পথে!"

"হ্যাঁ! যদি অনির্দ্দিষ্ট পথে পাড়ি দি?" অনিলের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

ভীত কণ্ঠে রত্না কহিল, "কি বলছো তুমি ? না, না, ও কি ঠাট্টা !"

ভূষণ আসিয়া কোট দিয়া সোফারের দরজা খুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

অনিল কহিল, "এস্পায়ার !"

গাড়ী ছুটিল। রত্না ও অনিল নীরব। রহস্যের মাঝে হঠাৎ যেন উদ্ভট সত্য আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে ! দু'জনে তাই স্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে অনিল মুখ ফিরাইল। এ নীরবতা লজ্জার আকারে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। তাই সেই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ফিরাইতে সে রত্নার মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল রত্না তখনও গম্ভীর মুখে পথের দিকে চাহিয়া আছে।

মৃদু হাসিয়া অনিল ডাকিল, "রত্না !"

মুখ না ফিরাইয়া রত্না কহিল, "কেন ?"

"রাগ হলো ! না, ভয় পেলে ! ভাবলে, সত্যি বুঝি নিজের আত্মীয় সমাজ সব ছেড়ে তোমাকে নিয়ে পালাবো ! না রত্না, যত লোভনীয়ই তুমি হও, সে দুর্ব্বুদ্ধি আমার কখনও হবে না।"

রত্নার অন্তর আহত হইল। অনিলের কথাগুলা যেন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। সে নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

অনিলের এই অনুনয়ে রত্না কিন্তু আগেকার মত হাসিল না। শুধু মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি—আমি গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে !" রত্নার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

"ইস্ ! এখনও রাগ। না গো না, সত্যি রত্না, তোমায় নিয়ে আমি উড়ে যাবো না ওই মেঘের বুকে নীড় বাঁধতে ! বোকা মেয়ে, ঠাট্টা বোঝো না ?"

অনিলের কথায় এবার মুখ তুলিয়া রত্না সভয়ে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, স্তরে স্তরে মেঘ জমিয়া অস্তমিত দিবালোককে আড়াল করিয়াছে।

১৩

পরের দিন অমিয়র সঙ্গে রত্নার দেখা হইতেই অমিয় কহিল, "কি রকম! তুমি নাকি কল্পনা চাটার্জ্জিকে চেনো না!"

শুষ্ক মুখে রত্না কহিল,"চিনি না বলি নি তো, তবে তেমন ভাব নেই।"

"ও, তোমাদের ঝগড়া! অর্থাৎ ও তোমার এ্যান্টিপার্টি, তা বলতে হয়!"

রত্না হঠাৎ ফুঁসিয়া উঠিল। কহিল, "কেন, কল্পনা বলেছে নাকি যে তার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে? আমি তার এ্যান্টিপার্টি?"

"কেন? তাহলে কলেজে গিয়ে তুমি তাকে বিধিমত শিক্ষা দেবে?" অমিয় কৌতুকে হাসিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী আসিয়া দর্শন দিলেন। কহিলেন, "কল্পনা এসেই কাল তোমায় খুঁজলো রত্না—বললে, বড্ড আশা করেছিলুম—তাকে পাবো।"

'কেকে' একটা কামড় দিয়া অনিল কহিল, "নৈরাশ্যের ব্যথা তাকে বেশী দিন ভোগ করতে হবে না! আজও তিনি আসছেন।"

অনিলের এই বাক্যটুকুর অর্থ রত্না বোধ করিতে পারিল না। শুধু অনিলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

"হ্যাঁ, আজ তিনটের সময় তাদের আসবার কথা অনিল, তুমি সে সময় থেকো। আমার ইস্কুলের মেয়েদের আনতে বাস যাবে।" বলিয়া

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী পুনশ্চ কহিলেন, "কি বলো অমি, কল্পনা আমার সিলেক্‌সনের সুখ্যাতি তো?"

"তোমার সিলেক্‌সানের কে ভুল ধরতে পারে মা! তুমি যে রত্নাকে উর্ব্বশীর পার্ট দিয়েছো, এতে কেউ না বলতে পারবে না।"

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "আমাদের ষ্টাফ চমৎকার হয়েছে। তার পর, কাল 'মন্দির' কেমন দেখলে রত্না?"

রত্না বলিল, "চমৎকার।"

অমিয় সহাস্যে কহিল, "সাধনা বোসের নাচের মধ্যে কোনটা ভালো লাগলো?"

অনিল কহিল, "ডেথ্-ডান্সটা। পুরোহিত আয়ুধের সঙ্গে ক্লাইমাক্স-শীনটা—সত্যি চমৎকার। দেবদাসী মঞ্জুলার দুঃখে রত্নার দু'চোখে জলধারা বয়েছিল।"

সহাস্যে মিসেস্ গোস্বামী বলিলেন, "সত্যি?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রত্না বলিল, "খুব ভালো অভিনয় করেছিল সাধনা বোস্। শুধু আমি কেন সকলেই খুব সুখ্যাতি করেছে।"

সকলে নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিলেন।

তার মধ্যে সহসা মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কাল লক্ষ্য করেছিস্ অমিয়?" গাড়ীর কথায় কল্পনা বললে, "গাড়ী পাঠাতে হবে না মাসিমা, আমাদের বুইকে আমি আসবো নিজেই ড্রাইভ করে! মোটর চালাতে ও জানে—লাইসেন্স আছে।"

অমিয় রত্নার পানে চাহিল, কহিল, "রত্না, তোমাকেও ও-বিদ্যায় কল্পনা চ্যাটার্জীর সমান করবো। আমি তোমাকে গাড়ী চালাতে শিখিয়ে দেবো।"

সায় দিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তা দিয়ো! শিখতে পারে ও

খুব শীগগির। তুমি ওর পিয়ানো শোনো নি অমিয়! রত্নার হাত ভারি মিষ্টি। চমৎকার বাজায় ও। অনিলের কাছে এত অল্প দিনে শিখেছে যে আমাকে অবাক্ করে দেছে!"

বিস্ময়ে অমিয় কহিল, "তাই নাকি! রত্না, তুমি ছবি আঁকতে পারো?"

মাথা নাড়িয়া সলজ্জ মুখে রত্না কহিল, "না।"

"কল্পনা বেশ আঁকতে পারে—ড্রইংএ ওর হাত আছে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কল্পনা পেণ্টিং শিখেছে—রত্নাকে তো শেখানো হয় নি। শেখালে ও নিশ্চয় ভালো পারবে।"

সায় দিয়া অনিল কহিল, "তা পারবে! বিদ্যাকে আয়ত্তে আনবার শক্তি ওর আছে! তা না হলে দাদা, তুমি যদি আগেকার রত্নাকে দেখতে!"

কৌতুকে অমিয় কহিল, "কি রকম?"

অনিল কহিল, "তবে শোনো সে-কাহিনী!" বলিয়া আড়ম্বর সহকারে আরম্ভ করিল, "প্রথম দিন থেকেই বাবা রত্নার উপর পার্শিয়াল। রত্নাকে বাবা বললেন, চা করতে জানো মা? মাথাটা একেবারে এক দিকে হেলিয়ে রত্না জানিয়ে দিলে, জানে। তার পর হাতের কসরতিতে কি করে যে পেয়ালা-সমেত চামচে লেগে গড়িয়ে বাবার কোলে চা পড়লো, সে শুধু রত্নাই বলতে পারে!"

রত্নার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া অমিয় হাসিতেছিল, কহিল, "অনিল তোমায় ভারি খেলো করে দিচ্ছে রত্না। আচ্ছা, আমিও ওর ছোটবেলার ইতিহাস বলছি, শোনো।"

উৎসাহ-দীপ্ত কৃষ্ণ-তারকাযুগল অমিয়র মুখের উপর স্থাপিত করিয়া রত্না কহিল, "বলুন তো—সত্যি!"

অমিয় কহিল, "কলেজ ষ্টুডেণ্ট—শীকার শেখবার ঝোঁক হলো—বন্দুকের টিপ্ প্র্যাক্‌টিস্ কচ্ছে—কিন্তু অদ্ভুত কেরামতি! এম্ ছিল

একটা গ্লোব। ওয়ান্, টুং, থ্রী বলে ফায়ার করে ওড়ালে নিজের বুড়ো আঙুল! তুমি বুঝি ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছাখো নি?”

তাচ্ছল্যভরে অনিল কহিল, “বাঃ, সে এমন কি দোষ! সে আমার বন্দুকে প্রথম হাত—একদম যাকে বলে আনাড়ি। কিন্তু রত্নার তো তা নয়—হাতা, বেড়ী, খুন্তী নাড়তে পোক্ত ও!”

রত্নার মুখ পলকে ম্লান হইল। চকিতে সে দৃষ্টি নমিত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “তা হোক, তখন এখানে রত্না যা-কিছু দেখতো সবই ওর নতুন ঠেকতো! তোমার বন্দুক ধরার মত চায়ের সাজানো টেবিল দেখে ও ভড়কে গিয়েছিল! কিন্তু এখন কি ও আর সে-রকম আছে?”

ফোন্ বাজিল। বেয়ারা আসিয়া জানাইল, চ্যাটার্জ্জি মিসি-বাবা বড়সাহেবকো সেলাম দিয়া।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন, “কল্পনা ফোন্ করছে।”

অমিয় উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “কল্পনা মেয়েটি বেশ—দেখতে শুনতেও ভালো।”

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, কহিল, “আমি উঠি মাসিমা—খান-দুই চিঠি লিখতে আছে।”

“যাও! তোমার বাবার চিঠির জবাব এখনও পেলুম না কিন্তু! জবাব না দিয়ে বোধ হয় তিনি সশরীরে হাজির হবেন। তাহলে কিন্তু বেশ হয়।”

রত্নার নিজের ঘরে যাইতে হইলে যে-ঘর ও বারান্দা পার হইতে হয় তাহার শেষ প্রান্তে টেলিফোন্। রত্নাকে যাইতে দেখিয়া অমিয় হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল।

রত্না স্থাণু হইয়া রহিল। কল্পনার কথাগুলা শুনিতে পাইল না, অমিয়র কথা শুনিল। অমিয় বলিতেছিল, না লেট্ মোটেই নয়! বেশ, ওই কথাই রইলো! নমস্কার! বলিয়া রিসিভার রাখিতে রাখিতে কহিল, "ঘরে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, খানকতক চিঠি লিখতে হবে।"

"দেশে?" অমিয় জিজ্ঞাসা করিল।

নত মুখে রত্না কহিল, "হ্যাঁ।"

"বেশ, চট্ করে সেরে নাও। বিকেলে চারটের সময় কল্পনা আসবে, দুপুরে আমি গাড়ী নিয়ে বেরুবো।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে রত্না কহিল, "তার সঙ্গে আমার—"

"তোমাকে গাড়ী চালাতে শেখাবো! দেখবো তোমার ডেক্সটারিটি!"

"কল্পনার চেয়ে? অসম্ভব!" বলিয়া রত্না কেমন থতমত খাইয়া গেল।

অমিয় হাসিল। কহিল, "না, না, কল্পনাকে তোমার ভয় নেই, সে বড়লোকের মেয়ে হলেও ভগবানের দেওয়া জিনিষ তোমাতেই বেশী।

রত্না চকিত হইয়া দৃষ্টি উন্নত করিয়া অমিয়র পানে তাকাইল। অধরে কৌতুকের মৃদু হাসি।

রত্না কহিল, "মাসিমা অনুমতি দেবেন?"

"তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি তোমায় নিয়ে যাব কেন? তোমার নিজের অনিচ্ছা আছে?"

ব্যগ্র কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, না! কোথাও যেতে পেলে আমার ভারী আহ্লাদ হয়! সত্যি বলছি, আমায় যদি নিয়ে যান, খুব খুশী হবো।"

মধ্যাহ্ন আহারাদির পর বসিবার ঘরে সকলে বিশ্রম্ভালাপে

বসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি তাহলে একটু সকাল সকাল ফিরো অমি!"

অনিল সহাস্যে কহিল, "রত্নার তাক্ লেগে যাবে! কাল নিউ এম্পায়ারে গিয়ে ভারী খুশী হয়েছিল।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তাই আমি কিছু বলি না! না হলে আজকের যাওয়া আমি মানা করতুম।"

ঔদাস্য-সহকারে অমিয় কহিল, "তবে আজ থাক্ মা।"

"না, না, তুমি ত বাড়ী থাকবে না। গাড়ী নিয়ে বেরুবেই। শিখুক না ও! কোন বিদ্যা কেউ শিখতে চাইলে তাতে আমি না বলতে পারি না।"

ছেলেরা হাসিল।

রত্না আসিল।

রত্নাকে সজ্জিত দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "এই যে রত্না তৈরী হয়ে এসেছে!"

অনিল কহিল, "ওর ত্বর সয় না মা!" বলিয়া কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিল, "কিন্তু আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না রত্না! দাদাকে এখনি যেতে হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জির ওখানে।

আগুনের তাপ লাগা জবাফুলের মত পলকে রত্নার মুখ ম্লান হইয়া গেল। চকিতে সে অমিয়র মুখের পানে চাহিয়া হতাশ-নয়নে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "না না, ও দুষ্টুমি করছে। ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো না।"

অনিল হাসিয়া উঠিল।

রত্নাও হাসিল—"মা গো, এমন সব বলতে পারো! দেখুন মাসিমা,

আমি কুড়ের ঢিপি, আর অমিদা বসে আছে একেবারে অচলায়তন!” রত্নার কণ্ঠস্বরে একরাশ অভিমান উপচাইয়া পড়িল।

অনিল কহিল, “রত্নার নালিশ ওকে কাল কুড়ে বলেছিলুম বলে। কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিলুম, ছাখো কল্পনা তোমার চেয়ে কত বেশী স্মার্ট! হাউ ভেরি কুইক্!”

রাগ করিয়া রত্না কহিল, “বেশ তো আমি তো বলি নি যে আমি কল্পনার চেয়ে ভালো—যে আমাকে খোঁটা দিচ্ছ!”

ভালো মানুষের মত অনিল কহিল, “না, সে তোমার এ্যাণ্টিপার্ট কি না!”

কৃত্রিম রোষে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “কেন বাপু ওর সঙ্গে অমন করছো!—অমি, তুমি যদি ওকে গাড়ী চালাতে শেখাবে তো উঠে পড়ো বাপু।”

মায়ের কথায় অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৪

গাড়ী ছুটিতেছিল। রত্না-অমিয় পাশাপাশি বসিয়া—অমিয় মাঝে মাঝে গাড়ী চালানো সম্বন্ধে রত্নাকে উপদেশ দিতেছিল। গভীর আগ্রহে রত্নাও তাহার প্রত্যেকটি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল।

গাড়ীর গতির কম বেশী ঘুরানো-ফিরানো, কলকব্জার কূট-কৌশল—এ সব বুঝাইতে বুঝাইতে হঠাৎ অমিয় মুখ ফিরাইতে রত্নার মুখে তার মুখ ঠেকিল। শুনিবার আগ্রহে রত্না অমিয়কে ঘেঁষিয়া এতখানি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার এই স্পর্শে সম্বিৎ পাইয়া অরুণ-রাঙ্গা আকাশের মত রক্তিম মুখে সে ঈষৎ সরিয়া বসিল।

অমিয়র কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না—সে তখন কোন্ কল টিপিয়া কোন্ প্যাঁচ ঘুরাইয়া গাড়ীকে কি ভাবে হাতের ক্রীড়নক করিতে হয়, কেমন করিয়া জড়পদার্থকে বিদ্যুৎগামী করিয়া আজ্ঞাবাহী করিতে হয়, সেই রহস্য বুঝাইতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরে রত্না জিদ ধরিল, "অমিদা, আমার হাতে গাড়ী দাও।"

অমিয় মাথা নাড়িল—"পাগল! তুমি আরো দু'দিন জেনে নাও—সব দ্যাখো বোঝো!"

"সে সময়ে নেবো! কিন্তু এখন একটিবার দাও!"

"বাপ্ রে, এই রাস্তার ভীড়ে হয় না। আগে মাঠে যাই।"

ময়দানের পথে গাড়ী আসিতেও রত্না মিনতি ভরা কণ্ঠে অমিয়র কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "অমিদা এইবার!"

"পারবে? না, শেষে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট—"

অধীর কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, না, এ্যাক্সিডেণ্ট করবো না। এই তো বেশ ফাঁকা পথ—কেউ নেই আমায় গাড়ী দাও!" রত্না অমিয়র হাত ধরিল, কহিল, "তুমি আমার শীটে এসো।"

অমিয় কহিল, "যখন ছাড়বে না, নাও।" বলিয়া উভয়ে আসন বদল করিয়া বসিল।

অমিয় কহিল, "খুব হুঁশিয়ার। নাও ষ্টিয়ারিং ধরে বসো। আচ্ছা, লেফট সাইডেই গাড়ী চালাও! হ্যাঁ, ষ্টিয়ারিং ঘোরাও রাইট্ সাইডে। আচ্ছা, নাও, ষ্টপ্ করো—'রিভার্স গিয়ার' টিপে গাড়ী ব্যাক করাও। অমিয় বলিয়া চলিল—হাঁ—এবার— ফাষ্ট গিয়ার, সেকেণ্ড গিয়ার—থার্ড! এই দ্যাখো গাড়ী কি রকম রান্ করছে। গিয়ার দেখে নাও।

রত্না মহা-উৎসাহে এ্যাকসিল্যারেটার পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বাম হাতে সে গিয়ার-বেঞ্চ চাপিয়া আছে।

অমিয় হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"থাক! থাক! করছো কি!" বলিয়া রত্নার দিকে নত হইয়া হাত দিয়া সে তাহার পা সরাইয়া দিল। অমিয়র দেহের দক্ষিণ-অংশটুকু রত্নার অঙ্গের উপর পড়িয়া তাহার কুমারী-বক্ষে সহসা একটা দোলন দিল।

অমিয়র সে দিকে হুঁশ ছিল না—তাহার দেহের স্পর্শে যে একজনের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহাইয়া দিল! আনন্দের শিহরণ তুলিয়া বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহসা দ্রুত করিল, কিছুই সে জানিল না। সোজা হইয়া বসিয়া হাসিমুখে অমিয় কহিল, "বিপদ আর কি! ভারী দুষ্টু তো! নতুন চালাতে বসেই এতখানি স্পীড্ বাড়ায়!"

হাসিমুখে রত্না কহিল, "ঝড়ের মত আমি উড়ে যেতে চাই!"

"ব্রেভ্ গার্ল!" বলিয়া অমিয় হাসিল। কহিল, "শেখো আরো ভালো করে!" বলিয়া সে রত্নার শিক্ষকতা করিতে লাগিল।

শিক্ষা যখন দেওয়া যায়, তখন শিক্ষিতের সে শিক্ষা-গ্রহণে, পটুত্ব ও আয়ত্তের কুশলতা দেখিলে দাতার আনন্দ যেমন বাড়ে, নিঃশেষে বিদ্যা-দানে আগ্রহও তেমনি জাগে। তাই দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন।

রত্নার শিক্ষা-নৈপুণ্যে অমিয় যেমন বিস্মিত পুলকিত হইতেছিল, তেমনি প্রীতির রসে অজ্ঞাতে তার অন্তরও সিঞ্চিত হইতেছিল।

অমিয় স্বল্পভাষী-গম্ভীর প্রকৃতি। তাহাদের সমাজের তরুণীর দল যখনই গায়ে পড়িয়া আলাপে হাস্য-পরিহাসে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আসে, তার মনে তখনই কেমন বিরূপতা জাগে! তাই বলিয়া কোন দিন সে রূঢ় বা অশিষ্ট আচরণে কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করে নাই। তাহার স্বভাব ভদ্র—মানুষের সহিত সদ্ব্যবহারে চিরদিন সে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই মানুষটি আজ রত্নার সহিত হাস্যালাপে চপল হইয়া উঠিল। হঠাৎ পথের

ধারে গাড়ী যখন থামিয়া গেল, কি হইল বলিয়া অমিয় বিগড়ানো-গাড়ীকে দেখিতে রত্নার হাত ধরিয়া কহিল, "খুব হয়েছে! এখন এদিকে এসো তো!"

রত্না উঠিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল। এবং এটা ঘুরাইয়া সেটা নাড়িয়া গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনটা দেখিয়া-শুনিয়া অমিয় ঠিক করিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই রত্না গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া কহিল, "কি হয়েছিল?"

অমিয় রত্নার মুখের দিকে চাহিল। একটু হাসিয়া কহিল, "বিকল! তোমার স্পর্শে গাড়ী কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।"

লজ্জা-রাঙা মুখে রত্না কহিল, "যাও—কেবলই ঠাট্টা!"

আবার গাড়ী চালানোর কাজে শিক্ষানবীশি আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ সায়াহ্নে আসিয়া মিশিল, মাঠের চারি দিকে ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলা জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে হঠাৎ দু'জনের গৃহে ফিরিবার কথা মনে পড়িল।

অমিয় কহিল, "মাটী করেছে।"

সভয়ে রত্না কহিল, "মাসিমা খুব রাগ করবেন! চারটের মধ্যে ফেরবার কথা ছিল।"

"তা কি করা যায়! যা দেরী হবার হয়েছে! কিছু না খেয়ে তো আর পাচ্ছি না! ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।"

অবাক হইয়া রত্না কহিল, "এই মাঠে-ময়দানে কি খাবে! খাবার তো কিছু আনা হয় নি। না, না, বাড়ী চলো, কল্পনা এসে বসে আছে। ভয়ানক রেগে যাবে সে!"

"ইস্! কল্পনার রাগের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা!"

"মাসিমা?"

"স্পষ্ট বলে দেবো, রত্না ভুলিয়ে রেখেছিল, ওকে বকো।"

"আমি ভুলিয়ে রেখেছিলুম?"

"নিশ্চয়। এখন সাধু সাজলে চলবে কেন! রেখেছিলে তো তুমি ভুলিয়ে! চলো, খেতে যাই।"

"কোথায় খেতে যাবে?"

"আশ্চর্য্য! সামনে ঐ নীল আলোগুলো দেখ্‌তে পাচ্ছো না? ফিরপোয়!"

১৫

"হ্যালো, মিষ্টার গোস্বামী! গুড্ ইভ্‌নীং!"

অমিয় ও রত্না ফিরপোর ডাইনিং রুমে চা খাইতেছিল। দ্বারদেশ হইতে আহ্বান-ধ্বনি আসিতেই অমিয় সচকিতে মুখ ফিরাইল। ঈষৎ হাস্যে মাথা নাড়িয়া কহিল, গুড্ ইভ্‌নীং মিষ্টার ডাট্।"

ডাট্ আসিয়া অমিয়র পাশে দাঁড়াইল। রত্নাকে দেখিয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে তাকাইল; চাপা গলায় কহিল, "বিউটিফুল!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অমিয় কহিল, "কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়। অভিনন্দন জানাচ্ছি! ঠিক সময়ে যেন উপস্থিত হতে পারি।"

রত্নার সমস্ত মুখে অদৃশ্য হাতে কে যেন এক কৌটা লাল আবীর ছড়াইয়া দিল! ব্রীড়া-নত দৃষ্টি সামনের টেবলে আঁটিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে অমিয় কহিল, "আরে, কাকে কি বলছো! রত্না—মিস্ বোস—আমার নিকট-আত্মীয়!"

"হ্যাঁ, আরো নিকটতম অভিন্ন হোন্—আমরা কামনা করি।" বলিয়া নত-মুখী রত্নার দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া ডাট্ কহিল, "মিস্ বোস,

আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো, অন্তরের আনন্দ জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমার বন্ধুর কঠিন কৌমার্য্য-ব্রত ভঙ্গ করেছেন, এ আশ্বাস আমরা এত দিনে পেলুম!" বলিয়া ডাটু হাসিতে লাগিল।

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। অমিয় উঠিয়া পড়িল। কহিল, "কি বাজে বক্‌ছো!" বলিয়া বন্ধুর দিকে হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দন করিয়া কহিল, "আমার একটু তাড়া আছে ভাই!"

অমিয়র এই অপ্রতিভ ভাবটুকু ডাটুকে আনন্দ দিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে কহিল, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিরবচ্ছিন্ন অবসর, একান্ত নির্জ্জনতাই এখন পরম কাম্য।"

"আঃ, তবু ঐ বাজে কথা! আচ্ছা, আসি। এসো রত্না।" বলিয়া অমিয় রত্নার হাত ধরিল।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইতেই বাধা পাইয়া থামিয়া দাঁড়াইতে হইল। ধর-দম্পতি একেবারে সম্মুখে! মিসেস্ ধর কহিল, "অমন করে চোরের মত পালাচ্ছেন আমাদের দেখে!"

সিনেমা হইতে ফিরিয়া সব ফিরপোয় উঠিয়াছিল। সুজিত মল্লিক অমিয়র কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "ভেরী বিউটীফুল লেডী!"

ধর সাহেব কহিলেন, "আমাদের কবে নিমন্ত্রণ অমিয়?"

কথাটা ঘুরাইয়া অমিয় কহিল, "বাবার ব্যর্থ-ডেতে।"

মিসেস্ ধর কহিল, "সেদিন না বাড়ীতে কি একটা নাটক অভিনয় হবে শুনছি।"

"হ্যাঁ, অর্জ্জুন-উর্ব্বশী।"

মিষ্টার ধর চাহিল রত্নার দিকে। দৃষ্টিতে অনেকখানি প্রশংসা ফুটিয়া উঠিল।

মিসেস্ ধর কহিলেন, "উর্ব্বশী বোধ করি ইনি সাজবেন।"

ধর সাহেব কহিল, "তোমার বাক্‌দত্তা বধূর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দাও।"

"পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি! কিন্তু ভুল বলছেন! ইনি মিস্ বোস্ —আমার আত্মীয়!"

মিসেস্ ধর হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "হাকিম সাহেব নিজের কথাতেই বেসামাল! বোস্ বলছেন! আত্মীয় বলছেন!"

"না, ব্লাড-রিলেসন নয়! মিস্ বোস্ আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে।"

মিসেস্ ধর রত্নার পানে চাহিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আপনাকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হলো।"

একটু হাসিয়া সরম-রাঙা মুখে রত্নাও অভিবাদন করিল।

মিষ্টার ধর অমিয়র কানের কাছে মৃদু স্বরে কহিল, "কলেজ গার্ল?"

"হ্যাঁ, এ বছর আই-এ দেবে।"

সহাস্যে স্থজিত কহিল, "সাফল্য কামনা করি।"

"ধন্যবাদ! মিস্ বোস ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ হোল্ড করেছেন; এবারও ওর কলেজ আশা রাখে—"

মিসেস্ ধর সহাস্যে কহিল, "এত দিনে একটি জীবন্ত সরস্বতী পেলেন!"

অমিয় রত্নাকে লইয়া মোটরে উঠিল। নিজেই সে চালকের আসন গ্রহণ করিল।

পথের বিজলী-বাতি অমিয়র মুখে পড়িতেই রত্নার মনে হইল, অমিয় কেমন যেন অন্যমনস্ক। ঈষৎ বিস্মিত হইয়া রত্না কহিল, "এমন জায়গায় আমায় নিয়ে গেলেন কি বলে অমিদা!"

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় উত্তর দিল, "কে জানে আজ সব এসে জুটবে! চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, তাই!" অমিয়র স্বরে যেন জবাবদিহির ভাব!

একটু চুপ করিয়া রত্না কি ভাবিল। তার পর কহিল, "তুমি চির-কুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে কেন অমিদা?" রত্নার অধরে কৌতুকের হাসি।

অমিয় মুখ ফিরাইল; রত্নার মুখের দিকে তাকাইল, কহিল, "ওই তোমাদের স্বভাব! ভারী কৌতূহলী তোমরা। তোমাদের সব কথায় জবাব দিতে হবে! না দিলে এমন সব কথা ভেবে বসো, যার চেয়ে খুলে বলাই ভালো!"

মুখ টিপিয়া ভালো মানুষের মত একটু হাসিয়া রত্না কহিল, "আমিও তাই বলি, লক্ষ্মী ছেলের মত বলো আমায়! কাউকে আমি বলবো না!" বলিয়া সে অমিয়র দিকে সরিয়া বসিল। উভয়ের গায়ে গা ঠেকিল।

হাসিয়া অমিয় কহিল, "কি ভালো-মানুষটি! আহা! কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে মজা নেই! আমি কারুর কাছে কখনো বলে বেড়াই নি যে আমি বিয়ে করবো না!"

"তবে ওঁরা যে বল্লেন!" রত্নার দৃষ্টি কৌতুকে উজ্জ্বল।

অমিয় কহিল, "বত্রিশ বছর বয়স অবধি যে বিয়ে করি নি তাই থেকে ওরা ধরে নিয়েছে, ও কাজটা আমি কখনো করবো না!"

"এখন?" রত্নার মাথায় কেমন দুষ্ট-বুদ্ধি জাগিল।

"এখন কি?"

"না, বলছি, এত দিন কেন বিয়ে করো নি? আচ্ছা মাসিমা কোনো তাগিদ দেন নি?"

"তাগিদ হয় তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু আমি যে কাউকে খুঁজে পাই নি!"

"কখনো কাউকে পাও নি?" রত্নার কৃষ্ণ-তারকা সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অমিয় কহিল, "একেবারে না বললে মিথ্যে হবে। হয় তো কাউকে পেয়েছি! মনে হয়, যাকে জীবনসঙ্গিনী পেলে আনন্দ হয়! কিন্তু মনকে শাসন করি—সে হবার নয়! এ দুর্লভ কামনাকে মন থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করি!"

অমিয়র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া রত্না কথা কহিতেছিল, এখন হাত নামাইয়া একটু সরিয়া বসিল।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় কহিল, "কি হলো?"

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে-মুখে রত্না কহিল, "কিছু না।"

১৬

অমিয় এবং রত্না ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী গম্ভীর মুখে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

অমিয় সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। কৈফিয়তের স্বরে কহিল, "গাড়ীটা হঠাৎ—"

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগ। কহিলেন, "তোমরা নিরাপদে ফিরেছো! কোনো ক্ষতি হয় নি তো?"

অমিয় কহিল, "না।"

রত্না চাহিয়া দেখিল, ড্রইংরুমে আজ অনেকগুলি জীব জড়ো হইয়াছে। এবং সকলের চোখেই কৌতূহলী দৃষ্টি! সে দৃষ্টি রত্নার উপর নিবদ্ধ। অনিল শুধু পিছন ফিরিয়া পিয়ানো বাজাইতেছে এবং তাহার পাশের কৌচ অধিকার করিয়া কল্পনা বসিয়া গান গাহিতেছে।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তোমার যে গান ক'খানা তৈরী করতে দিয়েছিলুম, হয়েছে ?"

মাথা নাড়িয়া রত্না জানাইল—"হয়েছে।"

"বেশ, কল্পনার পাশে গিয়ে বসো, অনিল বাজাবে। আমি আজ একে একে সকলের গান শুনবো।" বলিয়া পুত্রকে কহিলেন, "তোমার অর্জ্জুনের পার্ট ধরো অমি।"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের মত কণ্ঠস্বরও গম্ভীর।

অমিয় হাত বাড়াইতেই টেবিলের উপর হইতে পিন্-আঁটা ক'খানা কাগজ তিনি পুত্রের হাতে দিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন, "লাবণ্য, চন্দ্রা, প্রভা, রেখা—"

মিসেস্ গোস্বামীর ইস্কুলের ছাত্রীরা আসন ছাড়িয়া একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নাও। তোমাদের পার্ট! এটা রইল রত্নার—ও যদি গান শুনিয়ে আজ খুশী করতে পারে, উর্ব্বশীর পার্ট ও পাবে।"

রত্নার সমস্ত অন্তর যেন অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে সে কল্পনার পাশে গিয়া বসিল।

অলক রায়, শচীন সেন আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। উভয়েই জুনিয়ার ব্যারিষ্টার—অনিলের বন্ধু। তাহাদের নারদ ও ভরত মুনি সাজিবার কথা। মিসেস্ গোস্বামীকে তাহারা অভিবাদন দিল।

প্রত্যভিবাদনের পর প্রফুল্ল স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "আমি জানতুম তোমরা ঠিক সময়ে আসবে।"

এ কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁটা ছিল, অতি সূক্ষ্ম হইলেও তীক্ষ্ণ ভাবে সে খোঁটা অমিয়কে বিঁধিল। মুখ না তুলিয়াই হাতের খাতাখানা সে নিবিষ্ট মনে পড়িতে লাগিল।

অলক রায় রত্নাকে আজ প্রথম দেখিল। মিসেস্ গোস্বামীকে প্রশ্ন করিল, "ইনিই উর্ব্বশী সাজবেন ?" চক্ষে তাহার প্রশংসার প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "সেই রকম তো মনে করেছি! কিন্তু রত্না অনুপস্থিত ছিল। বেশ লেট।"

রত্না মাথা নত করিল। যেন তাহার মস্ত গুরু অপরাধের বিচার হইতেছে। মুখেও তেমনি বিষণ্ণতা!

কল্পনার গান শেষ হইল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তোমার গলা ভারি মিষ্টি মা কল্পনা!"

কল্পনা একটু হাসিল। সেই সঙ্গে কটাক্ষে রত্নার ম্রিয়মাণ মুখখানাও দেখিয়া লইল। কহিল, "রত্নার গলাও চমৎকার মাসিমা। কত দিন কলেজে আমরা শুনেছি তো।—হ্যাঁ রত্না, অমন চুপ-চাপ কেন ভাই ?"

কল্পনার মিহি স্বরে এই কপট আত্মীয়তা-প্রকাশে রত্নার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালা করিয়া উঠিল! সে কোন উত্তর দিল না।

অনিল পিয়ানো হইতে মুখ ফিরাইল। রত্নার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই যে রত্না এসেছো! এবার তোমার টার্ণ!" বলিয়া সে একটু হাসিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "হ্যাঁ, এইবার তুমি আরম্ভ করো রত্না!"

রত্না অনিলের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া অনিল বুঝিল, রত্নার অভিমান হইয়াছে। মৃদু কণ্ঠে কহিল, "চা খেয়েছো ?"

রত্না কোন সাড়া দিল না।

অনিল বাজনা ধরিল।

রত্না গাহিল। সমস্ত অন্তর ঢালিয়া নিঃশেষে সে যেন সঙ্গীতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ঝরণার বাধাহীন জলধারার ন্যায় সুমিষ্ট

কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরের স্বচ্ছ প্রবাহ-ছন্দ, তাল, লয় যেন কক্ষস্থ সকল প্রাণীকে কিছুক্ষণের জন্য আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে নীরব, নিস্তব্ধ! অমিয় রুদ্ধ নিশ্বাসে নিষ্পলক নেত্রে রত্নার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। সুরের পর সুর স্বপ্নের জাল বিছাইয়া চলিল। গানের পর গান নেশার মত সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

কল্পনা আসিয়া অমিয়র পাশের আসনে বসিল এবং মৃদু কণ্ঠে কহিল, মিষ্টার গোস্বামী সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন যে! পুলকিত মাধবের মত!" তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি!

কল্পনা চাহিয়া দেখিয়াছে, যতক্ষণ সে গান গাহিতেছিল, মিষ্টার গোস্বামী সেই সময়টায় নিজের পার্টের কাগজে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তাই অমিয়র এই তন্ময়তা ঈর্ষ্যার মত তাঁহার মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিল। রত্নার মুখের ম্লানিমাই যে মিসেস্ গোস্বামীর গভীরতার হেতু, এটুকু সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল; এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই প্রথম হইতে তার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীত-স্রোত থামিল। .মিসেস্ গোস্বামী প্রফুল্ল স্বরে কহিলেন, "চমৎকার হয়েছে। সাধে বলি রত্না, তুমি ক্ষণজন্মা মেয়ে! যাক, তোমার আজকের দেরীটুকু আমি মাপ কল্লুম। কাল নাচের রিহার্সাল চলবে। এখন চা আসুক।"

চা আসিল। সকলেই হাত বাড়াইল, পেয়ালা গ্রহণ করিল। রত্নার কাছে ট্রে আসিতে সে মাথা নাড়িল।

অনিল কহিল, "তুমি চা খাবে না?"

"আমি চা খেয়েছি। আর ইচ্ছে নেই।"

"ও, তাই তোমাদের ফিরতে এত দেরী!" কথা হইতেছিল মৃদু

স্বরে। কল্পনা তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। মিসেস্ গোস্বামীকে কহিল, “রত্না চা নিলে না মাসিমা!”

অনিল উত্তর দিল, “না! ওর ভালো লাগছে না!”

অমিয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। কথার শেষ অংশটা তাহার কর্ণে লাগিতেই সে কহিল, “কি ভালো লাগছে না অনিল?”

“রত্না চা খাবে না! সেই কথা হচ্ছে!”

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “না, ওকে তোমরা জিদ করো না! ওর অসুখ করলে আমার ভারী ভাবনা হবে।”

কৃত্রিম অভিমান-ভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল, “আমাদের অসুখ করলে আপনার ভাবনা হবে না মাসিমা?”

অমিয় সহসা মুখ তুলিল। ধীর স্বরে কহিল, “না! সাধারণ ভাবেই মন অসুস্থ হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জি। কিন্তু রত্নার কথা আলাদা! ওর জন্য প্রতিপদে আমাদের চিন্তিত হতে হবে। ও যে আমাদের কাছে আছে।”

মিসেস্ গোস্বামীর কান বাঁচাইয়া গলা নামাইয়া কল্পনা কহিল, “সকলের চেয়ে বেশী ভাবনা বোধ করি আপনারই হবে!”

“হলে খুব অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক লাগবে?” অমিয় উত্তর করিল।

যেন প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি! রত্নার বিরুদ্ধে কল্পনার সমস্ত মন নিমেষে তাতিয়া উঠিল। পাড়াগেঁয়ে একটা গরীবের মেয়েকে উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃযুগল অনুক্ষণ যেন পাহারা দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে! যেন অমৃত-পাত্রের সম্মুখে সুদর্শন-চক্র! কিন্তু কি আছে রত্নার? শুধু রূপ! বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিত কাননে লুব্ধ মধুপের গুঞ্জন-ধ্বনির মত এই স্তাবকের দল রত্নার যৌবনশ্রী-মণ্ডিত অপরূপ তনুর লাবণ্যে যেন

আত্মহারা! মোহাচ্ছন্ন। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত নিষ্ফল ক্রোধে কল্পনার সমস্ত মন ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

আরতি কহিল, "চা খাওয়া শেষ হলো মাসিমা। অমিয়দা এবার পার্ট আরম্ভ করুন।"

মিসেস্ গোস্বামী কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাকে কহিল, "আজ আমি ভারি ক্লান্ত মা, কাল থেকে তোমার কাজে লেগে যাবো।" বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া কহিল, "ওর গান তো শেষ হ'ল, বাকী কাজগুলো ও কাল করবে। আজ তুমি ওকে ছুটী দিয়ে দাও মা! আজ ও অনেকটা পরিশ্রম করেছে আমার সঙ্গে।"

গম্ভীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী অনুমতি দিয়া কহিলেন, "বেশ, তাই হোক! আজ আমি এদের দেখি।"

সকলকে অভিবাদন করিয়া অমিয় রত্নাকে কহিল, "তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো গে। আমিও চললুম।" বলিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কক্ষ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। জানিতেও পারিল না, ভ্রূকুটি-ক্ষুব্ধ দুই চোখ কল্পনা অগ্নি-কটাক্ষে ভরিয়া দু'জনের পানে চাহিয়া আছে।

১৭

রত্নার অত্যন্ত ভাবনা পিতাকে লইয়া। গোস্বামী সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যদি তিনি এখানে আসেন, তবে—

পিতাকে রত্না চিঠি লিখিয়া আসিতে নিষেধ করিতে পারে নাই। কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল। অথচ এই বিশিষ্ট সভ্য সম্প্রদায়ের মাঝখানে গ্রাম্য ইস্কুল-মাষ্টারের আসন কোন্‌খানে, তাহা ভাবিতে মন তাহার পদে পদে কুণ্ঠিত হইতেছিল। অবশ্য পিতা উচ্চ-শিক্ষিত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট।

তথাপি অনাড়ম্বর পল্লী-জীবন-যাত্রায় তিনি অভ্যস্ত। সরল প্রকৃতির মানুষ! কৃত্রিম আচার-প্রিয় এ সমাজের আদব-কায়দায় তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত। এখানকার চলাফেরা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আনাড়ি। অবশ্য সকলেই তাহার পিতাকে সানন্দে গ্রহণ করিবে—সাদর সম্বর্দ্ধনা দিবে। তবু তাহাদের চোখের অর্থময় দৃষ্টি, অধরের বক্র হাস্য-রেখা, নিঃশব্দ ইঙ্গিতে রত্নাকে বুঝাইয়া দিবে, এই সম্ভ্রান্ত সমাজের মণি হইবার জন্য রত্নার যে এই বিপুল প্রয়াস, এ শুধু বাতুলতা!

বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় রত্না জানিত—ছদ্ম সহানুভূতি, কপট দুঃখ প্রকাশ, কৃত্রিম বেদনাভিনয় এবং মৌখিক আনন্দ প্রকাশ এ সমাজের অঙ্গ। এখানকার আচরণে পিতা পদে পদে বিভ্রান্ত হইবেন, রত্না কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাইবে!

সমস্ত কথাই রত্নার মনে জাগিতে লাগিল। প্রথম যখন বোর্ডিংএ থাকিত, সহাধ্যায়িনীর দল তাহার শাড়ী-ব্লাউস লইয়া কত রঙ্গ-কৌতুক কত হাসাহাসি করিত। এ সকল হইতে আশাতীতরূপে মুক্তি দিলেন মিসেস্ গোস্বামী।

মিসেস্ গোস্বামী তাহার একটা লম্বা লেস-ঝুলানো জামার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কাল দর্জ্জি আসবে, তোমার জামা, সায়া, সেমিজ, বডিস্ সমস্তর মাপ তাকে দিয়ো রত্না। ওগুলো আর পরো না মা।"

অনিল বই পড়িতেছিল, মায়ের কথায় মুখ তুলিয়া রত্নার পানে চাহিল। কহিল, "কেন, দিব্বি জিনিস তো! রং-চংও তেমনি—পয়সা দিয়ে রত্না খবর্দ্দার কম কাপড় নিও না!"

মিসেস্ গোস্বামী কৃত্রিম তিরস্কারে পুত্রকে শাসন করিয়া কহিলেন, "থাম্—ও কি তোর মত উড়নচণ্ডী হবে!"

লজ্জিত মুখে রত্না কহিল, "এগুলো সব কেনা মাসিমা।"

স্নেহ হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "জানি মা, পাড়াগাঁয়ে পছন্দর সঙ্গে সহরের পছন্দ-রুচি খাপ খায় না।" তাহার পর সেই জামা-কাপড়ের ফ্যাশনে সহাধ্যায়িনীর দল ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিতে রত্নার প্রশংসা করিত। বিনিময়ে মিসেস্ গোস্বামীর প্রতি রত্নার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া থাকিত।

পিতার সম্বন্ধে তেমনি একটি হাস্যোদ্দীপক বিভ্রাটের আশঙ্কায় রত্নার মন অনুক্ষণ শুধু অস্বস্তি অনুভব করা নয়, ভীত হইতেছিল। যদি তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ সাহেব সাজিবার বাসনায় চাঁদ্নীর বাজার হইতে সস্তার কোট-প্যাণ্ট কিনিয়া সেই বেশে দর্শন দান করেন? মুখে কেহ কিছু বলিবে না! কিন্তু সেই অদ্ভুত ছাঁটকাটের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পাঁচ জনের মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিবে, সে-ভাষা পড়িবার বিদ্যা রত্নার আয়ত্ত হইয়াছে।

রত্না পাশ ফিরিল। কল্পনার কথা মনে আসিল। ক্ষুণ্ণ অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। গান শেষ করিয়া কল্পনা যখন অমিয়র পাশে গিয়া আসন গ্রহণ করিল, তাহার সেই কথা বলিবার ছন্দ, গ্রীবার ভঙ্গী অমিয়র পাশে বসিবার মুহূর্ত্তে ওষ্ঠের মৃদু হাসি—সেই সমস্তই রত্না লক্ষ্য করিয়াছিল। অমিয়র দিকে ঝুঁকিয়া তাহার হাতের কাগজগুলা কল্পনা পড়িতে লাগিল। অমিয়র আচরণে বা মুখে রত্না যদিও এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, কল্পনা কিন্তু এমন করিয়া চাপা গলায় অমিয়র সহিত কথা কহিতেছিল, হাসিতেছিল যে তাহার উপর কল্পনার কোন বিশেষ অধিকারে নিবিড় দাবী প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

রত্না ভাবিবার চেষ্টা করিল, কল্পনার এই আধিপত্য কিসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? ওরা তো ব্রাহ্মণ! অমিয় আজ সন্ধ্যায় রত্নাকে বলিয়াছে, তাহা হইতে পারে না! মনকে তাই প্রতিক্ষণে নিবৃত্ত

করিতেছিল—কিন্তু কি হইতে পারে না? কোন্ অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা? সে কি?

লেপের মধ্যে রত্না ঘামিয়া উঠিল। এতক্ষণে রত্না নিজেকে কল্পনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিল—সৌন্দর্য্যে, সংগীতে নৃত্যে সকল দিকেই সে কল্পনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তবে কি জন্য? কেন? কল্পনা অমিয়র কাছে অগ্রসর হইবে, আর উদাস নেত্রে রত্না তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিবে? না, না! রত্না কল্পনাকে প্রতিহত করিবে! নিজের দুর্ব্বার শক্তিতে সে তাহাকে বাধা দিবে। অমিয়—অমিয়ই রত্নার সর্ব্বস্ব! অমিয়র চোখের সম্মুখে নিজেকে সে এমন করিয়া দীপ্ত সুধা-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, কল্পনা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে! বিবেকের অনুশাসন রত্না শুনিবে না! কল্পনার জয়ী হওয়ার অর্থ, গোস্বামি-পরিবারে সে হইবে একজন কৃপার পাত্রী!

সম্পদ বিভব বা প্রভুত্বের এমন প্রচণ্ড প্রভাব, এতখানি মোহিনী মায়া যে অপরের নিকট ধার করা হইলেও আপনার করিয়া বাহিরের সমাজে দেখাইবার লোভ মানুষ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। তাহাতে ভিতরের ফাঁক যতই বাড়িয়া উঠুক, সেই ছদ্ম সম্মানের মুখোস খুলিয়া ফেলা সাধ্যাতীত হয়।

হঠাৎ রত্নার মনে হইল, কল্পনা হইবে অমিয়র অধিকারী আর সে হইবে বাহিরের অতিথি—এ অপমান সে সহিবে না।

রাত্রি-শেষের দিকে রত্নার চোখে ঈষৎ নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু নীলিমা-তলে ঊষার বিকাশের সন্ধিক্ষণেই কমল-নেত্র উন্মীলন করিয়া সে চাহিয়া দেখিল।

গোস্বামি-ভবনের প্রতি শয়ন-কক্ষে সংলগ্ন বাথরুম। রত্না মুখ-হাত ধুইয়া আলনা হইতে গরম গায়ের কাপড় লইয়া স্লিপার পায়ে যখন

ঘরের বাহিরে আসিল, তখন আলো-অন্ধকারে যেন ভাগাভাগি হইতেছে। বারান্দায় সেই আবছায়-কুয়াশায়-ভরা উদ্যানের গাছপালায় অদৃশ্যপ্রায়-বাড়ী অর্দ্ধ সুপ্তি-মগ্ন! ভৃত্য-পরিচারিকার দল সবে গাত্রোত্থান করিয়া কাজে যোগ দিতেছে।

বারান্দায় এমন অসময়ে রত্নাকে দেখিয়া তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি পলকের জন্য রত্নার উপর নিপতিত হইল। রত্না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। গোটা-দুই বারান্দা পার হইয়া সে আসিয়া অমিয়র শয়ন-কক্ষের সামনে দাঁড়াইল।

অমিয়র ঘরের কপাট ভেজানো। ভিতর হইতে বন্ধ কি না, সে শুইয়া আছে, কি জাগিয়া আছে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটা রেলিং ধরিয়া স্তব্ধ চিত্তে রত্না দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই অমিয়র খানসামা একটি পাত্রে খানিকটা গরম জল লইয়া মনিবের কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া রত্নাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রত্না জানিতে চাহিল, সাহেব উঠিয়াছে কি না?

অভিবাদন করিয়া ভৃত্য জানাইল, প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিলেও গাত্রোত্থান এখনো হয় নাই।

রত্না কহিল, "সেলাম দিও।"

১৮

নৈশ পরিচ্ছদের উপর ড্রেসিং-গাউন চাপাইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিয়া সামনে প্রতিমার ন্যায় রত্নাকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কহিল, "আমায় ডাকচো?"

"হ্যাঁ। তুমি বেড়াতে যাবে না অমিয়দা?"

অবাক হইয়া অমিয় কহিল, "বেড়াতে! এত সকালে? আমার তো এখনও হাত-মুখ ধোয়া হয় নি!"

"বেশ, আমি দাঁড়াচ্ছি—তুমি চটপট সেরে নাও।"

অমিয়র বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কহিল, "আমি দাঁড়াচ্ছি, মানে? তুমি যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ, যাবো!" রত্নার স্বর দৃঢ়।

অমিয় মুহূর্ত্ত কাল রত্নার পানে চাহিয়া রহিল।

রত্না কহিল, "তুমি না বললে, ভোরে উঠে তুমি বেড়াতে যাও!"

"মিথ্যে বলি নি। কিন্তু রাত্রি শেষ হবার আগে যে উঠি, এমন কথাও তো বলি নি!"

আব্দারের সুরে রত্না কহিল, "না গো, না। রাত্রি শেষ নয়! ভোর অনেকক্ষণ হয়েছে। এ কুয়াশা।"

"হবে। কিন্তু এত তাড়া দিচ্ছ কেন তুমি?"

"দেবো না? মাসিমা এখনি উঠবেন। আমার আর বেড়াতে যাওয়া হবে না।"

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল, "মাসিমাকে না বলেই তুমি যেতে চাও নাকি?"

অকুণ্ঠিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "হ্যাঁ।"

চমকিত হইয়া অমিয় কহিল, "সে কি!"

এতটুকু অপ্রতিভ না হইয়া রত্না কহিল, "কেন এতে দোষ কি! আমরা ত সকালের মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমার খাল্‌ি না নিয়ে যাবার ফন্দী!"

অমিয় একটু হাসিল। কহিল, "আমার না নিয়ে যাবার ফন্দী, কিন্তু তোমারই বা এত জিদ কেন?"

"আমি গাড়ী চালাতে শিখবো। বিকেলে হবে না, মাসিমার কাছে হাজির থাকতে হবে! আর ক'টা দিন বাদেই তো তুমি চলে যাবে, আমার আর শেখা হবে না।"

এতক্ষণে জিনিসটা স্বচ্ছ হইল। হাঁ, গাড়ী হাঁকাইবার নেশা এমনি বটে! কিশোর কালে অমিয়কেও এক দিন এ নেশায় পাইয়াছিল! বাপের নূতন গাড়ী—হাত দিবার অনুমতি নাই। তাহাকে লইয়া গোপনে সে পাড়ি দিত। ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত, ভর্ৎসিত হইয়াছে, তথাপি গাড়ী লইতে ছাড়ে না। উত্ত্যক্ত হইয়া পিতা একখানা ছোট গাড়ী তাহাদের দুই ভাইকে কিনিয়া দিলেন।

অমিয় হাসিল—"বুঝেছি! তাই তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপি-সাড়ে পালাতে চাও! কিন্তু মা বকুনি দিলে আমি জানি না। আঙুল দেখিয়ে দেবো সোজা তোমায়। একটি কথা বলবো না।"

"তাই দিয়ো! আমি তো কোন অন্যায় কাজ করছি না। নাও অমিয়দা, ওই ছ্যাখো আকাশে আলো ফুটছে।"

অমিয় আকাশের দিকে চাহিল। তারপর হাসিয়া কহিল, "ঘরে যাও—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার হয়ে যাবে।"

মাথা নাড়িয়া জেদের স্বরে রত্না কহিল, "না আমি একপা নড়বো না—তুমি দেরি করবে।"

"না রে পাগল, না! আমি নিচ্ছি। এমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। যাও, ঘরে গিয়ে জুতো-মোজা পরে এস।" অমিয়র স্বরের শেষের দিকে কর্ত্তৃত্বের আভাস।

কোন উত্তর না দিয়া রত্না আদেশ পালন করিতে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে রত্না যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কেবল পায়ের হিল-জুতা, সিল্কের মোজা নয়—মাথার চুল হইতে শাড়ীখানা পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়াই সে উপস্থিত হইল। গায়ে মূল্যবান সোনালী ওভার কোট।

অমিয়কে ডাকিয়া রত্না কহিল, "হয়েছে অমিয়দা ?"

"হ্যাঁ ভাই, এই যে!" বলিয়া টুপি হাতে লইয়া অমিয় বাহির হইয়া আসিল; এবং রত্নার পানে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, "তোমায় দেখেই বুঝি কবিরা উষার বর্ণনা লিখেছে!"

রত্নার কপোল ডালিম ফুলের মত রক্তিম হইয়া উঠিল।

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল, "আপনার কবিত্ব মাঠে বসে শুনবো তখন খুব মিষ্টি লাগবে, এখন চল।"

কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে অমিয় কহিল, "গাড়ী চালানো নয়, আরো অনেকখানি মতলব আছে সেই সঙ্গে।"

গাড়ীতে উঠিয়া রত্না কহিল, "আমি তোমার শীটে বসবো, এখন তো ভীড় নেই!"

সহাস্যে অমিয় কহিল, "চাপা পড়ে পড়ুক! গরীব মেথর ধাঙড়—ওদের প্রাণের কি আর দাম আছে ?"

সকৌতুকে রত্না কহিল, "না সিদ্ধার্থ দেব, প্রাণী মাত্রের দুঃখে আমি বিগলিত না হলেও মানুষের প্রাণের দাম আছে আমার কাছে।"

কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে অমিয় ফিরিয়া একবার রত্নার মুখের পানে চাহিয়া আবার গাড়ী চালাইতে লাগিল। কহিল, "হঠাৎ আমায় মূর্ত্তিমান অহিংস ঠাউরালে কি করে সে ?"

"অহিংস না হোক, তেমনি উদাসীন তো!"

"হুঁ!" বলিয়া অমিয় নীরব রহিল।

গাড়ীর মোড় ঘুরিতেই রত্না কহিল, "লেকের দিকে যাচ্ছো ?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া অমিয় কহিল, "কী বললে তুমি, উদাসীন ? তা বটে ! পার্থের মত।

'ব্রহ্মচারী আমি

তব যোগ্য নহি বরাননে !'

রত্নার সুগৌর মুখের উপর শোণিতের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে কহিল, "পার্থ ও কথা বলেছিল চিত্রাঙ্গদাকে—কিন্তু শেষে তার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল। আমি যদি নাটক নির্ব্বাচন করতুম—'চিত্রাঙ্গদা-অর্জ্জুন' করতুম, 'উর্ব্বশী-অর্জ্জুন' করতুম না।"

"কেন করতে না ?"

রত্না কহিল, "উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পেয়েছিল।"

অমিয় কহিল, "তা পেয়েছিল। কিন্তু সে পাওয়া ছিল বিড়ম্বনার মত, নয় কি ?"

রত্না অমিয়র পিঠের উপর হাত রাখিল। কহিল, "এবার আমি চালাই অমিয়দা।"

"চালাও এসে। শীট বদল করি।" বলিয়া গাড়ী থামাইয়া শীট বদল করিয়া অমিয় বসিল। তাহার চোখে-মুখে প্রদীপ্ত উৎসাহ। সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ স্বরে অমিয় কহিল, "প্লেন চালাতে আরও আনন্দ রত্না, তুমি এয়ার-সার্ভিসে ভর্ত্তি হও।"

রত্না চমকিয়া উঠিল। অতীত কথার ছলে এমনি একটি ভবিষ্যৎ-বাণী হইয়াছিল।

শান্ত স্বরে রত্না কহিল, "মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা শক্তি থাকলে কি সব জিনিষ হয় অমিয়দা ?"

"কেন হবে না? চেষ্টায় সংগ্রহ করতে হয়।"

"না অমিয়দা, চেষ্টা করলেও হয় না। আমার মনে একান্ত ইচ্ছা বা যোগ্যতা থাকলেও আমি এয়ার-সার্ভিসে যোগ দিতে বা পাইলট হতে কখনই পারবো না, সে আমার আকাশ-কুসুম!"

"কেন তুমি আকাশ-কুসুম বলছো! কি অসুবিধা তোমার?"

"অসুবিধা! অভাবই মস্ত অসুবিধা!" রত্নার মুখে বিষাদের ছায়া-পাত হইল।

অমিয় শান্ত স্বরে কহিল, "না রত্না, আমি তোমার সে অভাব রাখবো না। তুমি কখনো তোমার অসামর্থ্যের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ো না। তাতে আমিও দুঃখিত হবো।"

রত্নার আয়ত নেত্র হইতে একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

"কাঁদচো রত্না? না, গাড়ী থামাও—এমন উতলা মন নিয়ে গাড়ী চালানো হয় না। থামাও গাড়ী।"

রত্না গাড়ী থামাইল। অমিয় কহিল, "এসো আমরা খানিকটা মাঠে বেড়াই।"

উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল।

রত্নাকে একটা আসনে বসাইয়া পাশে অমিয় নিজে বসিল। রত্নার হাত ধরিয়া মৃদু চাপ দিয়া কোমল স্বরে কহিল, "নিজেকে কখনো অভাবগ্রস্ত মনে করো না রত্না। আমি যেখানে যত দূরেই থাকি, তোমার প্রয়োজনটুকু শুধু আমায় জানিয়ো।" ...

চায়ের টেবলে বসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অমিয় রত্না ?"

বয় জানাইল, বাহার গিয়া।

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "প্রাতর্ভ্রমণ। চা না খেয়ে ?"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার হইল। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "শুনছি তো! আমার অনুমতি নেওয়া বোধ হয় তারা উচিত মনে করে নি।"

গোস্বামী সায়েব সাড়া দিলেন না।

অনিল এতক্ষণ টোষ্ট চিবাইতেছিল। সেটা শেষ হইতে কহিল, "না, ভেবেছে, এখনি তো ফিরবে।"

"তা হোক অনিল। আমি যখন আছি, বাড়ীর মাথা—তখন মুহূর্ত্তের জন্য হোক, অনেক ক্ষণের জন্যই হোক, সকল কাজেই আমার অনুমতি নেওয়া, আমায় জানানো প্রয়োজন।"

গূঢ় ক্রোধের আভাসে মিসেস্ গোস্বামীর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর। অনিল আর সাড়া দিল না। জননী স্নেহ দিতে যেমন কোমল, শাসন করিতেও তেমনি কঠিন, সে তা জানে। মনে মনে রত্নার জন্য সে শঙ্কিত হইল। রত্না জননীর স্নেহের দিকটাই দেখিয়াছে ; তাঁহার কঠোরতার দিক তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু বিস্ময় সেখানে নয়। অনিলের আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল অগ্রজের আচরণ। এ যে অদ্ভুত হেঁয়ালি! মনে মনে চিন্তা করিয়া অনিল তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। জ্যেষ্ঠ কিশোর-কাল হইতে ধীর-প্রকৃতি। অনিলের বাচালতায় কত দিন বিরক্তি-

প্রকাশ করিয়াছে। নিয়মানুবর্ত্তিতার ভক্ত! স্বেচ্ছাচারিতা তার দু' চোখের বিষ! তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল সকলের অজ্ঞাতে রত্নাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া! অনিলের অবিদিত নয়, কত কুমারী জ্যেষ্ঠকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া শেষে নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অনিল নিঃসংশয়ে জানে, চপলতাই ছিল ভ্রাতাকে পাইবার পথে বিশেষ অন্তরায়। কল্পনার প্রচেষ্টা হয় তো এমনি বিপত্তিতে টুটিয়া এক দিন খান খান হইয়া যাইবে! সেই মানুষ রত্নার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অভাবিত জটিল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল কি করিয়া? কেন?

সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টার গোস্বামী পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "এবার বণ্টু এলে বলে দেবো স্পর্শ-মণিটিকে ছাখো! ইনি আমাকে যেমন একেবারে বদল করে নিয়েছেন, তেমনি তোমার মেয়েকে নিজের বলে চিনতে পারবে না!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের আঁধার ফিকা হইয়া আসিলেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না। মিষ্টার গোস্বামী বুঝিলেন, ভার্য্যার মনে ওই যে স্ফুলিঙ্গ রহিল, ইহাকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত না করিতে পারিলে বেচারী মেয়েটির মন শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

মিষ্টার গোস্বামী প্রশংসিত কণ্ঠে কহিলেন, "এ তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা লীলা! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না, প্রথমে যে রত্নাকে দেখেছিলুম—এত অল্প দিনে সে এমন হবে! কি রকম জড়সড় লাজুক ছিল। প্রথম তুমি যেদিন ওকে নাচ শেখাতে গেলে, আমি কিছু না বললেও মনে মনে ভেবেছিলুম, নিজের পাগলামী তুমি বুঝতে পারবে! কিন্তু এখন—"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে এতক্ষণে সকালের মেঘহীন আকাশের আলো

ঝল্-মলানির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌতুক কণ্ঠে তিনি কহিলেন, 'এখন—কি ?"

"এখন—এখন অবাক্ হয়ে যাই ! তাক লেগে যায়—সেই রত্না সেই উর্ব্বশী সেজে আমার বন্ধুদের অবাক্ করে দেবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি। তাই আনন্দ হয়, গর্ব্ব বোধ করি তোমার হাতে গড়া জিনিষ বটে ! তাই তো বণ্টুকে অত করে নিমন্ত্রণ করলুম !"

বেয়ারা ট্রেতে করিয়া ডাকের চিঠিগুলা আনিয়া মিসেস্ গোস্বামীর সম্মুখে ধরিল।

মিসেস্ গোস্বামী সকলের চিঠি বিলি করিতেন। অনিলের চিঠি তাহার হাতে দিয়া আর একখানা তুলিয়া কহিলেন, "এ তো হরিপালের ছাপ। রত্নার চিঠি। তার ঘরে দিয়ে এসো। এই নাও তোমার হরিপালের চিঠি। এখানা আমার মধুপুরের !" বলিয়া বাকী চিঠিগুলা হাকিম সাহেবের কামরায় রাখিয়া আসিতে বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া নিজের চিঠিখানা খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টি বুলাইয়া গোস্বামী হাস্য করিলেন। কহিলেন, "বণ্টুর চিঠি ! সেদিন সে আসতে পারবে না। তার ইস্কুল ইনস্পেক্‌সনে আসবে ! তাই মাপ চেয়েছে।"

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, রত্নার কথা কি লিখেছেন ? তার থিয়েটার করা সম্বন্ধে ?"

"হ্যাঁ গো, ফুল পারমিসন্। মিসেস্ গোস্বামীর বিবেচনার উপর তার পরিপূর্ণ আস্থা ! কন্যা সম্বন্ধে উর্ব্বশী সাজার অনুমতি দিয়েছে ! আর তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে, তুমি তার কন্যাকে নৃত্যে এতখানি পারদর্শী করেছো বলে। রত্নার মাও তোমায় তাঁর আন্তরিক আনন্দ জানিয়েছেন।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "ওদের বাড়ীতে হয় তো হৈ হৈ পড়ে গেছে। পাড়া-গাঁ তো!"

"তা আর বলতে! পুকুর-ঘাটে হয় তো ঝগড়াই বেধে গেল।"

মা হাসিলেন, কহিলেন, "ঝগড়া কি রে? সেখানে হয় তো কত ঘোঁট হচ্ছে—মেয়ে খৃষ্টানী হলো বলে!"

"তা হোক! কিন্তু তারা বলছে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তাই অত ফরফরানি। আঙুর ফল টক্ বলার মত ওরা আমাদের সহরের নিন্দা করে। এ আমি তোমায় বাজি রেখে বলতে পারি।"

মা হাসিতে লাগিলেন।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "আমি অফিস্-কামরায় চললুম।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের সভায় উপস্থিত থেকো।"

"থাকতে পারি। কিন্তু বন্টু যখন আসে নি, তখন তোমাদের নারদ, ভরত হতে রাজি নই।"

মিসেস্ গোস্বামী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "না গো না, তোমাদের বন্ধু-যুগলকে আমি বনমানুষ সাজাচ্ছি না! আমি দর্শক হিসাবে নিমন্ত্রণ করছি।"

"অল্ রাইট! এখন আমি চল্লুম।" বলিয়া গোস্বামী সাহেব প্রস্থান করিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ঘড়ির দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "সাড়ে সাতটা বাজলো, এখনও তারা ফিরলো না।"

যে মেঘখানা হাস্যালাপের সুবাতাসে অন্তর্হিত লইয়াছিল, আবার তাহা ঘনায়মান হইল। গুমোট সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া ত্রস্তে অনিল

কহিল, "রত্নার সব নতুন কি না, তাই ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলে আনন্দ পাওয়া যায়! বোধ হয় ফিরতে তাই দেরী হচ্ছে!"

অপ্রসন্ন মুখে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "সেই জন্যই রত্নাকে আমি বিশেষ কিছু বলি না। কিন্তু আজকের আচরণটা তার শুধু বাড়াবাড়ি নয়, গর্হিত, এ তোমায় স্বীকার করতে হবে।"

"না, তাতে আমি না বলছি না, পাড়াগেঁয়ে বুনো মেয়ে ও অত এটি-কেটের ধার ধারে না। ওর সৌভাগ্যই ওকে তোমার স্নেহচ্ছায়ায় এনেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "মেয়েটার বিয়ে যদি একটা বড় ঘরে দিতে পারি!"

অনিল চুপ করিয়া রহিল।

মিসেস্ গোস্বামী একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছে থাকলে কি হবে! ওর বাপ যে বড্ড পাড়া-গেঁয়ে! বড় ঘরের ছেলেরা শ্বশুর-বাড়ীর একটা পোজিসন্ খোঁজে। এই ছাখো না, আমি যখন তোমাদের বিয়ে দেবো, তখন আমার সমকক্ষ ঘরই খুঁজবো! শুধু রূপ দেখলেই তো চলবে না!"

"কিন্তু মা, রূপের সঙ্গে যে সকলকার সব থাকবে, তা তো হতে পারে না।"

"তা না হতে পারে। তবে একটা পরিচয়ের কামনা সকলেই করে। দু'টো হাই-ফ্যামিলির সঙ্গে নিকট না হোক, দূর কনেকসন আছে, লোকে দেখতে চায়।"

"তা বটে!" বলিয়া অনিল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "এই কল্পনাকেই ছাখো। রত্নার চেয়ে ওকে দেখতে ঢের নীরেস। যার চোখ আছে, সেই স্বীকার করবে।

কিন্তু তা বললে কি হয়—ওর বাপ ছিল স্যার—হাইকোর্টের জজ। ভাই ম্যাজিষ্ট্রেট। ওর পরিচয়ই আলাদা। জানা-শোনা, মেলা-মেশা সে ওর ঢের বেশী। আমি রত্নাকে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মানলেও ইন্দ্রাণীর পার্টটা কল্পনাকে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করলুম; তুমি কি বলো?"

নীরস স্বরে অনিল কহিল, "না, ও কিছু খারাপ পার্ট করে নি!"

টেলিফোন বাজিল।

আরদালী আসিয়া জানাইল, 'চ্যাটার্জ্জি মিসিবাবা, হাকিম সাহেবকো সেলাম ভেজা।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অনিল, তুমি বলো গে অমিয় বাড়ী নেই।"

অনিল গিয়া কল্পনাকে জানাইল, "দাদা প্রাতভ্রমণে বের হয়েছেন।"

কল্পনা প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ?"

অনিল উত্তর দিল, "ঠিক জানি না। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখি নি।"

"আচ্ছা। অনুগ্রহ করে রত্নাকে একবার ডেকে দিন্।"

অনিল কহিল, "সে-ও নেই।"

"সে কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠে তাকেও দেখেন নি?"

অনিল কহিল, "না। সে-ও দাদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।"

বিদ্রূপের স্বরে কল্পনা উত্তর দিল, "ওঃ! আচ্ছা, আপনি তাহলে এখন একা?"

"না, মার সঙ্গে গল্প করছিলুম।"

"মাসিমা! আচ্ছা তাঁকে বলবেন—আজ আমার যেতে দশ মিনিট লেট হবে। তিনি রাগ না করেন।"

"বেশ। আর কিছু বলবার আছে?"

"না।" বলিয়া কৌতুক কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "দেবরাজ, আসি তবে, বিদায়, নমস্কার।"

সহাস্যে অনিল কহিল, "আশীর্ব্বাদ দিলাম ইন্দ্রাণি! যাত্রা হোক শুভ তব।"

২০

সন্ধ্যার আসরে সকলে সম্মিলিত। বড় হল-ঘরে সভা বসিয়াছে। ঘর যেন গম্ গম্ করিতেছে। নাটকের আজ পূর্ব্বাভিনয়-রাত্রি। বিচারকের আসনে গোস্বামী সাহেব তাঁহার দুই অন্তরঙ্গকে লইয়া বসিয়াছেন। নাটকের দোষগুণ, ত্রুটি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ্যতার আজ পরীক্ষা।

অনিলের পরিচালিত যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান থামিল।

যবনিকা উত্তোলিত হইল। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী বেশে কল্পনা ও অনিল রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

তাহাদের চিন্তা, কথা, সখীদের নাচগান একে একে শেষ হইল। গোস্বামী সাহেব তারিফ করিলেন—"কল্পনার পার্ট সুন্দর হয়েছে।"

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন, "মিসেস্ গোস্বামী চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন।"

এবার অপ্সরাদের নৃত্যগীত। মিষ্টার গোস্বামী সপ্রশংস নেত্রে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "আমি যদি একটা থিয়েটারের ব্যবসা করতুম, তোমাকে ডিরেক্টর করতুম।"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তাঁহার পরিচালনায় যে নাটক অভিনীত হইতেছে, তাহার মনোরম বৈশিষ্ট্য সকলের মনোহরণ করিতে

পারিবে, এই উপলব্ধি গর্ব্বের মত তাঁহার অন্তরকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "'ষ্টেটসম্যানের' ফটোগ্রাফারকে এনে রাখবার ব্যবস্থা করেছি আমি।"

মিষ্টার গোস্বামী হাসিলেন।

মিষ্টার বাকৃচি নিজের কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "বয়স থাকলে আমিও এ অভিনয়ে যোগ দিতুম।"

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন, "বেশ তো, আসুন না! আপনাকে বেছে একটা পার্ট আমি দিচ্ছি।"

মিষ্টার গ্যাংলি কহিলেন, "অষ্টাবক্রের পার্ট যদি থাকে বাকৃচিকে দিন। আমি গ্যারাণ্টি, বাকৃচি সাকসেসফুলি প্লে করবে।"

আবার একটা হাসির তুফান উঠিল।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন, "গ্যাংলি, তুমি আমার গাউট আর সায়েটিকা নিয়ে ঠাট্টা করছো! শীত পড়ার সঙ্গে রোগটা বেড়েছে, কিছু বলতে পাচ্ছি না। তবে অক্সফোর্ডে যখন পড়তুম, হ্যাঁ, নাচ তখন কিছু কিছু শিখেছিলুম বৈ-কি! ওদিকে সখ ছিল। মামার এ পক্ষে নেহাৎ ছেলে হ'য়ে পড়লো। কে জানে, আদিম মামী ফস্ করে মরে যাবে, মামা পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার ভাগ্যবান হবেন। পুত্রমুখ দর্শন করবেন!"

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন, "তার পর?"

"তার পর চিঠিতে এই শুভ সংবাদ পেয়ে 'পুনর্মূষিকো ভব'র মত নাক-কান বুজে পি, এইচ, ডি, পাশ করে ফিরতে হলো। অন্ন-চেষ্টা আছে তো!"

গ্যাংলি কহিলেন, "তার পর সারাজীবন গরু ঠ্যাঙাচ্ছ !"

"যা বলেছ ! আজকাল আবার শুধু ছাত্র নয় ! ছাত্রীরাও আক্রমণ করেন। বিশেষ এগজামিনের পর। সে কি ঘোরাঘুরি ! জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "না, সে রকমে আমি প্রশ্রয় দিই না।"

গ্যাংলি কহিলেন, "অর্জ্জুনের পার্ট তো কুমিল্লার ভাগ্য-বিধাতা করবেন ?"

"হ্যাঁ, সব্যসাচীর পার্টে অমিকেই আমি বেশী পছন্দ করি।"

সহাস্যে অমিয় কহিল, "আমার কিন্তু বিশেষ আপত্তি ছিল। ও শাপ গাল খেতে আমি রাজি নই। তাকে মিথ্যা বুঝে কি নাস্তা-নাবুদই করলে, ওঃ, একেবারে টেরিব্‌ল্ !"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তুমি পার্ট বদলে নাও নি কেন ?"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অমি মুখে যাই বলুক, অর্জ্জুনের পার্টেই ওকে মানায় ভালো। করেও চমৎকার। নাও, অমি উঠে পড়ো !"

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন, "হ্যাঁ, প্রচণ্ড বিক্রমে স্বর্গপুরী আক্রমণকারী অসুরকে নিপাত করো। ভালো, আপনাদের ইন্দ্রাণী কিন্তু চমৎকার হয়েছে !"

কল্পনার পানে স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "হ্যাঁ একজন ট্যালেণ্টেড্ এ্যাকট্রেশ !" বলিয়া তিনি পরিচয় দিলেন, "ও আমাদের সুশীলের বোন।"

"কে সুশীল ? রায়পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল চ্যাটার্জ্জি ?" মিষ্টার বাকৃচি প্রশ্ন করিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "হ্যাঁ ! অমিয়র বিশেষ বন্ধু। আমাদের ছেলের মত।"

গ্যাংলি কহিলেন, "মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে 'দেবযানী' প্লে করতে আমি দেখেছিলুম।"

মৃদু হাস্তে কল্পনা উত্তর দিল, "হ্যাঁ! এম্পায়ারে আমরা শকুন্তলা অভিনয় করেছিলুম।"

মিষ্টার বাক্‌চি কহিলেন, "আমি তখন মুসোরিতে! কাগজে খুব সুখ্যাতি পড়েছিলুম বটে।"

গ্যাংলি কহিলেন, "ও, সেই জন্যে অভিনয় এত ভালো হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের গ্রুপে আপনিই হচ্ছেন বেষ্ট।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "অনিলও ইন্দ্রের ভূমিকা বেশ করেছে।"

"হ্যাঁ, প্রশংসাযোগ্য বটে! আমি দেবযানীর গানের সুখ্যাতি করছি।"

মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, চিত্রলেখার ভূমিকায় যাহারা নামিয়া ছিল, মিসেস্ গোস্বামী তাঁহার সেই ছাত্রীদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

আবার ইন্দ্রের সভা। মন্ত্রণা-বৈঠক। ভরত মুনি, নারদ মুনি সব বসিয়াছিলেন। গভীর গবেষণা হইতেছে, পার্থ ধনুর্দ্ধরকে কেমন করিয়া কি ভাবে স্বর্গে অভিনন্দিত করা হইবে।

গ্যাংলি পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন, "মিসেস্ গোস্বামীর পরিচালনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার মনে হচ্ছে, যাকে যে পার্ট দিয়েছেন, সে যেন তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, উর্ব্বশী কাকে দিয়েছেন?"

"সে আমাদের জানা একটি মেয়ে।"

মিষ্টার গোস্বামী সচকিতে কহিলেন, "কই? রত্না কোথায়? বলিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, সকলের পিছনে দূরে একটা কোণে চুপ করিয়া রত্না বসিয়া আছে। কোমল মুখে ক্ষুণ্ণতার অতি সূক্ষ্ম ছায়া যেন জড়াইয়া আছে।

মিষ্টার গোস্বামী স্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন, "রত্না লক্ষ্মী—"

মিসেস্ গোস্বামী স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "ও কি রত্না, তুমি অত পিছনে বসেছো কেন?" বলিয়া সহাস্যে স্বামীর বন্ধুদের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ওর সবে এই হাতে-খড়ি!"

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন, "এত বড় একটি ভূমিকা দিচ্ছেন!"

গোস্বামী সাহেব উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, প্রথম হলেও রত্নার উপর মিসেস্ গোস্বামীর বিশ্বাস অনেকখানি।" কথাগুলা অতি সাধারণ, কিন্তু তাঁহার উচ্চারণের প্রত্যেক শব্দে তিনি এমন জোর দিলেন যে, ইহা লইয়া কেহ আর প্রতিবাদ করিল না।

কল্পনা একেবারে অমিয়র পাশে নিজের আসন লইয়াছিল। কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া অমিয়র কানে কহিল, "রত্নার সৌভাগ্য, মিষ্টার গোস্বামী অবধি তার তরফে আছেন।"

ঈষৎ হাস্যে তেমনি মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমিও তাই কামনা করি।"

অমিয় বা কল্পনার কোন বাণীই রত্নার কানে পৌছাইল না। দূর হইতে নির্নিমেষ নয়নে সে শুধু উভয়কে দেখিতেছিল।

মিসেস্ গোস্বামীর আহ্বানে রত্না উঠিয়া মন্থর গতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টি নিপতিত হইল রত্নার উপর।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ফাল্গুনী তোমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসো।"

সভাসদ্ যে যার আসন গ্রহণ করিল। এবার উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইবে।

রত্না চাহিয়া দেখিল, কল্পনার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইল অনিল।

কল্পনার বাঁ দিক্‌কার আসন অধিকার করিয়া বসিল অমিয়।

একতান আরম্ভ হইল। এবং তাহা থামিতেই ইন্দ্রাণী পার্থের পরিতোষের জন্য উর্ব্বশীকে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন।

কল্পনা রাজ্ঞী, রত্না তাহার সভা-নর্ত্তকী।

হঠাৎ রত্নার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। নাক, কান দিয়া যেন প্রচণ্ড উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। কঠোর আয়াসে আত্ম-দমন করিয়া সে গান আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কোকিল-কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর কেবলই জড়িমা-যুক্ত হইতে লাগিল। সে স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস-ধারা যেন উপলকণ্ঠে প্রতিহত।

নৃত্যে রত্না ছন্দ হারাইল। তাল, লয় কেবলই কাটিতে লাগিল। দর্শকদের চোখে প্রতিপদে তাহার ত্রুটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

পার্থের আসনে বসিয়া অমিয় বিস্ময় দৃষ্টিতে রত্নার পানে চাহিল। অনিল বিমূঢ়! মিসেস্ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার! মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে বিদ্যুতের মত থমকিয়া থমকিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইতে লাগিল। কল্পনার ওষ্ঠপুটে হাসি।

ঘরে সকল প্রাণীর মুখেই পরিবর্ত্তনের রেখা। ভাবান্তর ঘটিল না শুধু মিষ্টার গোস্বামীর প্রশান্ত মুখে। স্নেহ-কোমল চক্ষেই তিনি রত্নার ভুলচুক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার প্রসন্ন।

উর্ব্বশীর নৃত্য শেষ হইতে মিসেস্ গোস্বামী ঘোষণা করিলেন, "পার্ট বদলাতে হবে।"

সকলে উৎসুক নেত্রে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

বাকচি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "এটা মেন্ পার্ট! এমন ফেলিয়োর! এক জন বেটারকে চাই!"

মিসেস্ গোস্বামী আঁধার-মুখে কহিলেন, "হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে! যাক, আমি শুধরে নেবো!"

কৃত্রিম সহানুভূতি ঢালিয়া কল্পনা বিলাতী মেমের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া কহিল, "রত্নার বোধ হয় শরীর তেমন ভাল নেই। তাই আজ তেমন পারলো না। মাসিমা তো বলেন, ও সকলের চেয়ে ভালোই করে।"

অনিল উত্তর দিল, "মিথ্যে বলেন না।"

লজ্জিত মুখে সঙ্কুচিত পদে রত্না যে সরিয়া গেল, অনিলের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। এতগুলা দৃষ্টির সম্মুখে এমন পরাভব হইলে মানুষ মরমে মরিয়া যায়! সে অনুভূতি অনিলের ছিল।

পিতার ন্যায় অমিয়ও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল। আজিকার অভিনয় রত্নার জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল! এ যেন আঘাতের মত তাহার বুকে বাজিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন, "কল্পনা—"

সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর হইল, "মাসিমা—

"তোমার মাসিমার মেয়ে, না, কে, বলছিলে না—কি নাম তার?"

কল্পনা কহিল, "পারুল মুখার্জ্জি! এ বছর বি-এ পাশ দেবে। বার-কয়েক সে পারফারমান্সে নেমেছে।"

"তাকে চাই! কীর্ত্তন ইন্‌ষ্টিটিউটে সে না গান করে—আমি নাম শুনেছি তার। বসন্ত-উৎসবে এম্পায়ারে নেমেছিল, তাকে আনাতে পারবে?"

হাসিয়া কল্পনা কহিল, "আপনি ডেকেছেন শুনলে সে ছুটে আসবে। আমায় তো সেদিনও বলছিল, তোদের নাটকে আমায় একটা পার্ট দিলি নি!"

"তবে তুমি আমার নাম করে তাকে ডাকো মা।"

উৎসাহিত মুখে কল্পনা কহিল, "আপনি যদি বলেন, আমি এখনি আপনার নাম করে তাকে ফোন করতে পারি।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তাই করো।"

গ্যাংলি কহিলেন, "আপনি কি মনে করেন, একটা দিনের মধ্যে মিস্ মুখার্জ্জি তাঁর ভূমিকা তৈরী করে নিতে পারবেন ?"

"নাও যদি পারে—তবু এ উর্ব্বশীর চেয়ে ভালো হবে। আমি চেহারার দিকে চেয়েই উর্ব্বশী নির্ব্বাচন করেছিলুম।"

অমিয় প্রশ্ন করিল, "উর্ব্বশীর ভূমিকা থেকে রত্নাকে তুমি ক্যান্সেল করলে ?"

দৃঢ় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "নিশ্চয় !"

অমিয় নীরব রহিল।

অনিল কহিল, "একটা দিন মোটে মিস্ মুখার্জ্জি পাচ্ছেন, যদি তিনি ফেলিয়োর হন ? তার চেয়ে রত্না খানিকটা তৈরী করেছে—ক'দিন তো করছে।"

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন। কহিলেন, "তোমরা এখনও সে আশা করো! কিন্তু আমি করি না। এই ক'জন নতুন লোকের সামনে ওর যদি এই হয়, তাহলে সেদিন অত লোকের সামনে কি হবে না, বলতে পারো ?"

কল্পনা কহিল, "সে একটা ভাবনার কথা।"

"তুমি বল তো মা !" বলিয়া তিনি কল্পনার পানে চাহিলেন। কহিলেন, "তোমাদের এ সব অভ্যাস আছে ! রত্নার তো তা নয়। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে ! এটুকু এরা বোঝে না।"

অনিল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তবু তো একটা দিক্ নিখুঁত হবে, উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য !"

বাকৃচি অনিলের দিকে চাহিলেন, "এটা বিউটী একজিবিসন হচ্ছে? না, আর্টের বিচার? আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী, আপনার সেট থেকে কাউকে উর্ব্বশী করুন না! তার পার্ট ওই মেয়েটিকে দিন! একটু অদল-বদল!"

মিসেস্ গোস্বামী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তাই করি। কিন্তু কল্পনা, তুমি মা তোমার পারুল বোনটিকে ফোন করো। কি বলো অমিয়?" কথাটা বলিয়া পুত্রের সমর্থন লইতে গিয়া দেখিলেন, নির্ব্বিকার চিত্তে চেয়ারে হেলিয়া ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া অমিয় গৃহের শিলিংয়ের কারুকার্য্য দেখিতে অকস্মাৎ মনোযোগী হইয়াছে।

ব্যঙ্গ হাস্যে কল্পনা কহিল, "মিষ্টার গোস্বামী হঠাৎ এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করতে চাইছেন না কি?"

অমিয় মুখ ফিরাইল। কহিল, "ক্ষতি কি? মনটা সব সময় একটা কাজে জুড়ে রাখলে অন্ততঃ পাশের লোকগুলো একটু অব্যাহতি পায়।"

কল্পনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

২৮

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি তাহলে ফোন করো কল্পনা। দ্যাখো, পারুল যদি এখন আসতে পারে।"

কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোস্বামী সাহেব এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এখন পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "কল্পনা কাকে ফোন করবে লীলা?"

মিসেস গোস্বামী কহিলেন, "কথাগুলো কি এতক্ষণ শুনছিলে না?"

"শুনছিলুম! তবে তোমার ব্যবস্থায় হাত দেওয়া উচিত নয় ভেবে নীরব শ্রোতা হয়েছিলুম।"

হাসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "হঠাৎ তাহলে এখন বক্তা হয়ে উঠলে যে!"

গোস্বামী কহিলেন, "মহাভারতের উপদেশ মনে পড়লো।"

গ্যাংলি রঙ্গ করিয়া কহিল, "গোস্বামী এতক্ষণ ধরে অষ্টাদশ পর্ব্ব হাতড়াচ্ছিলে না কি?"

"হ্যাঁ, বামুনের ছেলে! ধড়া-চুড়োয় যতই সাহেব সাজি, ভিতরে রক্তের পোকাগুলো মাঝে মাঝে বন্ বন্ করে ওঠে।"

বাকৃচি হাসিয়া কহিলেন, "তা সত্যি! কিন্তু হঠাৎ সে পোকা-গুলো এমন সময়ে মাথা নাড়া দিলে কেন?"

গোস্বামী সাহেব মাথা নাড়িলেন। কহিলেন, "ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। বিচারকের কাছে গজ্ গজ্ করা পেশা—নীরবতা তাই হঠাৎ কেমন বিঁধলো। মনে পড়ে গেল, মহাভারতের অনুশাসন।"

মিসেস্ গোস্বামী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইলেন, কহিলেন, "সে অনুশাসনটা কি, শুনি।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "সভায় উপস্থিত থাকলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, না হলে পতিত হবো।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কোথায় কি অন্যায় পেলে?"

ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "একটু যেন পাচ্ছি মনে হচ্ছে!"

সকলেই উদ্‌গ্রীব নেত্রে গোস্বামীর পানে চাহিল।

অমিয়, অনিল মনে মনে শঙ্কিত হইল। মা নিজের মত বাহাল রাখিতে কতখানি দৃঢ়, ভালরূপেই তাহা তাহারা জানে।

মৃদু হাস্যে কোমল কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "সে অপ্রিয় আলোচনা বাদ দাও না লীলা! আমি বলি, তোমার সিলেকসন কখনো ভুল হয় না। তুমি যাকে যে ভূমিকা দিয়েছো, তার যেন অদল-বদল না হয়! তাতে যে যেমন পারে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "ভালো যুক্তি! কিন্তু গোল বাধবে ওইখানে, যারা নিমন্ত্রণ পেয়ে দেখতে আসবে। তারা জানবে, আমার পরিচালনায় এ নাটক অভিনয় হচ্ছে—কাজেই তার দোষ-গুণের জন্য আমাকেই তারা দায়ী করবে।"

হাসিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "করুক না, এ তো একটা উৎসব! এখানে শুধু আনন্দের পরিমাপ-বিচার।

অবাক্ হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অভিনয়টা ফেলিয়োর হবে?"

সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "এতগুলো শিল্পীর সাফল্য, তোমার এতখানি উৎসাহ, চেষ্টা—এ সব একটি মানুষের জন্য ফেল হতে পারে না। আমি বলি, রত্নাকে তুমি নিজের হাতে যে পার্ট দিয়েছো, তার বদল না করাই ভালো।

মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে বিরক্তি বোধ করিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া শান্ত স্বরেই তিনি বলিলেন, "তোমার কথা রাখতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু এত বড় একটা ভূমিকা এমন একজন আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটী করতে পারি না।"

পত্নীর মনের দৃঢ়তা গোস্বামী বুঝিলেন। তথাপি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না; অনুরোধের কণ্ঠে কহিলেন, "আজ না পারলেও সে দিন যে পারবে না, তার মানে নেই।"

অসহিষ্ণু স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি বুঝছো না! পাঁচ জনকে দেখলে রত্না ভেবড়ে যাবে। যাওয়া স্বাভাবিক।"

গোস্বামী হাসিলেন। কহিলেন, "সে সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। তুমি দেখো, রত্না উর্ব্বশীর ভূমিকা সেদিন ভালোই করবে লীলা।"

মিসেস্ গোস্বামী নীরব রহিলেন।

নিজের আসনে বসিয়া কল্পনা কহিল, "মাসিমা, আমিও বলি, সেই ভালো।"

গোস্বামী সাহেব কল্পনার দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল তো কল্পনা।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "রত্না কোথা গেল ?"

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার শূন্য আসনের দিকে চাহিলেন, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্না কখন্ উঠে গেল ?"

কল্পনা উত্তর দিল, "সে তো বসে নি! তার নাচ শেষ হতেই সে চলে গেছে।"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে রোষের রক্ত আভা ফুটিল। নীরস কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমায় না জানিয়ে চলে গেল!"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বোধ হয় তোমার অনুমতি নেবার মত শরীর তার ছিল না। পাছে তুমি ভাবো, তাই নিঃশব্দে চলে গেছে। তার মুখ আজ ভারী শুকনো দেখাচ্ছিল।"

মিসেস্ গোস্বামী স্বামীর এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কোন জবাব না দিয়া কহিলেন "কল্পনা, তুমি পারুলকেই আনবে—সে উর্ব্বশী সাজবে।"

"তা হতে পারে না লীলা!" গোস্বামী সাহেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

সচকিত হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কেন হতে পারে না ?"

"এটুকু তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেটা আমার জন্মদিন!"

হতভম্বের মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তাতে কি হয়েছে ?"

মৃদু হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তুমি এত বড় উৎসবের আয়োজন ক'চ্ছ আমায় তৃপ্তি দিতে! যাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করলে, আজ তাকে বাদ দিলে লক্ষ্যচ্যুত হবে।"

অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদের মত মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কিন্তু—"

গোস্বামী কহিলেন, "না লীলা, কিন্তু নয়! আমার জন্মদিনে আমি প্রত্যেককে আনন্দ দিতে চাই! সে আনন্দে কেউ যেন না বাদ পড়ে। তা ছাড়া ফেলে-আসা একটা দিনকে স্মরণ করেই না এই উৎসব! কাজেই রত্নাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না।"

অধীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "বাদ তো তাকে দিচ্ছি না।"

দৃঢ়স্বরে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বাদ দেবার কথা হচ্ছে না! রত্নাকে তুমি যে ভূমিকা দিয়েছিলে, তার বদল হবে না। রত্নাকে ক্ষুণ্ণ করার অর্থ আমার জন্মদিনে আমাকে ক্ষুণ্ণ করা। কারণ, রত্নাকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসি। সকলের চাইতে সে আমার স্নেহের পাত্রী!"

একটা অতি সামান্য উত্তরও কাহারও মুখে ফুটিল না।

মিসেস্ গোস্বামী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

২২

পরাভবের ধিক্কার, লজ্জা ও গ্লানি মাখিয়া রত্না যখন হল-ঘর ছাড়িয়া আসিল—তাহার কর্ণে শুধু এইটুকু পশিল, মিসেস্ গোস্বামী কহিতেছেন, "ভূমিকা বদলানো চাই!" তাঁহার স্বর বেশ তপ্ত!

বাকী কথাগুলো রত্না দাঁড়াইয়া আর শুনিতে পারিল না। দ্রুতপদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। পথে পড়িল গোস্বামি-গৃহের প্রধানা পরিচারিকা মঙ্গলা।

তাহাকে দেখিয়া রত্না কহিল, "মঙ্গলাদি, মাসিমাকে বলো, আজ আমি কিছু খাবো না।"

মঙ্গলা ভদ্র-ঘরের বিধবা। গোস্বামি-প্রাসাদের গৃহিণীপণা, সকলকার আহারের পরিচর্য্যার ভার তাহার উপর।

মঙ্গলা কহিল, "কিছু খাবে না। একটু দুধ-মিষ্টি বা কিছু ফল ?"

শ্রান্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কিছুই খাবো না।"

নিজের ঘরে পা দিয়া রত্না কপাট বন্ধ করিয়া জুতা-মোজা খুলিয়া আলো নিবাইয়া একেবারে বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িল।

একটা নিশ্বাস পড়িল। যাক্, আজিকার মত অব্যাহতি! গোস্বামি-গৃহে খাইবার অনিচ্ছা জানাইয়া দিলে আহারের আর তাগিদ আসে না! এবং অভুক্ত থাকার জন্য কৈফিয়ৎ লইতেও কেহ ছুটিয়া আসে না। একটু বিশ্রাম ও বিরাম পাওয়া যায়।

কিন্তু এখন আহারে বিতৃষ্ণা লইয়া বালিশে মাথা রাখিতেই দপ করিয়া নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়িল। সেখানে কোন মান-অভিমান লইয়া দুদণ্ড উপবাসী থাকিলে মায়ের আহারের তাগিদ, জিদ, জবরদস্তি যেন উৎপাতের মত অস্থির করিয়া অনশন-সঙ্কল্পকে ভাঙ্গিয়া দিত।

বাড়ীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্নার মনে পড়িল, মা তাহাকে বাড়ী যাইতে কত করিয়া লিখিয়াছিল। মায়ের আহ্বানকে রত্না উপেক্ষা করিয়াছে গোস্বামি-গৃহের তীব্রতম আকর্ষণে! মন ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু অন্তরে সে জন্য অনুতাপ জাগিল না! সমস্ত চিন্তাকে সরাইয়া ঠেলিয়া

মিসেস্ গোস্বামীর সেই অন্ধকার মুখ রত্নার মানস-দৃষ্টিতে ভাসিতে লাগিল। ইহা লইয়া মিসেস্ গোস্বামীকে অভিযুক্ত করিতেও মন পরাঙ্মুখ হইতেছিল। মন বলিতেছিল, তিনি যে রত্নার উপর অনেকখানি আশা রাখিয়াছিলেন। আশা-ভঙ্গের মনঃপীড়া ক্ষুব্ধ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করে; সেই জন্যই মিসেস্ গোস্বামীর আচরণ রত্নার অন্তরে তেমন ক্লেশ দিতে পারিতেছিল না শুধু ঐ কল্পনার জন্য মর্ম্মদাহ হইতেছিল, সমস্ত মন যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

কল্পনা যখন দেবেন্দ্রাণী সাজিয়া অনিলের পাশে বসিল, মন তখন পীড়া অনুভব করিলেও, এমন করিয়া জ্বলিয়া ওঠে নাই! কিন্তু অমিয় যে মুহূর্ত্তে কল্পনার বাঁয়ে বসিল, সে দুঃসহ দৃশ্যে রত্নার বুক যেন হু হু করিয়া উঠিয়াছে!

দূরে বসিয়া রত্না তাহাদের এতটুকু কথা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু অমিয়র মুখের হাসি ও কল্পনার সেই ক্ষণে ক্ষণে আরক্ত মুখ রত্নার মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল!

রত্না স্থির নেত্রে দু'জনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। এবং দুর্জ্জয় আগ্নেয়গিরি যেমন অন্তরে কালান্তক অনল-প্রবাহকে ভরিয়া বাহিরে শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে, তেমনি বহু আয়াসে সে নিজেকে শান্ত রাখিয়াছিল। এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় হৃত-সর্ব্বস্বের দীনতা লইয়া নত শিরে সে অভিনয়-স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

রত্নার মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল। দুই হাতে রগ চাপিয়া নিদ্রার চেষ্টায় চক্ষু মুদিল। কিন্তু নিমীলিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল অশ্রু-প্রবাহ। মনকে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। এ নিষ্ফল কান্নায় কেন নিজেকে অপমানিত করা! কিন্তু ক্রন্দন কিছুতেই নিষেধ মানিল না, উৎসের মত ঝরিতে লাগিল।

ঘড়ির বাজনায় অনেকক্ষণ পরে রত্না চক্ষু মুদিল। মধ্য-রাত্রি। গোস্বামি-প্রাসাদ নিস্তব্ধ। রত্না বুঝিল, আগন্তুকের দল গৃহে ফিরিয়াছে।

দৃষ্টির বাহিরে যাহা অতীন্দ্রিয়, রত্নার দৃষ্টিপথে তাহাই যেন ভাসিতে লাগিল। মানষ-চক্ষে সে দেখিল—কল্পনার আনন্দ-দীপ্ত মুখ! তাহার সাফল্যে পুলকিত অমিয় নিজে তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিবার জন্য আসন ত্যাগ করিল। প্রত্যেকের সপ্রশংস দৃষ্টি কল্পনার উপর ন্যস্ত! বিদায়-সম্ভাষণে মিসেস্ গোস্বামী আহ্লাদের সহিত তাহার গাল দু'টি টিপিয়া দিলেন! 'মা' বলিয়া একটু আদর করিলেন। কল্পনার দুই গাল পাকা আপেলের মত রাঙা হইল, অমিয়র মুগ্ধ দৃষ্টি সেইখানে নিবদ্ধ! উঃ! বলিয়া রত্না পাশ ফিরিল।

রত্না ঠিক করিল, কাল সকালে মিসেস্ গোস্বামীকে সে জানাইযা দিবে উর্ব্বশীর ভূমিকা অভিনয় করিবার সামর্থ্য তার নাই। কল্পনা যেখানে রাণী, অভিসারিকার মত রত্না সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না।

মনে হইল, তাহার জীবনটা মিথ্যা! সকলে তাহার রূপের যে এত প্রশংসা করে, সে রূপ মিথ্যা! উজ্জ্বল রবি-কিরণের মত এই রূপ তাহাকে দগ্ধ করিবে। স্নিগ্ধ শরৎ-কৌমুদির মত কোনো দিন মনে প্রীতি বা আরাম দিবে না!

রত্না ভাবিল, কেন এমন হইল? চোখে আঙুল দিয়া মন বলিল, সামাজিক মর্য্যাদা! মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার পরিচয় দিতে নিজেই যে গৌরবে দুলিয়া ওঠেন। কল্পনা যে সেই নিমেষের জন্য তাহার পানে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টিতে কি করুণাই না মাখানো ছিল। গোস্বামী সাহেবের সস্নেহ আহ্বানে যখন সকলের সামনে আসিল তখন সকলের বিস্মিত দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন জাগিল, মিসেস্ গোস্বামী এই বলিয়া তাহার

উত্তর দিলেন, ও আমাদের একটি মেয়ে—বাস্তবিক, এই পদগৌরবশালীদের সামনে কোন অখ্যাত গ্রামের এক মাষ্টারের মেয়ে বলিতে গৌরবের কি আছে? সে পরিচয় দিলে সভ্য সম্প্রদায়ের কাছে রত্নাকে যেন খর্ব্ব করা হইত।

২৩

এমনি মর্ম্মান্তিক বেদনায় নিদ্রাহীন চক্ষে রত্না যখন বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছিল, ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে জর্জ্জরিত হইতেছিল সেই সময়ে অন্য এক প্রাসাদের সুরম্য প্রকোষ্ঠে আর একটি তরুণীও জটিল সমস্যা লইয়া বিনিদ্র নেত্রে নিজের শয্যায় জাগিয়া ছিল—সে কল্পনা!

কল্পনা যখন বাড়ী ফিরিল, উল্লাসে তাহার মন তখন পরিপূর্ণ।

দাদার ঘরে ঢুকিয়া দাদা ও বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "তোমরা যাচ্ছ তো পরশু?"

সুশীল এবং ইভা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়।"

সুশীল কহিল, "আজ তোদের ফুল রিহর্শাল ছিল তো!"

কল্পনা কহিল, "হ্যাঁ, দিয়ে এলুম।"

ইভা তাহার সস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "তোমার পার্ট বুঝি খুব সুন্দর হয়েছে?"

হাসিতে হাসিতে কল্পনা কহিল, "হ্যাঁ, সকলের চেয়ে ভালো, তোমরা তো যাচ্ছ, দেখতেই পাবে। পারুলদিরও বোধ হয় ওখানে ডাক পড়বে।"

সুশীল কহিল, "পারুলকে কেন?"

"উর্ব্বশী সাজবার জন্য। উর্ব্বশী নিয়ে মিসেস্ গোস্বামী ভারী বিপদে পড়েছেন। যেন সাপের ছুচো-গেলা!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ইভা কহিল, "কি রকম? উর্ব্বশীর অসুখ করলো না কি? তোমার দাদার তাহলে থিয়েটার দেখা মাটী! উর্ব্বশীর নামে উনি একেবারে পাগল।"

মুখ বিকৃত করিয়া কল্পনা কহিল, "অসুখ না হাতী! সে একটা পাড়াগেঁয়ে জংলী, বুঝলে কি না বৌদি!"

ইভা গালে হাত দিল। কহিল, "অবাক করলে! বলো কি? এমন রূপসীকে কেউ উর্ব্বশীর পার্ট সিলেক্ট করে! এরা পাগল না কি?"

উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "বলে কে, বলো! আজ তেমনি জব্দ।"

বিমূঢ় সুশীল কহিল, "সে কি রে! উর্ব্বশী জংলী কি রকম?"

"চেহারাতে বলছি কি! তা নয়। জংলী চাল-চলনে। রীতিমত বুনো! সেই যে বৌদি রত্না, আমাদের বোর্ডিংএ থাকতো, তোমায় গল্প বলতুম।"

ইভা মাথা নাড়িল। কহিল, "ওঃ! বুঝেছি। তাই বলো, তা সে তো খুব সুন্দরী।"

তাচ্ছল্য-সহকারে কল্পনা কহিল, "রঙটা একটু কটা বটে!"

সুশীল কহিল, "তোদের উর্ব্বশী শুধু গায়ের রঙে কি রে, সব দিকেই তো পরমা-সুন্দরী!"

অবজ্ঞাভরে কল্পনা কহিল, "কে জানে বাপু, তোমরা সব কি চোখে তাকে দেখেছো! আমি তো এমন কিছু দেখি না। তবে হ্যাঁ, মুখখানা মন্দ নয়!"

সুশীল হাসিল। কহিল, "মেয়েরা কখনও অন্য মেয়েকে সুন্দরী দেখে না। হাঁ রে, অমিয় তো তাকে বিয়ে করবে?"

ইভা হাসিয়া কহিল, "দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বলো।"

দু'চোখ কপালে তুলিয়া কল্পনা কহিল, "কি যে বলো বৌদি! ঐ জংলী পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে! এ তোমরা ভাবতে পারো?"

সুশীল কহিল, "আমাদের ভাবতে কিছু হবে না! যিনি ভাববার, তিনিই ভাবে বিভোর।"

ইভা কহিল, "তোর কথাই ধরি—আপত্তি কিসের?"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "আপত্তি! বলি মত কে দিলে? মাসিমা আগে রত্নার নামে গলে যেতেন! এ ক'দিন দেখছি যেন চটে আছেন। তবে খুব চাপা না উনি। আমাদের চোখে এড়ায় না কিছু!"

সুশীল প্রশ্ন করিল, "চটে আছেন কেন?"

কল্পনা হাসিয়া দাদার খাটের উপর বসিল। কহিল, "একটা কথা আছে না—নাই দিলে কারা মাথায় ওঠে!"

আশ্চর্য্য হইয়া সুশীল কহিল, "অর্থাৎ? সে দিন তো মিসেস্ গোস্বামী আমাদের বল্লেন খুব ভালো মেয়ে! এস্পায়ারে মন্দির দেখতে গেছে। থাকলে আলাপ করে দিতুম!"

ঘাড় নাড়িয়া পুলকিত স্বরে কল্পনা কহিল, "এমনি বলতেন বটে! আমাকেও বলেছেন! এখন মেয়ের গুণ বেরিয়েছে, মাসিমাকেও ডিঙিয়ে চলে।"

ইভা কহিল, "অবাক্ করলে কল্পনা!"

"হ্যাঁ বৌদি, সত্যি। মনে করে, সে যেন ধিঙ্গি! কিচ্ছু এটিকেট জানে না।"

সুশীল কহিল, "তা যা হোক মেয়েটির কিন্তু বাহাদুরী আছে, অমিয়র প্রতিজ্ঞা ও ভেঙ্গে দেছে তো!"

বিস্ফারিত চক্ষে কল্পনা কহিল, "কিসের প্রতিজ্ঞা?"

"বিয়ে না করবার! আমরা তাগাদা দিলে ঠাট্টা করলে বলতো, কাকে বিয়ে করি খুঁজে পাই না!"

"এখন পেয়েছে?"

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল, "তা জানি না। পরশু দেখা হলে একটা অভিনন্দন দেবো, কি বলিস্?"

বলিবার যে কি, কল্পনা তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সে যেন হেঁয়ালির মধ্যে পড়িয়াছিল! সত্রাস দৃষ্টিতে কহিল, "কি বলছো দাদা?"

সুশীল হাসিতেছিল, কহিল, "অমিয় ভারী চাপা ছেলে! সহজে কিছু ভাঙ্গে না। কিন্তু ধর্ম্মের কল!"

ইভা কহিল, "কি রকম?" দৃষ্টিতে তাহার কৌতুক উছলিয়া পড়িতেছে।

পত্নীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল, "তোমাদের আদর্শ মানুষ গো, —যাকে শুকদেব ব্রহ্মচারী উপাধি দেবে ভাবছিলে—একেবারে হাতে-নাতে ধরা! ধর সাহেব বামাল-সমেত তাকে ধরে ফেলেছে। বলে, অমিয় এত দিনে জালে পড়লো হে।"

কল্পনা প্রশ্ন করিল, "কেন ধর সাহেব কি ধরেছেন?"

ভগিনীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল, "তারা স্বামী-স্ত্রী স্বচক্ষে দেখেছে। মিসেস্ ধর বললেন, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, আপনি যদি মিষ্টার গোস্বামীর মুখ দেখতেন, যেন আষাঢ়ের আকাশ! ঠাট্টা করে আমরাই যেন দোষী! এমনি ভাবখানা তিনি প্রকাশ করে চলে গেলেন।"

কল্পনার উদ্বেগ বাড়িল। সে কহিল, কোথায় ধরের সঙ্গে মিষ্টার গোস্বামীর দেখা হলো?"

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল, "কেন, স্থানের অভাব আছে? ফারপোয়। উর্ব্বশীকে নিয়ে উনি সে দিন সেখানে উঠেছিলেন।

হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল, ধরকে দেখে অবশ্য পালাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ধর হলো ঝানু ছেলে—সে সুযোগ না দিয়ে একেবারে তাদের সামনে—”

নিগূঢ় বিস্ময়ে কল্পনা কহিল, “রত্নার সঙ্গে?” নিশ্বাস যেন তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সুশীল ভগিনীর মুখের বিবর্ণতার জন্য অর্থ না বুঝিয়া কহিল, “ওই তোমাদের স্বভাব। অমিয়র সম্বন্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে চাও না। ভাবো সে একটি জন্তু—” বলিয়া হাসিল; হাসিয়া কহিল, “অবশ্য আমিও ভাবতুম, ও হয় তো বিয়ে-থা করবে না! কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে। সকালে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি, দেখি, লেকের ধারে বেঞ্চে পাশাপাশি দু'টিতে বসে প্রভাত-বায়ু সেবন করছেন। আমি আর তাদের বিরক্ত করতে গেলুম না।”

“মিসেস্ গোস্বামী যে বললেন, রত্নাকে মোটর ড্রাইভ শেখাতে নিয়ে গেছেন।”

সুশীল কহিল, “আর কি বলবে? তা অমিয়র মন যা-তা দেখে যে টলে নি, এটা সত্যি চাক্ষুষ করলুম। সেই যে বলে, মুনিজন-মনোহারী! হঁ্যা, রূপ বটে। উর্ব্বশী বলতে হয়। একটি সোনালী কোট গায়ে দিয়ে বসেছিল! চার্ম্মিং!”

কল্পনা আর কোন কথা কহিল না। ধীর পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের ঘরে আসিল এবং সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বেশভূষা মোচনের সময় সুবৃহৎ দর্পণে প্রতিফলিত নিজের আবরণ-মুক্ত অবয়বের পানে চাহিল। সুন্দরী না হইলেও সুদর্শনা সে! রূপের দরবারে অনেক রূপসীর সে আসন অধিকার করিতে পারে।

কেন সকলে রত্নাকে এত রূপসী বলিয়া স্তুতিগান করে—রত্নার কাছে কোথায় সে নিরেস বুঝিতে পারিল না।

নির্জ্জন ঘরে ছোট একটা নিশ্বাস কল্পনা কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না।

পৃথিবীতে সকলেই রূপের কাঙাল। সৌন্দর্য্যের পূজা চলিয়া আসিতেছে আবহমান কাল। নারীর রূপ লইয়া কত সিংহাসন কত রাজ্য ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে! কত মুনি-ঋষি-যোগী-তাপস্বীর কঠোর তপস্যা ভঙ্গ হইয়াছে এই নারীর রূপে! সেখানে তুচ্ছ অমিয়, তুচ্ছ তাহার সংযমী চিত্ত। তাহার জ্ঞান, বিদ্যা, পদগৌরব সমস্তই মূল্যহীন! কল্পনার মনের মধ্যে এমনি চিন্তা তীব্র হইয়া তাহাকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বালিশে মাথা রাখিয়া কল্পনা মনে মনে আঁকিতে লাগিল নিজের ছবি, অমিয়র ছবি, রত্নার ছবি। এবং এমনি ছবি আঁকিতে আঁকিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল, অনিল যেন ইন্দ্র সাজিয়া পারিজাতের হার আনিয়া তাহার কণ্ঠে দুলাইয়া দিল! ইন্দ্রের চোখের পরিপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু নৃতশীলা সভা-নর্ত্তকী উর্ব্বশীর উপর নিবদ্ধ।

ঘুমের ঘোরেই কল্পনা চমকিয়া উঠিল!

২৪

গোস্বামী সাহেবের গৃহে নিয়ম ছিল, সকালে চায়ের টেবলে পরিবারস্থ সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে। অন্য সময়ে না হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই সময়টায় আত্মীয়বর্গ সকলের ভালো-মন্দ তত্ত্ব লইয়া তবে কর্ম্মের গহন অরণ্যে তিনি প্রবেশ করিতেন।

প্রথামত আজও তিনি আসিয়া চায়ের টেবলে বসিলেন। একে একে সকলে আসিল এবং সকলের শেষে আসিল রত্না।

গোস্বামী সাহেব তাহাকে স্নেহ-কণ্ঠে 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ কি রত্না! তুমি করছো কি?"

সবিস্ময়ে সকলে রত্নার পানে চাহিল। পৌষের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় সকালেই সে স্নান সারিয়াছে। তাহার নিবিড় ঘন কুন্তলরাশি এলাইয়া পৃষ্ঠে বাহুতে পড়িয়া জানু স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় ঝুলিতেছে! সেই কুঞ্চিত কেশদাম, শুভ্র ললাটের চূর্ণ অলকগুচ্ছ তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীতে ভূষিত করিয়াছে! পরণে একখানা সাদা লালপাড় শাড়ী, সুডৌল বাহু অনাবৃত রাখিয়া গায়ে একটা হাতকাটা সেমিজ; শীত নিবারণ করিতে লাল রং‌এর ফ্লানেল স্কার্ফ! পায়ে সবুজ রং‌এর শ্লিপার—সমস্তই তাহাকে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব রূপের হিল্লোল তুলিয়াছে।

মিসেস গোস্বামী তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "এতে অসুখ করবে না রত্না?" তাঁহার কণ্ঠ বিরস।

ঈষৎ ম্লান হাস্যে রত্না মুখ নীচু করিল। মৃদু স্বরে কহিল, "খুব ভোরে স্নান করা আমার অভ্যাস আছে। দেশে আমি তাই করতুম।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "সে পাড়াগাঁ, টান জায়গা। আর অসুখ-বিসুখ কিছু হলে ভাবনা ছিল তাঁদের। কিন্তু এ হলো সহর, এমন করে ঠাণ্ডা লাগালে এখানে সহ্য হবে না। এখানে অসুখ-বিসুখ হলে দায়িত্ব আমার! কাজেই আমায় ব্যস্ত হতে হবে।"

অমিয় কহিল, "এত ভোরে স্নানের হেতু?"

চকিতে চোখ তুলিয়া রত্না আবার তখনি দৃষ্টি নত করিল।

রত্না তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে গেলে গোস্বামী সাহেব সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "ওখানে নয় মা, আমার পাশে এইখানে তুমি বসো।"

রত্না তাঁহার পাশে গিয়া বসিল। মুখে ঈষৎ তৃপ্তি ফুটিল; পক্ষি-শাবক যেন তাহার নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় পাইল।

গোস্বামী সাহেব কৌতুক হাস্যে কহিলেন, "তোমার বাবা তোমার নাম রেখেছে রত্না। আমি হলে কি নাম রাখতুম জানো? হংসেশ্বরী!"

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস উজ্জ্বল প্রভাতকে যেন আনন্দময় করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেবের দিকে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি যখন কলেজে পড়তে তখন কাব্যচর্চ্চা করতে না? কি সব কবিতা লিখতে!"

"যখন কলেজে পড়তুম তখন কি, তার পরেও কত লিখেছি! যত দিন ব্রীফলেশ ছিলুম, তত দিন কবিতা লিখেছি। আচ্ছা অমিয়, দেবীর রূপ বর্ণনা করতে হলে ঋষিরা মুক্তকুন্তলা বলেন, নয় কি? সমস্ত শোভা ওই খোলা চুলেই।"

রত্নার কেশের পানে চাহিয়া অমিয় একটু হাসিল। এবং তাহার সামনের আসন অধিকার করিয়া লজ্জিতা রত্না আরক্তিম মুখ আরও নত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন, "আজ রত্নাকে দেখে হঠাৎ অতীতের কাব্য চেপে ধরলো তোমায়!"

মাথা নাড়িয়া সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তাই হয় গো—তাই হয়। আমরা নাতী-পুতিকে এত ভালবাসি কেন? আমাদের শৈশবের প্রতীক তারা। আচ্ছা, তুমি তো এক জন সাইকলজিষ্ট অমিয়, এ বিষয়ে তুমি কি বলো?"

কিছু বলিবার জন্যই বোধ করি অমিয় মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে থামাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আবার ওই উদ্ভুটে

তর্ক। ও আমার মোটে ভালো লাগে না। হ্যাঁ রত্না, কাল তুমি খেলে না কেন? কি অসুখ করেছিল?"

নত-মুখে রত্না কহিল, "মাথাটা বড্ড—"

অনিল যেন লাফাইয়া উঠিল। সে কহিল, "দেখলে তো মা! আমি তখনই মনে করেছি, রত্নার শরীর ভালো নেই!"

গোস্বামী সাহেব সায় দিয়া কহিলেন, "আমিও তা বুঝেছিলুম—ওর শুকনো মুখ!"

স্নেহার্দ্রস্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "বলতে হয়! না জানি কাল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে নাচতে কত কষ্ট হয়েছিল! বোকা মেয়ে! আমায় জানাতে নেই?"

একটু খুশীর আমেজে গত রজনীর গুমোট-ক্লেশ সকলের চিত্ত হইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সদয় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ সন্তানের পানে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ অমিয়, তুমি রত্নাকে নিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনো না! মনটা তাজা হবে ওর—শরীর ভালো হবে!"

রত্না চকিতে অমিয়র পানে চাহিল। নিমেষের জন্য দেখিল, নিজের প্রাতরাশের প্রতি অমিয় সুগভীর মনোযোগী। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল, "আজ তো আমার ফুরসৎ নেই মা।"

এমনি উত্তরই যেন মিসেস্ গোস্বামী খুঁজিতেছিলেন। প্রীত কণ্ঠে কহিলেন, "তা বটে, আমারও আজ মরবার অবকাশ নেই। কল্পনাকে এখনি আসতে বলে দিয়েছি। অনিলেরও অনেক কাজ—"

রত্না ভিতরে ভিতরে চমকিয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, কল্পনার প্রতীক্ষাতেই অমিয় নড়িল না! মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল অভিমানের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

এমনি হয়। সংশয়-পীড়িত মন নিজের অশান্তি সৃষ্টি করিতে যেমন মজবুত, অপরকে তেমনি কারণে-অকারণে দোষী করিতেও সে পটু!

কথাগুলা অবশ্য এমন কিছু নয়—খুবই ছোট! সামান্য! তথাপি ছোট ছোট সংলাপে এবং হাসি-পরিহাসে মন লঘু হয় তাই রহস্যালাপে মানুষ মাতিয়া ওঠে! এই টুক্‌রা টুক্‌রা কথাবার্ত্তাগুলা রত্নার মনে বায়ুহিল্লোলে তরুশাখার ন্যায় মাতন তুলিতেছিল। কিন্তু অমিয়র এই ঔদাস্য ও মৌনতা সহসা বায়ুহীন গুমোট দিনের মত রত্নার সমস্ত দেহ-মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বন্টু আসতে পারবে না রত্না! আমায় জানিয়েছে। কিন্তু সে এলে—"

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, "দর্জ্জি আসিয়াছে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্নার নাচের পোষাক এলো।"

ড্রইং-রুমে টেবলে সুবৃহৎ পিজ-বোর্ডের বাক্স-অভ্যন্তরে যে মূল্যবান পোষাক পাতলা কাগজে ঢাকা ছিল, সকলের আগে অনিল সেটা বাহির করিল। এবং তারিফের সুরে কহিল, "ভাখে মা, ডিজাইন্‌টি কেমন দিয়েছিলুম!"

মিসেস্ গোস্বামী পোষাকের দিকে চাহিলেন। প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "চমৎকার হয়েছে।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "ভৈরী নাইস্। রংটা কে পছন্দ করেছিল?"

অনিল কহিল, "আমরা।"

অমিয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোষাক দেখিতেছিল, কহিল, "এইগুলো সবচেয়ে ভালো হয়েছে অনিল। এই সার-বন্দী শলমার হাঁসগুলো। হ্যাঁ,

নাচের মুখে এই তার দেওয়া আছে, পার্ট পার্ট খুলে যাবে, চমৎকার দেখতে হবে মা, সব তাক্ লেগে যাবে !"

প্রদীপ্ত মুখে রত্না নত হইয়া পোষাক দেখিতে লাগিল। অন্তরের সমস্ত অভিমান পুলকের বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া গেল।

রত্না কহিল, "কত বিল হলো মাসিমা ?"

করিম বিলের কাগজ সকলের চোখের সামনে বাড়াইয়া দিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "ইস্! ছ'শো পঁচাত্তর ধরেছ ! করেছ কি ?"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "তুমি যেমন কাজ দেবে, তোমার ফরমাস তো সাধারণ নয় !"

অনিল সহাস্যে রত্নার পানে চাহিল, কহিল, "রত্না, তোমার দাম বেড়ে যাবে।"

দ্বারের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "এই যে কল্পনা এসেছে ! কেমন পোষাক হলো উর্ব্বশীর, দেখো তো !"

কল্পনার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বিস্ময় ভরা স্বরে কহিল, "আপনি উর্ব্বশীর পোষাক করতে দিয়েছিলেন মাসিমা ?"

উৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "নাচের ড্রেস চাই বৈ কি মা। আমি, অমিয়, অনিল—সবাই মিলে পাঁচখানা বই দেখে এই ডিজাইন ঠিক করলুম। তোমার কেমন লাগছে ?"

কল্পনার মুখের চেহারা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে কহিল, "এর উপর আর কার কথা চলে ? এমন পোষাক পরা ভাগ্য !"

মিসেস্ গোস্বামী খুব খুশী হইলেন। কহিলেন, "মাপ আমরা দিয়েছিলুম। কিন্তু রত্নার সাধ্য নেই নিজে এ পোষাক পরে। তুমি যাও তো, ও ঘরে রত্নাকে পোষাক পরিয়ে দাও গে। ও এসে

আমাদের দেখাক, ঠিক হলো কি না। রত্না, তুমি কল্পনার সঙ্গে যাও মা।"

মিসেস্ গোস্বামীর আদেশে রত্না ও কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "করিম, পাশের কামরায় পোষাকটা দিয়ে এসো।"

নীরবে দুই তরুণী করিমের অনুবর্ত্তী হইল। এক জনের মুখ প্রভাত-রবির মত উজ্জ্বল, অপরের মুখ সন্ধ্যা-তপনের ন্যায় মলিন।

২৫

আজ আটাশে পৌষ। গোস্বামী সাহেবের জন্মদিন। সুবৃহৎ পুরী পত্র-পুষ্পে উৎসব-সজ্জায় বিভূষিত। আলোক-মালায় উদ্ভাসিত।

রত্না মিসেস্ গোস্বামীর প্রদত্ত সেই বহুমূল্য শাড়ী পরিয়াছে। মিসেস্ গোস্বামীর ক'খানা সৌখীন গহনাও পরিয়াছে।

এই দামী গহনাগুলি অঙ্গে তুলিতে তাহার কতখানি আনন্দ হইতেছিল। শঙ্কাও জাগিতেছিল অনেকখানি। তাহার কুণ্ঠা দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলেন, "সঙ্কোচ কিসের? আমি পরতে দিচ্ছি তুমি পরবে! না, না, অত ভয় কেন? কিছু খোয়া যাবে না! যত বড় ঘরের মেয়ে-বৌ সব আজ আসবে! গিন্নীরা আসবে। তাদের সামনে তোমায় নিরাভরণ রাখতে পারি? না, ছোট হতে দিতে পারি? হলোই বা হীরে-মুক্তা।"

রত্নার চোখ সজল হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পিঠ চাপ্ড়াইয়া কহিলেন, "যাও তোমার ঘরে সব নিয়ে।"

আহ্লাদে গলিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অলঙ্কারের কেস্‌গুলো বুকে ধরিয়া রত্না নিজের ঘরে আসিল। এবং প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সে যখন ড্রইংরুমে আসিয়া দেখা দিল, তখন অস্তগামী রবিরশ্মি-জালের পানে উদাস নেত্রে তাকাইয়া অমিয় একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। উৎসবে, ব্যসনে, কাজকর্ম্মে অনিলের যেমন দক্ষতা, অমিয়র ছিল তেমনি অক্ষমতা—তাই কোন কর্ম্মে বা ফরমাসে মিসেস্‌ গোস্বামী তাহাকে ডাকিতেন না।

অমিয় রত্নার আগমন জানিতে পারিল না। রত্না মিসেস্‌ গোস্বামীর সন্ধানে হল-ঘরে যাইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ হাসির সুরে রত্না কহিল—

ধ্যানমগ্ন যোগীন্দ্র বসি যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে
কাহারে ধেয়াও ?

অমিয় চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। চিত্রার্পিতের ন্যায় রত্নার অনিন্দ্য সুন্দর মাধুরী-মূর্ত্তির পানে মুহূর্ত্তের জন্য সে অভিভূত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চোখে পলক পড়ে না।

সলজ্জ হাস্যে গাঢ় রক্তিম কপোলে রত্না কহিল, "অমন করে কি দেখছো ?"

অমিয় হাসিল। কহিল, "তোমাকে! সত্যি রত্না! আজ মডেল করে ছবি আঁকতে লোভ হচ্ছে!" বলিয়া রত্নার শাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এইটে না তোমার জন্য অনিল সে দিন কিনে এনেছে ?"

পুলকিত দীপ্ত মুখে রত্না কহিল, "হ্যাঁ।"

অমিয় কহিল, "আমার মত তুমিও এখন বেকার! কি বলো ?"

রত্না হাসিল।

অমিয় কহিল, "তবে বসে পড়ো, একটু গল্প করা যাক।"

মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার সহিত কথা বলিতে বলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ গোস্বামী বলিতেছিলেন, "তুমি বাছা খুব উপকার করলে—যেমনটি আমি ভালবাসি! তুমি ঠিক তেমনি একটা হাতের দোসর হলে!"

কল্পনা উত্তর দিল, "সত্যি মাসিমা, তাই আমি ভাবি, মাসিমা ক্ষণজন্মা মেয়ে। এদিকে গিন্নীপণা, ওদিকে ইস্কুল, তার উপর আবার এই থিয়েটার!"

মিসেস্ গোস্বামী আত্মপ্রশংসা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইলেন। কহিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই সব কাজে তোমার পরামর্শ নিই। রত্না তো এ সব কিছু বোঝে না, পেরেও ওঠে না।"

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কল্পনা কহিল, "তা সত্যি! এ সব বিলি-ব্যবস্থা তো কেতাবে লেখা থাকে না যে মুখস্থ করে মানুষ শিখবে। যে যেমন সংসারে মানুষ হয়! রত্না আবার হয় তো যে সমস্ত কাজ পারবে, আমরা তাতে একেবারে আনাড়ি।"

সংক্ষেপে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তা বটে। আজ কথার মাত্রার মাঝেও যে কেহ কোনরূপ ক্ষুণ্ণতা বোধ করে, তাহাও তিনি চাহেন না। কহিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যে প্রত্যেক মেয়ের মাথায় বেল-ফুলের মালা আর গলায় গোলাপের হার দেবার ব্যবস্থা করলে, এ আমার খুব সুন্দর লেগেছে।"

অনিল আসিয়া খবর দিল, ফুল আসিয়াছে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মালাগুলা সকলকে দেবে কে? রত্না তো?"

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িলেন। এত বড় একটা অভ্যর্থনার

ব্যাপার! চিন্তিত নেত্রে মুখ ফিরাইতেই রত্নাকে দেখিলেন, ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাশের চেয়ারে রত্না প্রতিমার মত বসিয়া আছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "এই যে অমিয়, তুমি কি বলো? সকলকে ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে কে? রত্না পারবে কি?

সহাস্যে অমিয় একবার রত্নার পানে তাকাইল। তার পর কহিল, "না মা, ও কাজটি তুমি মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে দাও—অত ঝক্কির মধ্যে রত্না যেতে পারবে না।

মা খুশী হইলেন। কহিলেন, "সেই ভালো। কল্পনা, তুমি তো আমার মেয়ের মত, তুমিই এ কাজের ভার নাও মা!"

যেন সমস্ত দ্বন্দ্ব ঘুচিল। পুলকিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "আপনি যেমন বললেন!"

গোল মিটিল। কিন্তু মেঘ কাটিল না।

২৬

আহারাদির পর অভিনয়ের ব্যবস্থা। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইতেই নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা আসিয়া হল-ঘরের অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে সার-বন্দী গদি-আঁটা চেয়ারে বসিলেন।

শিল্পীর দল প্রবেশ করিলেন গ্রীণ-রুমে।

মিসেস্ গোস্বামীও সজ্জা-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেদিকে কিছুক্ষণ তদারক করিয়া, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান আরম্ভ হইল। মিসেস্ গোস্বামী গিয়া স্বামীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, "একবার এদিকে এসো।"

সবিস্ময়ে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "কোথায় ?"

মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া মিসেস গোস্বামী কহিলেন, "ওই পর্দ্দার ভিতরে।"

গোস্বামী সাহেব পত্নীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

একতান থামিল। পর্দ্দা উঠিল। দর্শকদলের উৎসুক দৃষ্টি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল, পত্র-পুষ্পে সজ্জিত এক সুবৃহৎ চেয়ারে গোস্বামী সাহেব আসীন। এবং দুই পার্শ্বে নারী ও পুরুষ শিল্পিবৃন্দ সার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান। সকলের হাতে পুষ্পমাল্য কুসুম-স্তবক।

সগর্ব্বে মিসেস্ গোস্বামী ধীর-পদক্ষেপে স্বামীর নিকটে গিয়া তাঁহার কণ্ঠে মালা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

গোস্বামী সাহেবের বন্ধুদল করতালি দিয়া উঠিল।

তাহার পর অমিয়, অনিল, রত্না, কল্পনা একে একে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী আসিয়া গোস্বামী সাহেবের গলায় পুষ্পমাল্য, হস্তে কুসুম-গুচ্ছ দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

গোস্বামী সাহেব সস্নেহে সকলের পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নাট্যমঞ্চ ত্যাগ করিয়া তিনি আসিয়া বন্ধুদের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

যবনিকা পড়িল।

গ্যাংলি এবং বাকৃচি গোস্বামী সাহেবের দুই পার্শ্বে দু'জন বসিয়াছিলেন। বন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন, "উর্ব্বশী কি সেই মেয়েটি হবে ?"

গোস্বামী সাহেব জবাব দিলেন, "হ্যাঁ! রত্না আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা।"

বাকৃচি কহিলেন, "তিনি জীবিত ?"

"নিশ্চয়! এবং সুস্থ। কর্ম্মঠ। পণ্ডিত ব্যক্তি। নিমন্ত্রণ করেছিলুম তাকে কিন্তু বিশেষ কাজে সে আসতে পারে নি।"

ঘণ্টা পড়িবার সঙ্গে পর্দ্দা উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সকলে চাহিল নাট্যমঞ্চের দিকে। সেখানে তখন ইন্দ্রের সভা। চিন্তিত মুখে সিংহাসনে বসিয়া বাসব—পাশে ইন্দ্রাণী শচী।

অপ্সরার দল নাচিয়া গাহিয়া চলিয়া গেল।

এবার দেখা দিল, পরামর্শ-সভা। মন্ত্রণা বৈঠক। সপারিষদ দেবেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত শত্রু-নিপাত-ব্যবস্থার আলোচনা করিতেছেন।

কালনেমী দৈত্যের প্রচণ্ড বিক্রমে, নিষ্ঠুর অত্যাচারে স্বর্গের সুখ-শান্তি বিনষ্ট! আনন্দ বিলুপ্ত! স্বর্গ ম্লান।

একে একে বহু উপায়ের কথার পর অবশেষে স্থির হইল, একমাত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর এই দুর্দ্দান্ত দানবকে দমন করিতে সমর্থ; তাঁহাকেই আনা প্রয়োজন।

গাণ্ডীবীকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদকে পাঠানো হইল।

দৃশ্যপট বদলাইয়া গেল।

এবার দেখা দিলেন গাণ্ডীবধারী ফাল্গুনি। নাট্যমঞ্চে অর্জ্জুনের সহিত অমিয়র কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অর্জ্জুনের অভিনয়ে বাহবা পড়িল।

ইন্দ্রাণী স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া স্মিত-মধুর হাস্যে কিরীটীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন, স্বর্গের বিপদ্-বার্ত্তা! দেবগণকে শঙ্কাশূন্য করিতে তিনি সব্যসাচীর শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অর্জ্জুন গাণ্ডীব স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, অমরাবতীকে অরাতি-মুক্ত করিবে।

সভায় ধন্য ধন্য রব উঠিল। অপ্সরারা পুষ্পবৃষ্টি করিল। বাসব মন্দাকিনীর পূত-সলিলে গাণ্ডীবীর অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা বারি দিলেন। স্তাবক গাহিল। দেবনারীরা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেব-ঋষিগণ স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

ইন্দ্রাণী নিজের পারিজাতের হার হইতে একটি পারিজাত লইয়া সাদরে অর্জ্জুনের হাতে দিলেন।

নত মস্তকে সসম্মানে অর্জ্জুন অভিবাদন করিয়া পারিজাত গ্রহণ করিলেন; মস্তকে স্পর্শ করিয়া পারিজাতের আঘ্রাণ লইলেন।

পটক্ষেপের পর আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল।

প্রলয়-ত্রাস-সঞ্চারী অদ্ভুত রণবীর অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছে, কালান্তকারী কালনেমির সহিত। অসুর-নাশ হইল। স্বর্গ নির্বিঘ্ন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন। সভা। অমরগণ প্রফুল্ল। স্বর্গের মালিন্য ঘুচিয়াছে। এখন পরামর্শ চলিল, কি অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পার্থকে অভিনন্দন করা হইবে; তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে কিরূপ উৎসব হইবে।

ভরতমুনি উপদেশ দিলেন, "উর্ব্বশীকে আহ্বান করা হোক! অমরা-পুরীর শ্রেষ্ঠ রত্ন। স্বর্গের নিষ্প্রভতায় সে অপসৃত হইয়াছিল। আজ স্বর্গে আনন্দ ফিরিয়াছে! স্বর্গ এখন নিষ্কণ্টক! শত্রুশূন্য! এখন সেই অপ্সরা-কুল-গরীয়সী নর্ত্তকীর তো বাসবের সভায় নৃত্যে বাধা রহিল না।

দেবরাজ মালা-চন্দন দিয়া প্রতিহারীকে উর্ব্বশীর কাছে পাঠাইলেন। ভরতমুনি দিলেন ধান-দূর্ব্বা।

ইন্‌টারভ্যাল। একতান সুরু হইল।

দর্শকগণ সমস্বরে অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। মিসেস্ গোস্বামীর পরিচালনার প্রশংসা উঠিল। সকলেই এখন ব্যস্ত উর্ব্বশীকে দেখিবার জন্য।

নাটকখানি লিখিয়াছে অমিয়। তাহার যশ হইল। অনিলের গানের সুরও যে মধুর হইয়াছে, সকলে গানের সুখ্যাতি করিল।

মিসেস্ গোস্বামীর উৎফুল্ল মুখে তবু কেমন উৎকণ্ঠার ছায়া। মনের সংশয় ঘুচিতেছিল না। রত্না কেমন অভিনয় করিবে, স্বামীর জিদে রত্নাকে তিনি উর্ব্বশীর ভূমিকা হইতে খারিজ করিতে পারেন নাই। নহিলে তাহার উপর তিনি এতটুকু আস্থা রাখেন না। কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া পুতুলের মত মেয়েটির অপরূপ তনু ছাড়া ইহার ভিতরের কোন গুণ কোন কর্ম্মদক্ষতা যেন মিসেস্ গোস্বামীর চোখে পড়ে না।

কল্পনা এখন তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়াছে। কাজে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় রত্নার চেয়ে কল্পনাকেই অনেকখানি শ্রেষ্ঠ মনে হয়। এবং কল্পনাও তাঁহাদের সমযোগ্য ঘর—কুটুম্বিতায় এখানে নিজেকে খাটো করা হয় না। হ্যাঁ, অমিয়কে লইয়া—তারপর অনিল। একা আর ভাল লাগে না! রত্নাকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু রত্না তাঁহার হইবার নয়। শুধু স্নেহের পাত্রী!

২৭

ইন্‌টারভ্যাল শেষ হইল। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে একতান থামিল।

মিসেস্ গোস্বামী কম্পিত বুকে সম্মুখে চাহিলেন। এইবার উর্ব্বশী রত্না তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে কি ম্লান করিবে, কে জানে? মিসেস্ গোস্বামীর ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

পট উত্তোলনে নূতন দৃশ্য দেখা দিল।

নন্দন কানন। উর্ব্বশী পারিজাত বৃক্ষের তলে প্রজাপতির সহিত

খেলা করিতেছে। মাঝে মাঝে লোভীর মত পারিজাতপাপ্‌ড়ি বায়ু-হিল্লোলে সেই কমনীয় বরতনুকে স্পর্শ করিতে তাহার কোমল অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে।

উর্ব্বশী কখনও আনমনা, কখনও হাস্যময়ী! তাহার মুখে কমল-জ্ঞানে মধুলোভী ভ্রমর ছুটিয়া আসিতেছে। রত্নখচিত অঞ্চল উড়াইয়া উর্ব্বশী ভ্রমরকে তাড়াইতেছে। শিথিল কবরী হইতে পুষ্প খসিয়া পড়িতেছে, সেদিকে উর্ব্বশীর হুঁশ নাই। প্রজাপতি ধরিতে ব্যস্ত। খেলায় সে বিভোর। তাহার রক্ত-পেলব চরণ-ক্ষেপে মৃণাল-বাহুর আন্দোলনে, চারি পাশে যেন সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিতেছে। মাঝে মাঝে প্রফুল্ল মুখে চিন্তার ছায়াপাত হইতেছে। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া উর্ব্বশী চিন্তিত।

অমরাপুরী শত্রু-কবলে ম্লান। তাই ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী আর নাচিতে যায় না। তাহার নৃত্য যে বৈজয়ন্তীর চিহ্ন, জয়ন্তীর আনন্দেই উর্ব্বশী হয় বাসবের সভায় নৃত্যশালিনী।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল। ভূমিষ্ট প্রণামে উর্ব্বশীকে সম্মান জ্ঞাপন করিল।

উর্ব্বশী দেবরাজের কুশল জানিতে চাহিলেন।

প্রতিহারী মালা-চন্দন দিয়া জানাইল, দেবরাজের বাণী সে বহন করিয়া আনিয়াছে। বৈজয়ন্তী পুরী শত্রু-বিমুক্ত, অমরগণ শঙ্কাশূন্য, দেবগণ উর্ব্বশীর নৃত্য-দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

উর্ব্বশী জানিতে চাহিল, কোন্ রথি-শ্রেষ্ঠের বিক্রমে স্বর্গের গৌরব দীপ্ত উজ্জ্বল হইল?

প্রতিহারী উত্তর দিল, সে মহামানব কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন।

উর্ব্বশী চমকিত। বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কহিল, "কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব—"

নত মস্তকে প্রতিহারী জানাইল,"ধনঞ্জয় ব্যতীত এত শৌর্য্য কার ?"

উর্ব্বশী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মগত হইয়া কহিল, "শ্রেষ্ঠবীর অর্জ্জুন ?" তার পর কহিলেন, "দেবরাজ আমার প্রতি কি আদেশ জানিয়েছেন ?"

বিনীতকণ্ঠে প্রতিহারী কহিল, "পার্থের অভিনন্দন উৎসবে অপ্সর-কুলাগ্রগণ্যা উর্ব্বশীর নৃত্য তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ, কিরীটী নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিশারদ।"

উর্ব্বশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। মিসেস্ গোস্বামী এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়াছিলেন। দু'চোখ আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল। রত্না নিখুঁত অভিনয় করিয়াছে। রত্না ছাড়া কাহারও সাধ্য ছিল না, উর্ব্বশী সাজিতে। মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে প্রশংসা করিলেন। এই তো সত্যকার নন্দন-কানন-বাসিনী উর্ব্বশী! কল্পনা স্বরূপা বটে—কিন্তু রত্না ?

পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ গোস্বামী ব্যগ্র চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, উর্ব্বশী সহচরীদের আদেশ দিলেন, মনোহারী পরিচ্ছদে তাহাকে বিভূষিতা করিতে! মনে দর্প, পার্থ নট-কুল-চূড়ামণি হইলেও উর্ব্বশীর কাছে তাহাকে পরাজয় মানিতে হইবে।

দৃশ্য পরিবর্ত্তনের পর দেখা দিল, দেব-সভা। স্বর্গ উৎসবে মাতোয়ারা। সুরলোকের বৈভব! ইন্দ্রাণী শচী অপরূপ সজ্জায় বাসবের পাশে—অমরগণ নিজ আসনে সমাসীন।

পার্থ প্রবেশ করিয়া দেবগণকে প্রণাম করিল। দেবসেনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন। কুঙ্কুম রাগে ললাটে জয়স্তিকা অঙ্কিত করিলেন। দেবরাজ স্বয়ং গাণ্ডীবীর হাত ধরিয়া মণিময় সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইলেন।

বৈতালিক গান গাহিল। অপ্সরারা নৃত্য করিল। ভরত মুনি, নারদ মুনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

দেবরাজ কহিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ, স্বর্গের অগ্রগণ্য নর্ত্তকী উর্ব্বশী তাঁর নৃত্যকলায় তোমার তৃপ্তি সাধন করিবে! শুনেছি, তুমিও নট-শ্রেষ্ঠ।"

অর্জ্জুন হাস্য করিলেন।

অমর-সভায় এতক্ষণে মনোহর গতিচ্ছন্দে উর্ব্বশী প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র-দেবেন্দ্রাণীকে প্রণাম দিয়া সভাসদ্‌বর্গকে অভিবাদন দিল। ঋষিগণের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা কহিলেন, "জয়োঽস্তু।"

দর্শকদের দৃষ্টি সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল, উর্ব্বশীর রূপজ্যোতি, কমনীয় তনু রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। উর্ব্বশীর বহুমূল্য নৃত্য-পরিচ্ছদ— অঙ্গের মণি-আভরণ, পৃষ্ঠের কৃষ্ণ-সর্পাকৃতি বিলম্বিত বেণী, চরণের নূপুর—সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের তরঙ্গে দর্শক-দৃষ্টিকে বিমোহিত করিল।

এমনি করিয়া সমাগত দল চাহিয়া রহিল। যেন সুরাসুর বিহ্বল নেত্রে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে।

বাদ্য-যন্ত্রের সহিত উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রতিচরণ-বিন্যাসে মাধুরী ঝরিয়া পড়িল। সকল অবয়বের মনোহর ভঙ্গীতে ছন্দ ফুটাইয়া, চারু নৃত্যকলার প্রতি মুদ্রা প্রদর্শনে যেন রূপের হিল্লোল বহিয়া চলিল।

উর্ব্বশী নাচিতেছে। স্বর্গের গৌরব-দীপ্তি ম্লান বলিয়া বাসবের সভায় সে ছিল অন্তর্ধান। আজ লুপ্ত গৌরব সমজ্জ্বল, উর্ব্বশী তাই নৃত্যশীলা। অন্তরের অভিলাষ ফাল্গুনিকে বুঝাইয়া দিবে, উর্ব্বশীই কেবল উর্ব্বশীর তুলনা! মানুষকে সে চারুকলার নৈপুণ্যে মুগ্ধ অভিভূত করিবে। তাহা না হইলে, উর্ব্বশী মিথ্যা! তাহার নৃত্য মিথ্যা! তাহার মুনিজন-মনোহারী সৌন্দর্য্য মিথ্যা!

জয়ন্তিকা শুধু উর্ব্বশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটেরই শোভা!

অর্জ্জুন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে স্তব্ধের মত বসিয়া নৃত্য অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঝরিতেছে আনন্দ।

দেবসভায় সকলেই নিস্পন্দপ্রায়।

গাঙ্গুলী কহিলেন, "চমৎকার!"

রায় কহিলেন, "এযে আমাদের দিশী প্যাভলোভা হে!"

গোস্বামী সাহেব হাসিলেন। কহিলেন, "উর্ব্বশী নয়, প্যাভলোভা।"

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রদীপ্ত। স্বামীকে তিনি মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছিলেন।

নৃত্য-শেষে সভা হইতে উর্ব্বশী বিদায় গ্রহণ করিলেন। পার্থের বিহ্বল দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিল।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেখা দিল—বাসবের কক্ষ। পার্ষদের পরামর্শে দেবেন্দ্র উর্ব্বশীকে অর্জ্জুনের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রেরণ করিলেন।

পার্ষদ একবাক্যে দেবরাজকে জানাইল, ফাল্গুনির মনোরঞ্জন করিতে একমাত্র উর্ব্বশীই সমর্থ। পার্থের নির্নিমেষ দৃষ্টি উর্ব্বশীতে আবদ্ধ ছিল।

নিশীথ রাত্রে অভিসারিকার বেশে উর্ব্বশী দেখা দিল, অর্জ্জুনের নিভৃন শয়ন-কক্ষে।

অর্জ্জুন স্তম্ভিত! বিমূঢ়! বিভ্রান্ত নেত্রে সে উর্ব্বশীর অলৌকিক রূপরাশি অবলোকন করিতে লাগিল। এই দেবভোগ্যা অপ্সরী, মানুষের ভোগের জন্য আসিয়াছে! এ কি বিচিত্র রহস্য!

উর্ব্বশী চঞ্চল হইল। অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে অনুযোগ নাই, আসক্তি নাই! রহিয়াছে শুধু গভীর বিস্ময়! তথাপি উর্ব্বশী ক্ষান্ত হইল না।

অকুণ্ঠ কণ্ঠে সে নিজের প্রেম নিবেদন করিল। পার্থের শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় উর্ব্বশী বিমুগ্ধ!

জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "অদ্ভুত! বরাননে, অদ্ভুত বাসনা তব! দেবভোগ্যা তুমি, হে কুরুকুলের আদি জননী, পার্থ নহে যোগ্য তব। অর্জ্জুনের তুমি শুধু লহ নমস্কার!"

অর্জ্জুনের বিমুখতায় উর্ব্বশী কুপিতা হইল। নয়নে জ্বলিল বহ্নি।

উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ, অর্জ্জুন তাহাকে উপেক্ষা করিল। অপ্সরা-সমাজে এ যেন কলঙ্কের মত তাহাকে হেয় করিল। যুগে যুগে সে পুরুষের চিত্তে চির-অভীপ্সিতা—আজ তাহার এ কি পরাজয়! মর্ম্মাহতা উর্ব্বশী ভুজঙ্গীর ন্যায় ফুঁশিয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিল।

যবনিকা-পাত হইল। নাট্যমঞ্চের আলো নিবিল। সুবৃহৎ হল ঘর উর্ব্বশীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সমাগতদের সহিত আসিয়া মিলিল।

গোস্বামী সাহেব রত্নার মাথায় হাত দিলেন।

২৮

নিমন্ত্রিতের দল আসিয়া রত্নাকে ঘিরিয়া ধরিল। রত্নার নৃত্য আর অভিনয় এত চমৎকার হইয়াছে যে, বিলাতের কোন কোন ফেমাশ আর্টিষ্টের সহিত রত্নার তুলনা করা চলে। শতমুখে সেই কথা, সেই আলোচনা! তরুণের দল রত্নার সঙ্গ-লাভের জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিল।

কল্পনার কানে কানে অনিল বলিল, "ইন্দ্রাণী, আমাদের যশোভাতি উর্ব্বশী ম্লান করে দিয়েছে।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া কল্পনা উত্তর দিল, "প্রধান ভূমিকাই ওকে দেওয়া হয়েছিল। বরাতে সেটা কোন মতে উতরে গেছে।"

অনিল কহিল, "হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের তফাৎ নেই। রত্নাকে নিয়ে ওরা একেবারে মত্ত। চলো, আমরা একটু বিশ্রাম করি গে।"

অনিল ও কল্পনা ড্রইংরুমের বারান্দায় আসিল। সুদীর্ঘ বারান্দায় সাজানো টবে পাতা-বাহার গাছের ছায়া—খণ্ড খণ্ড স্থানে ম্লান আলো যেন আঁধার রচনা করিয়াছে। তাহারই নিভৃত এক অংশের ছায়া যেখানে সুনিবিড়, সেইখানে আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়া অনিল কহিল, "এখানটা বেশ নির্জ্জন কল্পনা, একদম ভীড় নেই। কথাবার্ত্তা ক'বার পক্ষে চমৎকার জায়গা!"

মধুর কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "আমারও আর-পাঁচ জনের সঙ্গ ভালো লাগছে না। ক'দিনের পরিশ্রমে নিজেকে ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছে অনিল।" বলিয়া মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল, একখানা ইজিচেয়ারে আলো-আঁধারে মিশিয়া অমিয় অর্দ্ধ-শয়ান রহিয়াছে। চকিতে অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া স্বরে উদ্বেগ মিশাইয়া কল্পনা কহিল, "মিষ্টার গোস্বামী এখানে এমন করে একলা যে!"

অমিয় উঠিয়া বসিল, উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার বিশ্রাম করা হয়ে গেছে! তোমরা বসে গল্প করো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনিলের মুখ লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, "উঠছো কেন দাদা?"

"ও-দিকটা একটু ঘুরে আসি।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অমিয় সে স্থান ত্যাগ করিল।

চাঁদের উপর মেঘের আবরণের ন্যায় কল্পনার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তুমি আমায় এমন অপ্রতিভ করে দিলে! কে জানে, মিষ্টার গোস্বামী এখানে আছেন!"

হাসিয়া অনিল কহিল, "তাতে কি হয়েছে! দাদা তো আমাদের দেখেই সরে গেলেন! তিনি তো অবুঝ নন্।"

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া কল্পনা কহিল, "যাও! তোমার সব তাতে কেবল ঠাট্টা!"

অভিনয়ের ভঙ্গীতে অনিল কহিল, "কোথায় যাবো বলো দেখি? ওধারে উর্ব্বশী এখন স্তাবক-পরিবেষ্টিতা—দেবেন্দ্রের তুমিই আশ্রয় শুধু!"

ক'দিন ধরিয়া বসিবার ঘরে চায়ের টেবলে, অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনার তুমুল ঝড় বহিল। গোস্বামী সাহেব গব্বিত-কণ্ঠে কহিলেন, "কেমন লীলা, আমি তোমায় বলেছিলুম রত্নার কথা! দেখলে, সে কেমন কোহিনূর!"

হাসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তা আমি স্বীকার করি। তোমার জন্যেই সেদিন এতটা সাকসেসফুল হলো!"

চা খাওয়া শেষ হইল।

উঠিবার সময় অমিয় কহিল, "আজ দু'টোর গাড়ীতে আমি যাচ্ছি মা।"

গোস্বামী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "আজই! কেন? তোমার ছুটী তো এখনও দু'দিন রয়েছে।" বলিয়া পুত্রের পানে চাহিলেন।

টেবলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অমিয় কহিল, "এখানটা আর আমার ভালো লাগছে না। শুধু অপেক্ষা করছিলুম আপনার বার্থডের জন্য!

সে তো হয়ে গেছে!" বলিয়া হাসিয়া সে আবার কহিল, "আর সবচেয়ে আনন্দের মধ্যেই সেটা হয়েছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা কহিলেন, "আজ তাহলে তোমার যাওয়া স্থির?"

"হ্যাঁ, সকালে উঠেই আমি বেয়ারাকে বলে দিয়েছি সব গুছোতে।"

মিসেস্ গোস্বামী নীরবে পিতা ও পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন, "তুমি যদি আজই যাবে, তাহলে আগে আমায় সে কথা জানাও নি কেন?"

"আগে কিছু স্থির ছিল না। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্থির করলুম। বলিয়া একটু থামিয়া সে কহিল, "এতে অসুবিধার কিছু নেই তো।"

গম্ভীর মুখে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "একটু আছে বই কি! এ-কথা জানলে আমি কল্পনাদের আজ নিমন্ত্রণ করতুম না। সে তার বৌদিদিরা, তবে সুশীল—সন্ধ্যার পর সবাই আসবে।"

মৃদু হাস্যে অমিয় কহিল, "তাতে তো ক্ষতি নেই। আমি যাচ্ছি বেলা দু'টোর গাড়ীতে।"

"কিন্তু তুমি তো জানতে, তারা আসবে!" মিসেস্ গোস্বামী প্রদীপ্ত চক্ষে পুত্রের পানে চাহিলেন। কহিলেন, "তুমি আমায় স্পষ্ট জানিয়ে যাও অমিয়, তোমার ইচ্ছা কি!"

"কোন্ বিষয়ে?"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কোন্ বিষয়ের জন্য আমি ব্যস্ত, তুমি জানো না! তুমি হলে বড় ছেলে।"

অমিয় নীরব রহিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি আমায় খোলাখুলি জবাব দিয়ে যাও।"

অমিয় মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল। কহিল, "এ বিষয়ে কোন রকম আলোচনা করতে আমি এখন পারবো না মা।"

"বুঝেছি।" মিসেস্ গোস্বামীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ!

অমিয়র সুগৌর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্তব্ধ ভাবে সে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী সাহেব নির্ব্বাক্ ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন, "কত দিনে তুমি ফিরছো?"

অমিয় উত্তর দিল, "আবার এমনি সময়ে।"

গোস্বামী সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এক বছরের মধ্যে তোমার আসার সম্ভাবনা তাহলে নেই?"

অমিয় কহিল, "সম্ভব তাই!" বলিয়া পিতামাতাকে অভিবাদন করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রত্না এতক্ষণ নির্ব্বাক্ পুতুলের মত বসিয়া ছিল। অমিয় প্রস্থান করিতেই ব্যাকুল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "অমিয়দা কি আর এক বছরের মধ্যে আসবেন না—সত্যি?"

তাহার ব্যাকুল স্বরে গোস্বামি-দম্পতি তাহার দিকে একবার চাহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কথা বলিল অনিল। অনিল উত্তর দিল, "দাদা সহজে আসেন না। এবার এসে যে এত দিন ছিল, এই যথেষ্ট!"

২৯

নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া অমিয় কি লিখিতেছিল। অবসর মত সে সাহিত্যচর্চ্চা করে, নাটক লেখে। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী নাটকখানি তাহারই রচনা। এ নাটক সে মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছে।

এখন তেমনি পিনে-আঁটা কতকগুলা কাগজপত্র কাটিয়া-কুটিয়া সংশোধন করিতেছিল। সামনের সেল্‌ফে সাজানো মহাভারতগুলার পানে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ঘরে ঢুকিবার দরজা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। তাই পর্দ্দা ঠেলিয়া কে একজন যখন ঘরে ঢুকিল, অমিয় তার কিছুই জানিতে পারিল না। যে আসিল, তাহার পদবিক্ষেপ লঘু—তাই মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর এতটুকু শব্দ হইল না। যে আসিল, সে একেবারে অমিয়র পিঠে মৃণাল বাহুর দুই কর-পল্লব স্থাপিত করিয়া ডাকিল, "অমিয়দা—"

ভীষণ চমকিয়া অমিয় ফিরিয়া চাহিল। প্রচণ্ড বিস্ময়ে কহিল, "এ কি! রত্না! তুমি!" ইহা ছাড়া আর কোন ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পূর্ব্বে রত্না কোন দিন অমিয়র এ ঘরে প্রবেশ করে নাই। বসিবার ঘরে, বারান্দায়, লাইব্রেরী-ঘরে অমিয় রত্নার সহিত আলাপ করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে। কিন্তু নিজের ঘরে কখনো নয়। তথাপি এমন করিয়া বিনা-প্রশ্নে প্রবেশ অনুমতি না লইয়া রত্না এমন অনাহূত ভাবে তাহার ঘরে প্রবেশ করিবে, এই অসঙ্গতি অমিয়কে অবাক্ করিয়া দিল। এবং এই রীতি-গর্হিত কাজটা তাহার চিত্তকে বিচলিত করিলেও নিজেকে সংযত করিয়া অমিয় কহিল, "কি হয়েছে রত্না? তোমার মুখ-চোখ অমন কেন? কেঁদেছো না কি? বসো—বসো।"

ক্রন্দন-বিবশা রত্না কহিল, "না, বসবো না। আগে তুমি বলো, তুমি আজ যাবে না!" গভীর মিনতিতে রত্না অমিয়র হাত চাপিয়া ধরিল।

রত্নার দিকে চেয়ারখানা ফিরাইয়া তাহাতে বসিয়া অমিয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে কহিল, "কেন বল তো, আমাকে ধরে রাখবার জন্য তোমার এত জিদ?"

বেদনা-বিজড়িত কণ্ঠে রত্না কহিল, "মাসিমা, মেসোমশাই সকলের ইচ্ছা, তুমি এখানে থাকো। না অমিয়দা, এত শীগ্‌গির তুমি যেও না। লক্ষ্মীটি, থাকো।" বলিয়া সে অমিয়র হাত চাপিয়া ধরিল।

অমিয় নিজের হাতখানা রত্নার কুসুম-পেলব হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইল। একখানা চেয়ার টানিয়া রত্নাকে বসিতে দিয়া ধীর স্বরে কহিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ রত্না, আমি পার্থ।"

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে রত্না আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু থামিতে পারিল না। নিজেকে এখন সম্বরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। হিষ্টিরিয়া-আক্রান্ত রোগী যেমন আত্মদমন করিতে পারে না, ধৈর্য্যকে আড়ষ্ট করিয়া ভিতরের বিপুল খেদ মানুষকে যেমন কাঁদায়, ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, রত্নাকেও যেন তেমনি কিসের উন্মত্ততা ভয়ানক বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার বিচার-বোধ তখন বিলুপ্ত।

রত্না কানে যা শুনিয়াছিল, তাহার সে সন্দেহ সত্য। সগোষ্ঠি কল্পনার আজিকার আসার নিবিড় কারণ আছে! আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য কথা পাকা করিবার সাদর আহ্বান! কল্পনা আজ বিজয়িনী! অমিয়র কল্পনা আজ তাহারি প্রতিশ্রুতি-দান হইবে। এই উগ্র চিন্তা রত্নাকে যেন অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল! মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া বাঁচিবার আকুল প্রচেষ্টায় সে অমিয়র কাছে আসিয়াছে! বুকের মাঝে স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় বিশ্বাসের ম্লান একটা আলো এখনো জ্বলে—অমিয়ও রত্নাতে আকৃষ্ট! তাই সে আজ মুখরা, চপলা।

গভীর মিনতি ভরে রত্না কহিল, "অমিয়দা, তুমি যেও না—থাকো।"

গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল, "কেন, তা তুমি বলো নি!" অমিয়র কণ্ঠে যেন কৈফিয়ৎ-তলবের সুর!

"বললুম তো! আর কত বার করে বলবো? মাসিমা, মেসোমশাই সকলের ইচ্ছা।"

একটু হাসির স্বরে অমিয় কহিল, "সে কথা তাঁরা আমায় জানিয়েছেন, সে তাঁদের কথা! তোমার কথা বলো।"

"আমার কথা?" রত্না একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "আমার কথা? আমি তোমায় ছাড়তে চাই না! ছেড়ে দেবো না।"

অমিয় স্তম্ভিত! ক্ষণকাল নিষ্পলক নেত্রে সে রত্নার শিশিরসিক্ত রক্তোৎপলের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই ক্ষণিক সময়টুকুর মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে মন কত কি ভাবিয়া লইল। তার পর অতি ধীর শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, "না রত্না, তা হয় না!"

"কি হয় না? তোমার এখানে থাকা?"

অমিয় কহিল, "হ্যাঁ। তুমি এখানে লেখাপড়া শিখতে এসেছো রত্না, লেখাপড়া শিখো! আর তা যদি ভালো না লাগে, তাহলে দেশে ফিরে যাও! আমার কথা শোনো রত্না!" অমিয়র স্বরে আকুতি!

প্রচ্ছন্ন শ্লেষ-বোধে রত্না নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত স্বরে কহিল, "তোমাকে ধন্যবাদ! আমার অভিভাবকদের যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি আছে আমার শুভাশুভ চিন্তা করবার! সেখানে তোমার সদুপদেশ দেবার প্রয়োজন নেই।"

অমিয় যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। রত্নার কটূক্তি, অসঙ্গত আচরণ তাহাকে যেন বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। হতভম্বের মত সে শুধু চাহিয়া রহিল।

একটা মাসও পূর্ণ হয় নাই। প্রথম দিন যে রত্নার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, যে ব্রীড়াবনত-মুখী লজ্জাশীলা নিরীহ প্রকৃতি রত্নাকে অমিয়র ভালো লাগিয়াছিল, এ কি সেই রত্না? এমন অদ্ভুত

আমূল-পরিবর্ত্তন তাহার কি করিয়া ঘটিল? কিছুই যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মানুষের প্রকৃতিতে যখন একটা ওলট্-পালট্ ঘটে, অন্তরালে যখন ঝড় ওঠে, বন্যা বহে, তখন সেই উন্মত্ততার মাঝে তাহার আসল রূপ এমন বিকৃত হইয়া ওঠে যে তাহাকে চেনা অসাধ্য হয়। নূতন অনুভূতি তড়িৎ-বেগের মত তীব্র ও দুঃসহ হইয়া মনোজগতে সে মাতন জাগায়, তাহাতে পূর্ব্বেকার শিষ্ট মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যে বিরল হইবে, ইহা স্বাভাবিক! বিপ্লবের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, পদ্ধতি নাই, নীতি নাই! অনুশাসনকে দু'পায়ে সে দলন করে—তাই তার ধর্ম্ম! তাই তার নাম বিপ্লব।

রত্নার বুকে তেমনি বিপ্লবের ঝড়, বিদ্রোহের বন্যা বহিতেছিল। অমিয়কে হারাইতে হইবে, এই শঙ্কা যেন ভিতরে ভিতরে তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে-অমিয়কে সে সবার অজ্ঞাতে, হয় তো অমিয়রও অজ্ঞাতে নিঃশেষে এমন করিয়া ভালোবাসিয়াছে, সে যে এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া যাইবে তাহা সহ্য করা যেন মৃত্যুর মত। রত্নার নিকট যন্ত্রণাময় বিভীষিকা পূর্ণ।

সূর্য্যাস্ত-রাগের মত রত্নার রাঙা মুখের পানে চাহিয়া শান্ত স্বরে অমিয় কহিল, "তুমি বুঝতে পাচ্ছ না রত্না, তুমি কি করছো, কি বলছো! তোমার মন সুস্থ নেই।"

তীব্র স্বরে রত্না কহিল, "না, সুস্থ নেই। আজ আমি পাগল। আজ আমার সর্ব্বস্ব হারাবার দিন! আমি কেমন করে স্থির থাকবো? তুমি—অমিয়দা, আমি বিশ্বাস করতুম, তুমি উদার, তোমার বিবেচনা-বোধ আছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারলুম, সে মন তোমার মুখোস! আসলে তুমি ভণ্ড স্বার্থপর লোভী!"

শান্ত কণ্ঠে অমিয় বলিল, "ভণ্ড ! লোভী !"

কঠিন কণ্ঠে রত্না কহিল, "হ্যাঁ তাই। আমি গরীব বলে তুমি আমায় অবহেলা করলে ! কল্পনা জজের মেয়ে, তুমি চাও টাকা, সামাজিক মর্য্যাদা, তাই তুমি আমার হবে না ? তুমিই না এক দিন বলেছিলে, আমায় আশ্বাস দিয়েছিলে, যত দূরেই থাকি যেখানেই থাকি আমার প্রয়োজন তোমায় জানাবো ! নিজেকে কখনো অভাব-গ্রস্ত মনে করবো না !"

বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে অমিয় কহিল, "আজও সেই কথা বলছি। তুমি বিশ্বাস করো রত্না, তোমার অর্থ নেই বলে তোমাকে আমি অবহেলা করছি না। আমি তোমার কল্যাণকামী !"

ব্যঙ্গোক্তিতে রত্না কহিল, "যথেষ্ট ! ধন্যবাদ তোমায় ! জেনে কৃতার্থ হলুম, তুমি আমার কল্যাণকামী ! পরম সুহৃদ ! তোমার বদান্যতা দেখে সুখী হয়ে—কি বলো, কল্পনার দরবারে আমি ভিখারীর মত হাত পেতে দাঁড়াবো, এই তুমি চাও ? না অমিদা, আমি কাঙাল নই। ভিখারী নই। অভাব হয় মাসিমা মেসোমশায় আছেন তাঁরা দেখবেন। তুমি নও !" বলিতে বলিতে রত্না কাঁদিয়া সহস্রধারে যেন ফাটিয়া পড়িল। নিজের দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া মূর্ত্তিমতী বিষাদের মত সে বসিয়া রহিল। এবং তাহার চম্পক-অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রু-উৎসের ধারা অমিয়র সম্মুখে বহিতে লাগিল। একান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে, বিবর্ণ মুখে সামনের আসনে ভাস্বর-মূর্ত্তির ন্যায় অমিয় নিশ্চল বসিয়া সেই ক্রন্দন-বিবশা প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল।

সেই সময়ে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া মিসেস্ গোস্বামী ঘরে প্রবেশ করিলেন ; এবং রত্না ও অমিয়কে তদবস্থায় দেখিয়া সামনে সাপ দেখার মত ভীষণ চমকিয়া দু'পা তিনি পিছাইয়া গেলেন।

কঠোর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন, "রত্না—"

চমকিয়া রত্না মুখ তুলিল। অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখের উপর হইতে শোণিতের শেষ-বিন্দু অবধি সরিয়া মৃতের মত সে মুখ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে।

অমিয় চকিত হইয়া ফিরিয়া কহিল, "মা—"

শ্লেষের সহিত মিসেস্ গোস্বামী কহিল, "অতি অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে আমি এসেছি! না?"

নিমেষে অমিয়র মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "না। অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে নয় এখনই আসবার দরকার ছিল।"

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তোমার বাবা এসেছেন তোমায় নিতে। তোমার মার অসুখ। অফিস্-কামরায় তিনি আছেন। যাও।"

রত্না উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমি কৈফিয়ৎ চাই অমিয়, এমন সময়ে রত্না তোমার এ ঘরে কেন?"

মায়ের দিকে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া অমিয় কহিল, "তুমি বসো আমি বলছি।"

মিসেস্ গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

অমিয় কহিল, "রত্না আমাকে বোঝাতে এসেছিল আমি যেন আজ না যাই! এই কথা বল্‌তেই ও এ ঘরে এসেছিল!"

বিদ্রূপের স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্নার এত মাথাব্যথার কারণ? ওর এত অনুরোধ কেন?"

অমিয় কহিল, "আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ও জবাব দিলে, মাসিমা, মেসোমশাই যখন ক্ষুণ্ণ হবেন—"

"তুমি তার কি উত্তর দিলে ?"

"আমি ?" অমিয়র মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সে কহিল, "আমি বললুম, তোমার এ অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব ?" মিসেস্ গোস্বামীর স্বরে ব্যঙ্গের আভাস! অমিয়র মনের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন তপ্ত বাতাসের ঝাপ্টা-মারার মত জ্বালা করিয়া উঠিল। সযত্নে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "আমি যদি থাকতুম, তোমার নিষেধই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অন্য কারও উপরোধ দরকার হতো না! কিন্তু আমি তো থাকবো না।"

"কেন থাকবে না, জানতে পারি অমিয় ?"

অবিচল কণ্ঠে অমিয় কহিল, "পারো। আজ তুমি কল্পনাদের নিমন্ত্রণ করেছো! আমায় না জিজ্ঞেস করেই যে কথা দিয়েছ, তারা স-গোষ্ঠি আস্‌বে সেই কথা পাকা করে নিতে! কিন্তু আমার পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব !"

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অসম্ভব কিসে ?"

দৃঢ়স্বরে অমিয় কহিল, "হাঁ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব! কোন মতেই এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না। কাল সারারাত আমি এই নিয়ে অনেক ভেবেছি! এই আমার সিদ্ধান্ত মা। কোন মতেই কোন অনুরোধ-উপরোধে এর নড়-চড় হবে না। আমি তোমাকে মিনতি কচ্ছি —তোমরা আমায় অনুরোধ করো না।"

মিসেস্ গোস্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধি-বিবেচনায় চিরদিন তাঁর গভীর আস্থা। এমন ধীর প্রকৃতি শান্ত স্বভাব গম্ভীর তীক্ষ্ণধী পুত্রের জননী বলিয়া মনে মনে তাঁহার গর্ব্ব ছিল। কিন্তু

সেই একান্ত প্রিয় পুত্র অকস্মাৎ যখন তাঁহার মতের সহিত প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে বসিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি হতবাক্ হইয়া জড়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধি যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। চিন্তাশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

মিসেস্ গোস্বামীর অন্তরের আশার বর্ত্তিকা—অমিয় শেষ অবধি পরাভব স্বীকার করিবে! সংসারে স্বামী-পুত্র তাঁহার একান্ত বশীভূত! আর অবস্থা একান্ত সঙ্গীন হয়, অমিয় নিতান্ত বাঁকিয়া থাকে তো তিনি স্বামীর সাহায্য লইবেন। সেখানে তাঁহার এই চিরদিনের বিনয়ী পুত্র ট্যাঁ-ফোঁ করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখন বুঝিলেন, অমিয়র সঙ্কল্প ধনুকভাঙা পণের মতই সুদৃঢ়। মিসেস্ গোস্বামী কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হইয়া রহিলেন। চোখের সামনে যেন আশায় গড়া সাত-তলা বাড়ীখানা ভূমিকম্পের দুঃসহ আঘাতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্পনা কি তোমার চেয়ে কোন অংশে খাটো?"

অমিয় নিঃস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, "আমি তো তা বলি নি।"

"তবে তোমার এমন সুদৃঢ় আপত্তির অর্থ আমি কি বুঝবো?"

শান্ত স্বরে অমিয় কহিল, "আমার ভালো লাগল না। কেবল এই।"

মিসেস্ গোস্বামী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পর্ণকুটীরবহুল পল্লীতে আগুন লাগার ন্যায় মনের ভিতরটা চক্ষের নিমেষে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তবে কি ভালো লাগে রত্নাকে?"

অমিয়র গায়ে যেন কাঁটার চাবুক পড়িল। আহত স্বরে সে ডাকিল, "মা—"

মিসেস্ গোস্বামী তখন দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলের

এই বেদনা-বিদ্ধ স্বরে তিনি কর্ণপাত না করিয়া ঘৃণার সহিত কহিলেন, "তুমি জেনো অমিয়, তুমি যদি সারাজীবন বিয়ে না করো, তবু রত্নাকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি দেবো না। আর যদি জোর করে বিয়ে করো, জানবো, আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই! তুমি বাপ-মার মর্য্যাদা রাখলে না।

অমিয়র মুখ সাদা হইয়া গেল। জননীর কটূক্তিপূর্ণ তিরস্কার তাহার জীবনে এই প্রথম! তথাপি নিজের সহিষ্ণুতার জোরে আত্মদান করিয়া শান্ত স্বরে সে কহিল, "এ তুমি কি বলছো মা!"

মিসেস্ গোস্বামীর মনে তখন প্রচণ্ড ক্রোধ সাপের মত ফুঁশিয়া গর্জ্জন করিতেছে! অগ্নি-চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আমি সব বুঝি। এই জন্যই তুমি রত্নাকে মোটরে নিয়ে যেতে! তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতুম না! ভাবতুম, অমিয় আমার ভালো ছেলে! এখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, অমিয় তা নয়!"

অমিয়র মুখের মত কণ্ঠস্বরও বিষাদ-গম্ভীর। সে কহিল, "আমি মন্দ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়! প্রমাণ হলো বৈ কি! তাই তুমি কল্পনাকে বিয়ে করতে পারবে না—পালিয়ে যাচ্ছো! জেনে রেখো, কল্পনা আমার পুত্রবধূ হবেই! আমার কথার নড়চড় নেই! তুমি আমার এক ছেলে নও অমিয়!"

অমিয় উত্তর দিল, "বেশ তো, তাতে আমি সুখী হবো। সেদিন আশীর্ব্বাদ করতে আসবো।"

মধ্যাহ্নে বিদায়-প্রাক্কালে অমিয় মাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া জননীর পদধূলি লইল।

মিসেস্ গোস্বামী কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। হাতটা শুধু মাথায় ঠেকাইয়া সংসার-খরচের খাতা দেখিতে ব্যস্ত রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া, "চল্লুম মা," বলিয়া অমিয় মাতৃকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতার লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল।

গোস্বামী সাহেব রাশীকৃত পুস্তক লইয়া জটিল মামলার কূট অর্থ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনিল এবং আর এক জন তরুণ ব্যারিষ্টার তাঁহার সহকারি-রূপে এ কাজে সাহায্য করিতেছে।

পুত্রকে দেখিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "চল্‌লে ?"

প্রণাম করিয়া পুত্র কহিল, "হাঁ।"

অনিল মুখ তুলিল। কহিল, "দু'টো পঁয়তাল্লিশে গাড়ী না ?"

"তাই।"

"কিন্তু আর একটা ছিল, আটটা দশে।"

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল, "হ্যাঁ। সেটাতে গেলে অনেক রাত্রে গাড়ী চেঞ্জ করতে ঝঞ্চাট—ভোর বেলায় নামা!"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তা ঠিক! যাওয়াই যখন স্থির, তখন এইটেতে যাওয়াই ভালো! অত রাত্রে নামা-ওঠায় ঝক্কি লাগে। আমি এই সুন্দরলালের পুষ্যি ক্যানসেলের কেসটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। মানুষ যে কেন পুষ্যি নেয় বুঝি না। একটা খুনো-খুনী কাণ্ড ঘটে গেল।"

গমন-উদ্যত অমিয় কহিল, "দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটায়।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "ঠিক বলেছো! যত ঝঞ্চাট জড়ায় সেইখানে। ভগবান্ যা দেন্ নি, জোর করে তা তৈরী করতে গেলে ফল হয় বিপত্তি বরণ করা!"

জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের সহিত করমর্দ্দন করিয়া কনিষ্ঠের পিঠ চাপড়াইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিল। মোটরের ফুটবোর্ডে পা দিতে

দুই চোখের কোণ সজল হইল। ত্রস্তে রুমালে চোখ-মুখ মুছিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িল—দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর দিকে। মনে হইল, গাছগুলার পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। শাড়ীর একটা অংশ যেন দৃষ্টিগোচর হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া অমিয় বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইল। দেখিল, রত্না নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

অমিয়র পদশব্দে মুখ তুলিতেই চারি চক্ষে মিলন হইল।

"মাপ করো অমিয়দা, তুমি আমায় দেখতে পাবে বুঝতে পারি নি!" বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। ধীর-পদ-বিক্ষেপে আসিয়া মোটরে উঠিল। গাড়ী ষ্টার্ট দিল। অমিয় মুখ ফিরাইয়া গৃহের পানে চাহিল। দৃষ্টিতে পড়িল গর্ভধারিণী মা গবাক্ষ ধরিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন। মুখ তাঁহার অন্ধকার! মাথা নাড়িয়া অমিয় জননীকে অভিবাদন জানাইল।

৩১

দিন কয়েক পরেই অমলার পীড়ার উপশম হইল। রমেশ কহিলেন, "চলো রত্না, তোমায় রেখে আসি।"

নির্জীবের মত অমলা বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। অনুরোধের সুরে কহিলেন, "আর দু'টো দিন থাকুক না!"

বিরক্তির সহিত রমেশ কহিলেন, "পার্সেণ্টেজ সর্ট পড়ছে। ক'দিন কলেজ কামাই হলো!"

"কিন্তু আজ যে ভরা অমাবস্যা গো!"

"রাখো তোমার অমাবস্যা! কি ভেদ-বমি হলো না হলো, ওগো খুকীকে দেখাও গো, আমি আর বাঁচবো না! হুঁ, মানুষের অন্তর্জ্জলী হবার সময়েও কেউ অমন করে বলে না যে মরে যাবো! কৈ, মরতে

পারলে না তো! তখন তেরস্পর্শ, অমাবস্যা, প্রতিপদ শুনতে পাই নি তো!"

অমলা নীরব রহিলেন। বিসূচিকার আক্রমণ তেমন নিদারুণ হয় নাই; মৃত্যু গ্রাস করিল না! এজন্য অবশ্য সে অপরাধী, কতকগুলা অর্থব্যয় করিয়া বাঁচিয়া উঠিল।

গর্ভধারিণীর জন্য রত্না বার্লি প্রস্তুত করিতেছিল। মুখ তুলিয়া সে বলিল, "আজকের দিনটা—"

"তবে থাক! কিন্তু বলে দিলুম, তোমার মা'টিকে চেনো না, ও আবার প্রতিপদের হাঙ্গামা তুল্‌বে।"

বিরক্ত হইয়া দুর্ব্বল কণ্ঠে অমলা কহিল, "ঘাট মানচি—তুমি নিয়ে যাও তোমার মেয়েকে। মরণ হলেও আর ডাকবো না।"

"না ডেকো না! তোমার মুখে জল দিতে ও আসতে পারবে না। নে খুকী, আজই তোর জামা-কাপড় গুছিয়ে নে।"

ডাক দিয়া হরিশ উঠানে আসিল। "রত্না সরস্বতী কোথায় রে? এ কি রত্না, তুই উনুনের সামনে!"

রত্না যেন ভয়ানক কি অপকর্ম্ম করিয়াছে, এমনি বিস্ময় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটিল।

"না কাকাবাবু, রান্নাবান্না নয়। মার জন্যে বার্লি করছি।"

কেন, ও-বাড়ীতে বলে পাঠালেই হতো।

"বামুনপিসী রান্না করে! এ আর কি এমন। কাকিমা আবার ব্যস্ত হবেন।"

"না গো মা-লক্ষ্মী, কিছু ব্যস্ত নয়। তোমার কাকিমার হাড় রেঁধে রেঁধে পেকেছে। হ্যাঁ রত্না, তোর কাকিমা দুঃখ করছিল, মেয়ে এলো, তা একবার দেখা করলে না!"

বিস্মিত রমেশ প্রশ্ন করিলেন, "তুই ও-বাড়ী যাস্ নি রত্না?"

লজ্জাবতী লতার ন্যায় রত্না যেন কুঁচকাইয়া গেল। কহিল, "কিছু আনা হলো না তাড়াতাড়িতে। পূজোর বন্ধে যখন আসবো—"

হরিশ হাসিলেন—"দূর পাগলী—নাই বা জিনিষ হলো—তবু তোকে দেখলে—হ্যাঁ রত্না, থিয়েটার তো করলি! আপিসে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়লুম—তাতে তোর খুব সুখ্যাতি দেখলুম।"

রমেশ ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এ্যাঁ, দেখলে নাকি? আরে আমায় বলতে হয়! না হয় একখানা কাগজ কিনে আনতে, দাম কি আমি দিতুম না? না হরিশ, অত কঞ্জুষ-বৃত্তি ভালো নয়!"

ভ্রাতার কথায় হরিশ লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া গেল। মাথা চুলকাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, ইয়ে—আমার মাথায় অতটা এই—যাকে বলে ষ্ট্রাইক করে নি।"

ক্ষুণ্ন কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "ইস্‌, তারিখটা মনে আছে? ডেট্‌ না পেলে কাগজ সংগ্রহ করবো কি করে? একটা কাটিং রাখবো। আর কি কি লিখেছে?"

রত্নার খুব সুখ্যাতি। সাধনা বোসের সঙ্গে তুলনা করেছে। অফিস্‌-সুদ্ধ লোক আমায় ঘিরে ধরলে! বলে, এ্যাঁ, হরিশবাবু, মিস্‌ রত্না বোস আপনার ভাইঝী! বলেন কি?"

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "হুঁ, বুঝলে না, সেটা কলকাতা—আর্টের কদর তারা বোঝে।"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ কি আমাদের পাড়া-গাঁ? গুণের মধ্যে পরের কুচ্ছো! কাজ বলতে দল-পাকাপাকি! তা ওদের গুরুপ্‌-ফটোও তো বেরিয়েছে।"

আনন্দে বালকের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে রমেশ কহিলেন, "তাই নাকি! এ্যাঁ সত্যি?"

রত্না পিতার সেই আনন্দ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উৎফুল্ল স্বরে কহিল, "আচ্ছা বাবা, আমি যখন পূজার সময়ে আসবো—সব ফটো এক কপি করে আনবো।"

পিতা কহিলেন, "আরও ছবি তোলা হয়েছে নাকি তোমাদের ?"

বার্লিটা জুড়াইতে জুড়াইতে রত্না কহিল, "হ্যাঁ, আমরা যে যে অভিনয় করেছি, সকলকার ছবিই উঠেছে। আবার অভিনয় করছি, সে-ছবিও উঠেছে।"

"ইস্, বলিস্ কি !" বলিয়া পিতা অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

খুল্লতাত হরষিত কণ্ঠে কহিলেন, "এবার তোর পরিচয়েই আমাদের পরিচয় দিতে হবে।"

উভয় ভ্রাতাই হরষিত !

মধ্যাহ্নে সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া রমেশ কন্যার বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া গৃহে ফিরিয়া অপরাহ্নে দুহিতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "খুকী, তোর একখানা চিঠি রে। দেবু হরকরা দিয়ে গেল।"

পিতার হাত হইতে পত্র লইতে হাত বাড়াইতেই রত্নার বুকখানা দুলিয়া উঠিল ! এ পত্র ? না, অসম্ভব ! তা কেন হইবে ? খামখানা হাতে করিয়া গৃহে আসিয়া সে হস্তাক্ষরের পানে চাহিল। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত পত্র খুলিয়া দিবা-অবসানে গৃহের স্বল্পালোকের জন্য সে সরিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল ; এবং আগে পত্র-লেখকের স্বাক্ষরটা পাঠ করিল। পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল ! অলক রায়। যে সেই নারদ মুনি সাজিয়াছিল ! সে কেন রত্নাকে চিঠি লিখিল ?

রুদ্ধ নিশ্বাসে রত্না পত্র পড়িল। বিস্ময়ের সহিত খানিকটা অসঙ্গতি মনে জাগিল।

অলক লিখিয়াছে—

প্রিয় উর্ব্বশী,

নারদ কলহপ্রিয় হলেও স্বর্গ-মর্ত্ত্যের খবর আদান-প্রদানে সে ছিল ওস্তাদ। আমার পত্র তোমায় আশ্চর্য্য করলেও বিরক্ত করবে না। কারণ দূতের কাছ থেকেই সংবাদ নিতে হয়। তোমাদের নৃত্য-কলা সেদিন যে বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়েছিল, তারই শব্দ-রোলে আমরা বিমোহিত। সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্রার্থনা নিবেদন করছি—বন্যা-রিলিফের জন্য যে অভিনয় আয়োজন চলছে, তার নৃত্য-ভূমিকাতে তোমাকে চাই! আর কত দিন বনবাসে থাকবে? অমরাপুরী অন্ধকার হয়ে আছে। এসো, ফিরে এসো উর্ব্বশী। ইতি—

নৃত্যমুগ্ধ

নারদ (অলক রায়)

পত্র হাতে বিমূঢ়ের মত রত্না ক্ষণকাল বাতায়ন-পথে সন্ধ্যায় বিলীয়মান রক্তালোকের পানে চাহিয়া রহিল।

অমলা এ পাশ ফিরিয়া আবিষ্টের মত কন্যাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "কার চিঠি রে?"

রত্না মুখ ফিরাইল। তাহার মুখে গোধূলির আলোক-রাগ!

সে কহিল, "কলকাতার এমনি চিঠি। তোমায় বার্লি দিই মা।"

অমলা বুঝিল, কথাটা কন্যা এড়াইয়া গেল। দুর্ব্বল দেহ—অল্পেই মনে অভিমান হয়। অনাসক্ত থাকিতে চায়।

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমলা অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দাও।"

পেটের মেয়েও যদি মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে সংসারের ভালো-মন্দর কিসের আসক্তি।

শিশু যেমন নূতন খেলনার দোষগুণ বিচার করিতে পারে না, গভীরতম আনন্দে খেলনাকেই প্রিয় জ্ঞান করিয়াই অনুক্ষণ তাহা লইয়া থাকিতে চায়, বিচার করিতে জানে না সে খেলনার কতটুকু দাম, তার স্থিতির কালই বা কত দিন, অলকের পত্রখানা তেমনি আনন্দের আমেজ আনিয়া দিল। মন অনুক্ষণ সেই ছত্র কয়টা লইয়াই ভরপুর। চিঠিখানা যেন নেশার মত রত্নাকে পাইয়া বসিয়াছিল। গভীর বেদনায় রত্নার মনে হইল, চিঠিখানা যেন গৌরবের বরণ-ডালা সাজাইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে।

আতুর মন কেবলই ভাবিত, তাহার কোন মূল্য, কোন মর্য্যাদা নাই। থাকিলে এতখানি তাচ্ছিল্য সহিতে হয়? এ চিন্তা মনে জাগিবামাত্র চিন্তায় মুখ রোধ করিয়া ভাবিত, না, না, অমিয় তাহার কেহ নয়! অমিয়কে সে ভালবাসে না। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি যদি মানুষকে সব সময়ে চালিত করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত জটিলতার—যত কিছু দুষ্কৃতির নিমেষে বিলোপ ঘটিত! কিন্তু তাহা হইবার নয়।

রত্না মনে মনে ভাবে, ভাগ্যে মাসিমা আসিয়াছিলেন, নয় ত রত্না দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া কি যে করিয়া বসিত—করিলে তাহার লজ্জায় সমগ্র জীবন সে মরমে মরিয়া থাকিত! সে খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! কি উন্মত্ততাই না তাহাকে ঘিরিয়াছিল! এবং এই বাঁচার স্বস্তি ভোগ করিতে গিয়া মন বলে, অমিয় যেন কচের মত নিষ্ঠুর! সে বলিয়াছিল—

"আমি বর দিনু দেবী সর্ব্বসুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্বদুঃখ বিপুল গৌরবে।"

ব্যর্থতার বিক্ষুব্ধ নিশ্বাসে মন ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া সারা হয়। অমিয়কে যে রূঢ় কটূক্তি করিয়াছে তাহার জন্য মনে অনুতাপ জাগে।

অলকের চিঠি খুলিয়া সে তিক্ত চিন্তা রত্না পরিত্যাগ করিতে চায়। মনে মনে সঙ্কল্প করে, গোস্বামি-প্রাসাদে গিয়া অলক রায়কে সে ধন্যবাদ দিবে। তাহাকে অভিনয়ে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া গোস্বামি-প্রাসাদের সঙ্গে অনিলের মুখও স্মৃতিপটে জাগে। অনিল তাহার অনুরক্ত। সে যদি অমিয়কে না ভালোবাসিয়া অনিলকে আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা হইলে কল্পনার মত সে-ও মস্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইত। মাসিমার মত প্রৌঢ় বয়সেও দাম্পত্য-জীবন মধুময় করিতে অনিলের জন্মদিনে সে-ও এমনি উৎসব-আনন্দ করিত। পৃথিবীতে মাসিমাই ভাগ্যবতী, কমলা-বীণাপাণি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন! অমন ভাগ্য নারী মাত্রেই কামনা করে।

এক দিন সকালে রমেশ সকন্যা কলিকাতায় যাত্রা করিলেন এবং রত্নাকে বোর্ডিংএ রাখিয়া ফিরিবার প্রাক্কালে তাহার কথার উত্তরে বলিয়া গেলেন, "না মা, ভুলবো কেন? সত্যর ওখান হয়েই বাড়ী যাবো।"

* * * *

তার পর প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেছে! গোস্বামি-প্রাসাদের কেহ রত্নার তত্ত্ব লইতে আসে নাই। রত্নার মন উতলা হয়। যে খাঁচা স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, সেই খাঁচার মধ্যে বসিয়া বনের পশু যেমন সম্মুখে খোলা যেটুকু জায়গা দেখিতে পায়, দু'চোখের দৃষ্টিতে বহির্জগতের সেইটুকুর পানেই চাহিয়া মুক্তির আশায় অধীর হয়, ছটফট করে—অবশেষে দিনান্তে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেদিনকার মত মুক্তির আশায় অবসন্ন হয়, তেমনি করিয়াই রত্না তাহার এবারকার বোর্ডিং বাসের দিনগুলা যাপন করিতেছিল। নিত্যই মনে মনে হিসাব করিত, কত দিন গোস্বামি-গৃহের কোন মানুষ রত্নার খোঁজে আসিল না! কেন আসিল না, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে মন যে দিকে ইঙ্গিত করে, রত্না

তাহাতে ভীত হয়। না, মাসিমা যথার্থই তাহাকে স্নেহ করেন। এমন করিয়া তিনি রত্নার সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া দিতে পারেন না—এ কথা বলিয়া মনকে সে সান্ত্বনা দেয়।

ছুটির পর কল্পনা বোর্ডিংএ ফিরিয়াছে। কিন্তু রত্না তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিত না। কল্পনার দিকে চাহিলেই দেহে-মনে কেমন ঈর্ষার জ্বালা ধরিত।

একদিন ঝরণার মুখে রত্না শুনিল, কল্পনার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কল্পনার ইচ্ছা, শুভ কাজটা বি-এ পাশের পরে হয়। উভয় পক্ষই তাহাতে সম্মত।

রত্না কোন উত্তর দিল না। ঝরণা বলিতে যাইতেছিল, "তুই জানিস্ না—তোর ওই গোস্বামী সাহেবের ছেলের সঙ্গে যে।"

রত্না সে কথারও কোনো সাড়া তুলিল না। শুধু পিতাকে লিখিয়া জানাইল—মেসোমশাইয়ের ওখানকার খবর সে বহু দিন জানে না।

তাহার পরের শনিবার মিসেস্ গোস্বামী স্বয়ং আসিয়া রত্নার নিকটে উদিত হইলেন। প্রসন্ন হাস্যে নিজের কাজের মস্ত ফর্দ্দ দিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া রত্না কহিল, "আপনি আমায় ভুলে গেছেন মাসিমা?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বেত-পলাশের বৃহৎ কৃষ্ণ-তারকা হইতে গ্রন্থিহারা ক'টি মুক্তা ঝরিয়া পড়িল।

মিসেস্ গোস্বামী স্নেহপরায়ণা, তাঁহার মন নিমেষে মমতায় ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, বাস্তবিক এই প্রচ্ছন্ন বিমুখতায় রত্নার প্রতি মস্ত অবিচার করা হইয়াছে।

রত্নার পিঠ চাপড়াইয়া স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে আদর করিয়া তিনি কহিলেন, "পাগল মেয়ে! আমি কি ভুলতে পারি? চলো, আজই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। প্রিন্সিপালকে বলছি।"

রত্নার মুখে যেন শরৎ-আকাশের এক ঝলক সোনালী কিরণ পড়িল।

মোটরে বসিয়া মিসেস্ গোস্বামী রত্নাকে কহিলেন, "আমি ভাবতুম, তোমাকে আনা আর ঠিক নয়। পরীক্ষা এসে পড়েছে!"

কুয়াশা-ঢাকা আকাশ পরিষ্কার করিয়া অরুণোদয় হইল। অন্তরের সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল। পড়ার ক্ষতির জন্যই মাসিমা আসিতেন না। রত্না অথচ কি যে সব ভাবিত!

রত্নাকে দেখিয়া মিষ্টার গোস্বামী বিস্ময় সারিয়া লইয়া কহিলেন, "ওঃ, এই যে, অনেক দিন পরে! বেশ ভালো আছ? কাল তোমার বাবার একখানা চিঠি পেয়েছি।"

নমস্কার করিয়া নতমুখে রত্না জানাইল, "সে ভালো আছে।"

সন্ধ্যায় উৎসুক চক্ষে চারি দিকে চাহিয়া রত্না কহিল, "অনিলদা নেই?"

"অনিল—ও! না, ওরা সব পূজার সময় রায়পুরে শীকার করতে যাবে—সুশীলের খুব শীকারের ঝোঁক কি না, সব সেখানে গেছে। সেখান থেকে বোধ হয় সিনেমা যাবে।"

রত্নার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠে সে কহিল, "আপনি কোথাও যাবেন না, পূজোর ছুটীতে?"

"তাই তো, কোথায় যাবো, কিছু এখনো স্থির করি নি।" বলিয়া রত্নাকে খুশী করিবার জন্য কহিলেন, "তুমিই বলো তো রত্না, কোথা যাই!"

রত্না হাসিল। কহিল, "বাঃ! আমি কি পাঁচটা ভালো মন্দ দেশ দেখেছি যে বলবো!"

"তাতে কি হয়েছে! পাঁচখানা বই তো পড়েছো!"

রত্নার মনে পড়িল—গত বছর ঝরণারা মুসৌরী গিয়াছিল, মুসৌরীর কত গল্প সে করে। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "মুসৌরী কেমন?"

প্রসন্ন হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "বেশ ভালো! সুন্দর বলেছো রত্না। কল্পনার মা-বাবা সব মুসৌরী যাবে বলছিলো।"

রত্নার মুখ পাংশু হইয়া গেল।

পরের দিন রত্নাকে দেখিয়া অনিল কহিল, "এই যে রত্না! কেমন আছো? ভালো তো!"

নমস্কার জানাইয়া রত্না কহিল, "ভালো! তুমি কেমন? ভালো তো?"

অনিল কহিল, "নিশ্চয়! চেহারাতে মালুম পাচ্ছ না?"

রত্না দেখিল, অনিল যেন আরও উজ্জ্বলকান্তি সুপুরুষ হইয়াছে।

অনিল হাসিয়া কহিল, "তার পর কল্পনার খবর কি?"

বাতায়নের দিকে সরিয়া রত্না কহিল, "আমি অত পাঁচ জনের খবর রাখি না।"

অনিল হাসিল। কহিল, "তা বটে! তোমার সঙ্গে তার আবার ওই যে কি বলে—একটু—"

মুখ ফিরাইয়া অনিলের প্রতি চাহিয়া রত্না কহিল, "একটু কি শুনি?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে অনিল কহিল, "না, এমন কিছু নয়—ওই যে জেলাশি না কি বলো তোমরা! আচ্ছা থাক তার খবর—তোমার খবর কি বলো?"

ঔদাস্য-সহকারে রত্না কহিল, "আমার আবার খবর কি? খবর তো তোমাদেরই।"

"তা বটে! আমাদের একটা খবর আছে। আমরা একটা থিয়েটারের আয়োজন কচ্ছি।"

রত্না চমকিয়া উঠিল। কহিল, "ও! আচ্ছা যিনি উর্ব্বশী অভিনয়ে নারদ সেজেছিলেন, তাঁর খবর জানেন?"

বিস্মিত কণ্ঠে অনিল কহিল, "কেন, রায়ের খবরে তোমার প্রয়োজন ?"

রত্না অপ্রতিভ হইল। উত্তর দিতেই হইবে। ঢোক গিলিয়া কহিল, "না, এই একখানা—"

স্থির চক্ষে রত্নার কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া অনিল কহিল, "একখানা কি ?"

কুণ্ঠিত স্বরে রত্না কহিল, "তিনি আমায় একখানা চিঠি লিখেছেন।"

"রায় তোমায় চিঠি লিখেছে ?" অনিলের স্বর অপ্রসন্ন।

রত্না থতমত খাইয়া গেল। জবাবদিহির মত জড়াইয়া জড়াইয়া সে কহিল, "থিয়েটার করবার জন্যে। বন্যা-রিলিফ ফণ্ডে সাহায্য করবে নাকি—"

"ও!" অনিলের ওষ্ঠে তাচ্ছল্য ফুটিল। কহিল, "রায় তোমার ঠিকানা জানলে কি করে ?"

"অভিনয়ের দিন বাবার নাম-ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন।"

অনিল আর কিছু বলিল না। শুধু তাহার মুখের সে অসন্তোষের ছায়াটুকু মুছিয়া গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রত্না কহিল, "তিনি এখানে আসবেন না ?"

"কে ? রায় ? হ্যাঁ, আসবে বৈ কি। আজ দশটায় আসবে।"

রত্না বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল—বয় আসিয়া জানাইয়া গেল, ছোটসাহেব সেলাম ভেজা, রায়সাহেব আয়া।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া মন্থর গমনে সে বারান্দায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রেলিংটা ধরিয়া কি ভাবিল। তাহার পর সুরার গন্ধে আকৃষ্ট মাতালের মত সে রায়সাহেবের কাছে আসিয়া দর্শন দিল।

সসম্মানে আসন ত্যাগ করিয়া যুক্ত করে ললাট স্পর্শ করিয়া নমস্কার জানাইয়া রায় কহিল, "ভালো আছেন ?"

প্রতি-নমস্কার জানাইয়া রত্না কহিল, "হ্যাঁ।"

অনিল কহিল, "ভালো না থাকলে আর এখানে উপস্থিত!"

চেয়ারে বসিয়া রত্না কহিল, "আপনি ভালো আছেন?"

বক্র কটাক্ষে অনিলের পানে চাহিয়া অলক কহিল, "হ্যাঁ! বুঝলে কি না অনিল, আমাদের নাটকখানা অভিনয়ের জন্য এই—"

সহাস্যে অনিল কহিল, "কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক! মিস্ বোসের কাছে আগেই সব শুনেছি। কিন্তু অভিনয়ে কি উনি যোগ দেবেন? এটা হচ্ছে পাবলিকের জন্য—দস্তুর-মত টিকিট বিক্রী হবে এখানে।"

অলক কহিল, "কিন্তু কত দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত্ত, আর্ত্ত, আতুর নরনারীর উপকার করা হবে। অন্নহারা, গৃহহারা, বস্ত্রহীন সেই প্রপীড়িতদের কথা ভাবো দেখি অনিল! মার কোলে ছেলে শুকিয়ে মরছে মিস্ বোস! তার পাশে অনশন-জীর্ণ মাও মরছে। বস্ত্রাভাবে মেয়ে বাপমা'র সামনে বার হতে পারছে না। শেয়াল-কুকুরের মত ক্ষুধার্ত্তের দল উচ্ছিষ্ট পাতা চেটে খাচ্ছে—এই দুঃসহ দৃশ্য একবার স্মরণ করুন।"

বিভীষিকা দর্শনের মত রত্নার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ব্যাকুল কণ্ঠে সে কহিল, "না, না, আমি আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয় যোগ দেবো।"

পুলকিত কণ্ঠে অলক জবাব দিল, "এমনি উত্তরই আমি আশা করেছিলুম। মেয়েরা স্নেহ-পরায়ণ জাত। তাই চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছিলুম। আপনি ভাবুন, এই নৃত্যকলা কাদের জন্য হচ্ছে? এর মাঝে থাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ! আপনার বাবা অমত করবেন বলে মনে হয় না!"

দৃঢ় স্বরে রত্না কহিল, "না, বাবা কিছুতেই অমত করবেন না। আমি আপনাদের অভিনয়ে যোগ দেবো মিষ্টার রয়, এবং অন্তরের সমস্ত উৎসাহ নিয়েই যোগ দেবো।"

আনন্দ-গদ-গদ কণ্ঠে অলক কহিল, "ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আপনার মন খুব উঁচু। আর দেখবেন, এই নৃত্য-কলা আপনাকে গৌরবের কোন্ স্বর্ণ-সিংহাসন দেবে। আপনার অলৌকিক নৃত্য-প্রতিভা পাভ্‌লোভার মতই আপনাকে এক দিন যশস্বিনী করবে। সারা বার্ণার্ডের রোজগার জানেন? আর ইউরোপে আমেরিকাতে বড় বড় ষ্টার আছেন, যাঁরা স্বামীর সঙ্গে একত্রে নামচেন।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টেবলের উপর হাত রাখিয়া সে কহিল, "মিষ্টার রায়, আমার মনের কথার প্রতিধ্বনিই যেন আপনার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে।"

অনিল সব কথায় যোগ দেয় নাই। উত্তরও কিছু দিল না। নূতন কেনা জাপানী কুকুরটার সহিত সে ক্রীড়া করিতে মত্ত।



তরুপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে রবি-কিরণের ঝিকিমিকি খেলার ন্যায় সমস্ত কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অমিয়র চিত্তে রত্নার চিন্তাটা উঁকি মারিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিত এবং সেই অন্যমনস্কতা এক এক সময় এত গভীর হইত যে, হাতের কাজকর্ম্ম হাতে লইয়াই সে বসিয়া থাকিত। মনের পটে জাগিত রত্নার ছবি! হুঁস হইলেই অমিয় নিজেকে তিরস্কার করিত, শাসন করিত। অবাধ্য মন কিন্তু বশ মানিত না। ভূতের মত উৎপাত করিতে ছাড়িত না।

এবার কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে মা তাহাকে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় দেন নাই, সে কথা মনে পড়িত। অন্তর ক্ষুব্ধ হইত! কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত যে কথা মনে উদ্ভাসিত হইত, তাহাতে অমিয় ভাবিত, ভালই হইয়াছে! পলাইয়া আসিয়া সে ভালো কাজ করিয়াছে! শুভগ্রহই তাকে সুমতি দিয়াছিল।

আদালতের কাজ সারিয়া অমিয় ক্লাবে যাইত। সেখান হইতে ফিরিয়া ডিনার শেষে সে প্রবেশ করিত নিজের লাইব্রেরী-কক্ষে। বিশ্বের সকল জ্ঞানের অনন্ত ভাষার পুস্তকরাজি অধ্যয়নে তার ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ!

আজও তেমনি একখানা বই হাতে লইয়া সে বসিল। বইখানা ছিল মনোবিজ্ঞানের। সাইকলজি অমিয়র বড় প্রিয়। বইয়ে মনও নিবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গোপন অভিসারিকার ন্যায় চিত্ত যে চুপে চুপে কোন ফাঁকে পড়া হইতে সরিয়া রত্নাকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কিছুই এই বিচক্ষণ হাকিম জানিতে পারিল না।

অমিয় ভাবিতেছিল, রত্নার সে দিনের সেই ব্যবহার। যে-মনের কতখানি প্রমত্ত অবস্থা, সেই কথা! কেবল অনুমান করিতে পারিতেছিল না, মনে এমন বিক্ষিপ্ততা তাহার কেন আসিল? রত্নার প্রতি নিজের প্রত্যেকটি আচরণ মনে মনে একাধিক বার নাড়িয়া চাড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়া সে দেখিতেছিল। কোন্ ঘটনার সূত্র দিয়া তাহার বুকে দুর্জ্জয় প্লাবনের মত দুরন্ত বাসনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—কি সে ঘটনা?

রত্নাকে লইয়া অমিয় মোটরে বাহির হইয়াছিল। রত্নার প্রতিভার কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিল, এই নবতম বিদ্যার আনন্দ-স্বাদ তাহাকে দিয়া নিজে একটু পুলক উপভোগ করিবে মাত্র এবং তাহার পর যে কটা দিন গিয়াছিল, সে রত্নার একান্ত জিদের আকর্ষণেই! ভাবিয়াছিল, প্রতিভাশালীর লক্ষণই এই—যখন যেটা গ্রহণ করে, এমনি বিপুল আগ্রহেই করে। ইহাই তাহাদের প্রকৃতি-স্ফুরণের একটা বিশিষ্টতা এবং রত্নাকে যে আশ্বাস সে দিয়াছিল, তাহার মধ্যে এতটুকু কপটতা ছিল না। বাস্তবিক আজও সে প্রস্তুত—শিক্ষা সম্বন্ধে রত্নার অভাব পূরণ করিতে। তবে এত বড় একটা বিপত্তি আসিল কোন পথ দিয়া? এমনি করিয়া রত্নার সহিত জড়িত প্রতি ঘটনা বাছিয়া অমিয়র মন যখন মালা

গাঁথিতেছিল, তখন বিচার-বুদ্ধি সহসা প্রশ্ন করিল—এই ফুলগুলির মধ্যে কি যে কীটের বাসা আছে, তাহা কি অন্তর্দৃষ্টির অবিদিত নহে? তাহার বুকে কি কোন গোপন তৃষ্ণা লুকাইয়া ছিল না? অন্তর কি দিনের পর দিন ক্রমশঃ রত্নার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল না? দৃষ্টি কি তাহার অপরূপ রূপ-সুধাপানের নিমিত্ত লালায়িত হইত না? এ সকল কি মিথ্যা? অন্তর কি অতি সংগোপনে রত্নাকে ভালোবাসিতে সুরু করে নাই? অমিয় শিহরিয়া উঠিল। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রত্নার প্রতি উদাসীন হইতে চেষ্টা করিয়াছে। উপায় ছিল না বলিয়াই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিল। তাহার পরেই সে নিরালায় ছুটিয়া আসিয়াছিল আপনাকে শান্ত করিতে। রত্না যে বায়ু-হিল্লোলের মত পাঁচ জনের মাঝে মিশিয়া গেল, তাহাতে অমিয় স্বস্তিবোধ করিয়াছিল। কিন্তু সেই নির্জ্জন বিশ্রাম-আসরের কথা স্মরণে আসিতেই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল আর একটী দৃশ্য।

কনিষ্ঠ অনিল কল্পনার নিভৃত বিশ্রামের সঙ্গী। নিরালায় আলাপের জন্য বৃষ্টির অন্তরাল ও অন্ধকার তাহারা খুঁজিতেছে। অনিল কল্পনার বাহু ধরিয়া তাহার মনোরঞ্জন-প্রয়াসী! কল্পনাও অনিলের সঙ্গ-পিয়াসী। সেই কল্পনাকে অমিয় বিবাহ করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু মায়ের কাছে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কিছু প্রকাশ করা যায় না। অমিয় বলিতে পারিত, কল্পনাকে সে চায় না। মা অমনি অন্য মেয়ের জন্য সুপারিশ করিতেন। কিন্তু বিবাহ অমিয়র পক্ষে—ছায়াচিত্রের মত চোখের সামনে ভাসিতে থাকে কত ছবি। ফারপোতে সে রত্নাকে লইয়া চা খাইতে গিয়াছিল। বন্ধুদের সেই হাস্য-কৌতুক রঙ্গ-রহস্যের মাঝে যদি কিশোরীর চিত্তে বিভ্রম জাগে—অমিয়কে পাইবার বাসনা যদি সেই মুহূর্ত্ত হইতে রত্নার বুকে জাগিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? রত্না? না, অমিয়?

প্রগল্‌ভা বলিয়া রত্নাকে নিন্দা করিয়া অমিয় মনে মনে তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। অমিয় রত্নাকে দেখিয়াছে—শিশুর মত সরল-প্রকৃতি, অভিমানী কিশোরী, অল্পে তুষ্ট, সামান্যে খুশী। কল্পনার মত জাল বিছাইয়া নিজের অধিকার সে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে জানে না। বানের জলের মত ছুটিয়া আসে, দুর্ব্বার আকর্ষণে সব ভাসাইয়া লইতে চায়, আবার বানের জলের মতই সরিয়া যায়। পরমুহূর্ত্তে শান্ত হইয়া পড়ে।

অমিয়র মনে হইল, রত্নাকে কি গ্রহণ করা যায় না? তাহার অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন সুগভীর ভালবাসা রত্নার এই দুরন্ত বাসনা এ দু'য়ের সম্মিলনে দু'টি জীবনই মধুময় হইয়া ওঠে! রত্নাকে বিবাহে বাধা কি? সেই মুহূর্ত্তে দীর্ঘ দিনের সংস্কার তীক্ষ্ণ তীরের মত অন্তরে বিঁধিল। পিতৃপিতা-মহের রক্তের ধারা তাহার দেহে প্রবহমান। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান—গেঞ্জির তলায় যে ক'গাছি সূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার অমর্য্যাদা করা অমিয়র পক্ষে দুঃসাধ্য!

অমিয় সিদ্ধান্ত করিল, কিছু কাল সে গৃহে ফিরিবে না। বাড়ীর সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না। শত প্রয়োজনেও না। জননী রুষ্ট হন হোন্, তিরস্কার করেন করুন, পিতৃ-প্রকৃতি সে জানে, স্বেচ্ছায় না গেলে, জিদের আহ্বান কখনও তিনি করিবেন না। মা কল্পনার সহিত অনিলের বিবাহ দিবেন বলিয়াছেন। যে দিন সে শুভ সংবাদ কানে আসিবে, নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইবে অমিয় কেবল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিতে। আর যদি কখনও শোনে রত্নার বিবাহ, অমিয় যাচিয়া রত্নাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া দিবে। না, না, নবদম্পতীর সুখ-কামনা-যৌতুক দিতে সে স্বয়ং উপস্থিত হইবে। আনন্দের সহিত বলিবে, তুমি সুখী হও রত্না। না, না, অমিয় কদাচ আর রত্নার সম্মুখীন হইবে না। রত্নার শান্ত মন যদি

স্বামীর পাশে থাকিয়া অমিয়র জন্য চঞ্চল হয়? তাহা হইলে অপরাধ হইবে, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম—সে শ্রদ্ধা করে। অমিয় তাহার বিপরীত মতবাদ যুক্তি তর্ক আচার ব্যবহারে জ্বলিয়া যাইত। অমিয় মনে করিত সংযমই মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু যে সমাজে বাস করিত, তাহার আবহাওয়া এই নীতিপ্রিয় মানুষটির নিকট বিষাক্ত বাষ্পের মত ক্লেশকর হইত। তাই সে দূরে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে ভালবাসিত।

কিন্তু অকস্মাৎ অমিয়র মনে হইল, তাহার দীর্ঘ দিনের নীতিজ্ঞান কেমন করিয়া শিথিল হইল, মন রত্নাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। মনের কঠোর শ্লেষ-উক্তি আমরণ তাহার চিত্তে জ্বলিতে থাকিবে। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন, সে কটূক্তি রত্না কানে শোনে নাই।

ঘড়ির শব্দে অমিয়র হুঁশ হইল, অনেক রাত্রি অবধি বই লইয়া বসিয়া আছে। পৃষ্ঠা উল্টানো অবধি হয় নাই। বই রাখিয়া আলো নিবাইয়া সে শয়ন-কক্ষে আসিল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ছবিতে রত্না বিচরণ করিতে লাগিল। মোটরে অমিয়র পাশে সে বসিয়াছে। অমিয়র কাঁধে হাত রাখিয়াছে। অমিয়র ঘরে ঢুকিয়া অশ্রু-বিবশ মুখে অমিয়র হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় অমিয় নিজেকে সম্বরণ করিতেছে।

ভোরের আলো চোখে লাগিতেই অমিয় শয্যা ত্যাগ করিল।

বাংলোর বাগানে পাখীরা গানের জলসা বসাইতেই অমিয় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া চা খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

খানিকটা বেলায় গৃহে ফিরিয়া দেখিল, ডাক আসিয়াছে। চিঠিগুলা নাড়া-চাড়া করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বন্ধু সুশীলের চিঠি পাইল।

বন্ধু সুশীল অমিয়কে শীকারে যাইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়াছে—এবারে সে আয়োজন করিয়াছে প্রচুর।

নিমেষে অমিয়র মন নাচিয়া উঠিল। আজ আবার একটু বাঘ, বরাহদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে আনন্দ উপভোগ হইবে। এই একঘেয়ে জীবন-যাত্রা আর ভালো লাগে না! অস্বস্তি ধরিয়াছে। সব চেয়ে আনন্দ যে, এই ভুতুড়ে চিন্তার হাত হইতে হয়তো নিষ্কৃতি মিলিবে।

৩৪

হরিশ ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিত।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিবামাত্র একখানা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন হাতে আসিল। কাগজখানা পকেটে পুরিয়া অফিসের তাড়ায় ট্রামে উঠিয়া বসিল।

কিন্তু পাশের যাত্রী যখন কহিল, ইস্, রত্না বোসও যে নামবে! তখন মুখ তুলিয়া হরিশ লোকটার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল।

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লোকটা কথা কহিয়াছিল, সে কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমস্ত রথ-রথীরাই রয়েছেন! ওই বন্যা-সাহায্য হুজুগ।"

"তা হোক মশাই, টিকিট কিনতে হবে!"

"সে তো হবেই!" এমন থিয়েটারটা দেখবো না? ভগবানের দেওয়া চক্ষু দু'টো ওদের না দেখলে সার্থক হবে কি করে?"

হরিশ অফিসে আসিল। সেখানেও ওই থিয়েটারের প্রসঙ্গ! হরিশের সহকর্ম্মীরা কহিল, "হরিশবাবু, টিকিট কেনা হয়েছে?"

হরিশ প্রশ্ন করিল, "কিসের টিকিট?

"ও তোমার কার্ড আসবে বুঝি?" মুকুন্দ কহিল।

হাসিয়া বড়বাবু কহিলেন, "হরিশের ভাইঝী খুব নাম করেছে।"

হরিশ থতমত খাইল। এটা সুখ্যাতি, না প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ? মাথা চুলকাইয়া হরিশ কহিল, "আজ্ঞে, স্যার—"

কেশিয়ারবাবু প্রবীণ ব্যক্তি। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "হ্যাঁ হে হরিশ, তুমি তো করো ষাট্ টাকা মাইনের চাকরী! দাদাটি তো দেশের স্কুলে হেডমাষ্টার! ভাইঝী এ হোমরা-চোমরা দলে ভিড়ল কি করে!"

নিতাই কহিল, "সাবধান হরিশ! ওরা সব এক-একটি রাঘব বোয়াল—এ চুনোপুঁটি দলের বিপদ ওইখানে!"

হারাধন কহিল, "রাখো রাখো তোমার বক্তিমে, হরিশের ভাইঝীকে গোস্বামী সাহেব পুষ্যি নিয়েছে জানো।" বলিয়া সে বন্ধুদের চোখ টিপিল। এবং অত্যন্ত ভাল মানুষের মত কহিল, "দ্যাখো হরিশ, আমি একটা সৎ-পরামর্শ দি। ভাইঝী যখন অতবড় হাই সার্কেলে চলা-ফেরা করে তখন তাকে মুরুব্বি ধরে একটা বড় চাকরির জোগাড় করে নাও। এই বেলা বুঝে দ্যাখো, সুযোগ বার বার আসে না।"

কোন কথারই হরিশ আজ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এক দিন মহা উৎসাহে যে কথা যে পরিচয় সে দিয়াছিল, বন্ধু-মহলে বড় গলায় যাহা বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিল, আজ অপরের মুখে তাহার পুনরুক্তি হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা যেন বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে। তথাপি কোন রূঢ় উত্তরের খোঁচায় এই ভীমরুলের ঝাঁককে সে আহত করিতে পারিল না। নিজের টেবিলের সামনে আসিয়া বসিল।

সারাদিন ঘাড় গুঁজিয়া কাজ সারিয়া যখন উঠিতেছে, কেসিয়ারবাবু গলা বাড়াইয়া কহিল, "ভায়া, আমার জন্য একখানা পাশ।"

বিরক্ত হইয়া হরিশ কহিল, "না বসন্তবাবু, মাপ করুন, আমি ও-সব জানি না।"

গৃহে ফিরিয়া সোজা সে অগ্রজের কাছে আসিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার দাদা?"

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া রমেশ কহিলেন, "কিসের ব্যাপার ?"

"রত্না নাকি থিয়েটারে নামচে! চার দিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে!"

রমেশের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আহ্লাদের সুরে কহিলেন, "তাই নাকি। বলো কি? কোন্ কাগজে দেখলে? সব বলো যে বুঝি, কি বলছো!"

"যা বলছে, তা খুব শ্রুতিমধুর নয়।"

অবাক হইয়া রমেশ কহিলেন, "শ্রুতিমধুর নয় মানে? ওরা কি বলছে, রত্না পারবে না, ভড়কে যাবে?"

জ্যেষ্ঠের বাক্যে হরিশের গা জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত কণ্ঠে সে কহিল, "সে সব কথা হচ্ছে না দাদা। আমি বলছি, আমরা যে সমাজের লোক, যে দরের মানুষ, যেমন অবস্থা, তেমনি চলা-ফেরা করাই ভালো। তুমি এ সবের প্রশ্রয় দিয়ো না।"

এতক্ষণে রমেশ ভ্রাতার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কহিলেন, "দেখ হরিশ, তুমি যে তোমার বৌদির বায়না ধরলে। কিন্তু সে মেয়েমানুষ। ঘরের কোণে বন্দী, তার কথা আলাদা। তুমি তো তা নও, বেশী না হ'লেও কিছু তো লেখাপড়া শিখেছো। তুমি ষাট টাকা মাইনেতে জন্ম খোয়াচ্ছ বলে মণির কি পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভালো? না, তুমি কামনা করো না, মণি হাইকোর্টের জজ হোক—একটা দিক্‌পাল হোক?"

দাদার বিদ্‌কুটে যুক্তি শুনিয়া হরিশ হতবাক্ হইয়া মুহূর্ত্তে ভাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল, "সে বেটাছেলে, বাইরের সমাজেই তাকে টানছে। কিন্তু এ মেয়েমানুষ, এ রাজরাণী হোক—আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু—"

হরিশের সব কথা বলা হইল না। দুই হাত তুলিয়া রমেশ কহিলেন,

"থাক্ থাক্ হরিশ, তুমি যা বলবে, সে সব আমার জানা আছে। কিন্তু ও মামুলী গৎ শুন্‌তে আমি রাজী নই, আচ্ছা হরিশ, বড় কথা তো তোমরা বুঝবে না, শুধু এই একটা ছোট কথাই শোনো। রত্না যে-সে নয়। ও কে জানো? তোমার বৌদি রত্নেশ্বর মহাদেবের মাদুলী পরে তার দোর ধরেছিল, তাতে নাকি ছেলে হতেই হয়। কিন্তু আমার ভাগ্যে জন্মালো মেয়ে। তখনি বুঝলাম, সাক্ষাৎ সরস্বতী এলেন। বিধাতার ভুল-চুক। কিন্তু শঙ্করের প্রভাব ওর ওপর যেন ষোল আনা। তুমি তো রত্নাকে তেমন করে ষ্টাডি করো নি—আমি করেছি। জানি। তাই তোমরা যে পথে ওকে চালাতে চাও, আমি তা চাই না।"

অপ্রসন্ন মুখে হরিশ নীরব রহিল। রমেশ কহিলেন, "রত্নার গতি তীব্র, গ্রহণ করবার শক্তি প্রখর, আয়ত্তে আনবার ক্ষমতা অদ্ভুত! ওর এতখানি প্রতিভা আমি তোমাদের পরামর্শে নষ্ট হতে দেবো না, দিতে পারি না।"

হরিশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গমনকালে বলিয়া গেল, "অতি জিনিষটা ভাল ফল দিতে পারে না দাদা, আবহমান কাল শুনছি। ও আনে কেবল দুঃখ।" বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

অমলার কানে যখন এ কথা উঠিল, কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত রহিল, তার পর কহিল, "বলো কি ছোটবাবু। রাস্তায় রাস্তায় কাগজে মারা হয়েছে এ-কথা।"

"বিশ্বাস না হয় এই কাগজখানা পড়ে ভাখো। এতগুলো ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে, এদের কাউকে তুমি চেনো—কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ সখা, কেউ সখী, এ-সব কি বৌদি?"

রুষ্ট কণ্ঠে অমলা কহিল, "কত মানা করি, কে কানে কথা তোলে! মেয়ে আমার দোষী নয়! তোমার দাদাই তাকে এমনি কচ্ছে—সে আমার লক্ষ্মী মেয়ে!" অমলার স্বর বাষ্প-রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হরিশ কহিল, "তুমি এক কাজ করো বৌদি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলা চাহিলেন।

"রত্নার একটা বিয়ে দিয়ে ফেল। ও এবার দেশে এলে, কেঁদে কেটে যেমন করে পারো, সেই ব্যবস্থা করো।"

"বিয়ে।" অমলা দুই চোখ কপালে তুলিলেন। কহিলেন, "তোমার ভাই তেড়ে মারতে আসবে ছোটবাবু। মেয়েই পেটে ধরেছি—বাস্, এই যা।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরিশ কহিল, "মিথ্যা বল নি, কিন্তু দেখ বৌদিদি, সহজে ছাড়বে কেন। যতরকমে পারো।"

আক্ষেপের হাসিতে অমলা কেবল কপালে হাত দিল।

রাত্রে আহারাদির পর অমলা কাগজখানা হাতে লইয়া কথা পাড়িতে রমেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, "হরিশ বুঝি তোমার কাছে বিশখানা করে বলে গেছে?"

সহোদরের উপর এমন উক্তি রমেশ কদাচ করিতেন না। বিস্মিতকণ্ঠে অমলা কহিল, "বিশখানা আবার কি! আমরা মেয়েকে থিয়েটার করতে কল্‌কাতায় পাঠাই নি, পড়তে পাঠিয়েছি।"

তড়াক্ করিয়া রমেশ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। রুষ্টস্বরে কহিলেন, "জানি, জানি—আমি তখন ছোট, ইস্কুলের ছেলে, একটু যাত্রা করতুম —অমনি বাবার কানে সব বলতো, উচ্ছন্ন গেছি—তবু একজামিনে বরাবর ফাষ্ট' হয়েছি। বখে গেছি, বখে গেছি, বলে আমার অত বড় প্রতিভাটাকে নষ্ট করে দিলে। তেমনি পাঁচ শত্তুর আমার মেয়ের পেছনে লেগেছে। কিন্তু আমি বাপ, আমি তার সহায়!"

রাগ করিয়া অমলা কহিল, "শত্তুর আবার কে? বলেছে তো তোমার মা'র পেটের ভাই! আর সে মিথ্যে বলে নি। গায়ে লাগে, তাই বলেছে।"

রমেশ কহিলেন, "আমি শুনতে চাই না! যত যে পারে বলুক! কারো কথা আমি কানে তুলবো না! বুঝতে পারো না—ওর হরিমতী আছে—তাই!"

আশ্চর্য্য হইয়া অমলা কহিল, "ওর হরিমতী আছে, তাতে কি?"

তপ্ত স্বরে রমেশ কহিলেন, "হুঁ! তাতে কি! আমার মেয়ের হিংসেয় ও তাই জ্বলে মরছে!"

অমলা যেন এক নিমেষে পাথর হইয়া গেল।

৩৫

অমিয় আসিয়াছে শীকারের নিমন্ত্রণে।

সুশীল, ইভা এবং অমিয় চা খাইতে বসিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে সুশীল কহিল, "কাল তাহলে বেরুনো যাবে। আজ দশটার ট্রেণে কল্পনাও আসছে।"

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া অমিয় প্রশ্ন করিল, "সে আসছে নাকি?"

সুশীল কহিল, "নিশ্চয়! হ্যাঁ, ভালো কথা, সেদিন তোমাদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে তোমাকে পাবো ভেবেছিলুম। কিন্তু শুনলুম, দু'টোর গাড়ীতে তুমি চলে গেছ। কিসের এত তাড়া ছিল হে?"

অমিয় উত্তর দিতে যাইতেছিল, ইভা কহিল, "আর একজনকেও আমরা দেখতে পেলুম না মিষ্টার গোস্বামী।"

অমিয় কহিল, "আর একজনটি কে?"

সুশীল হাসিয়া কহিল, "যার বিদায়-ব্যথা সইতে পারবে না বলে আগেই তুমি পালালে—সেই মিস্ বোস্।"

সহাস্যে অমিয় কহিল, "ধন্যবাদ সুশীল! তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার দেখে তোমাকে তারিফ করছি।"

ইভা কহিল, "কেন, তিনিও তো ছিলেন না!"

অমিয় কহিল, "তিনি না থাকতে পারেন! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার চলে আসার কোন সম্পর্ক ছিল না।"

অমিয়র পরিহাস-তরল কণ্ঠ শেষের দিকে কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিল।

স্বামি-স্ত্রী চকিতে দৃষ্টি-বিনিময় করিল। মিষ্টার চ্যাটার্জি একটু জোরে হাসিয়া কহিল, "শ্যরি! এমন একটি কথা ভেবেছিলুম সে জন্যে, কিন্তু যাক, তোমায় শুভ আনন্দ-সংবাদ জানাচ্ছি।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অমিয় চাহিল।

সুশীল কহিল, "কল্পনা শীগ্‌গির তোমার খুব নিকট-আত্মীয়া হবে! অর্থাৎ অনিলকে আমরা নিজের করে পাবো।"

সহাস্যে অমিয় কহিল, "খুশী হলুম! এত দিন বন্ধুত্ব ছিল, এবার আত্মীয়তায় জড়িত হবো! ভগবান্ এ মিলনকে মধুময় করুন!"

দশটার সময় কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগিনীকে একা দেখিয়া সুশীল কহিল, "অনিল?"

"তার আসবার কথা ছিল, বন্দোবস্তও তেমনি হয়েছিল, হঠাৎ বললে, জরুরী কাজ।"

আশ্চর্য্য স্বরে সুশীল কহিল, "আদালত তো বন্ধ—পূজা-ভেকেস্‌ন।"

অপ্রসন্ন মুখে কল্পনা কহিল, "আমি কি তার কাজের হদিস্ রাখি! বোধ হয় রত্নাকে ট্রেণে তুলে দেবে বলে আসতে পারলে না।" বলিয়া সে অমিয়র পানে চাহিল।

অমিয় কোন জবাব দিল না। সামনের বাগানের দিকে যেন চাহিয়া ছিল, তেমনি নিরুৎসাহ মুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু রত্নার প্রসঙ্গ উঠিতে আর-একজন মানুষ স্থির থাকিতে পারিল না—সে ইভা। কৌতূহলী কণ্ঠে ইভা কহিল, "তোমাদের থিয়েটার খুব ভালো হয়েছিল!"

কল্পনা কহিল, "নিশ্চয়!" বলিয়া প্রফুল্ল মুখে অমিয়র পানে চাহিল, কহিল, "জানেন মিষ্টার গোস্বামী, এক-রাত্রে চার হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে।"

অমিয় একটু হাসিল। বলিল, "তাই নাকি! খুব ভীড় হয়েছিল তো?"

উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "নিশ্চয়! যাকে বলে ফুল হাউস! সমস্ত টিকিট আগে থেকে বুক হয়ে গিয়েছিল! আপনি কাগজ পড়েন নি—অভিনয় সম্বন্ধে যা লিখেছিল?"

ঔদাস্য-সহকারে অমিয় কহিল, "চোখে পড়েছিল। তেমন ভালো করে পড়া হয় নি।"

বিদ্রূপের ছোট একটা খোঁচা দিয়া কল্পনা কহিল, "কিন্তু—কিন্তু আপনি নাট্যকার!"

হাসিয়া অমিয় কহিল, "নাট্যকার হতে পারি—কিন্তু "নট" নই।"

ইভা উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "কাগজে দেখলুম, সব চেয়ে রত্নার অভিনয়ই ভালো হয়েছে।"

তাচ্ছল্যের স্বরে কল্পনা কহিল, "উর্ব্বশীর ভূমিকাতে ও ভালো পারে বটে, আর বইখানা "বিক্রম-উর্ব্বশী"। ওকে নিয়েই তো সব!"

সুশীল কহিল, "তোমরা তো ভূমিকা নির্ব্বাচন করেছিলে, বদল করে নিতে পারতে!"

কল্পনা হাসিল। কহিল, "আহা, দাদা তুমি ভুল করছো। রত্না উর্ব্বশীর ভূমিকাটা ভালো করে। কাজেই ওকেই সবাই সেটা দিতে চাইলে! তা বলে রাণীর পার্ট দিলে ও পারতো কি? কাজেই সে পার্ট আমায় নিতে হলো। এই যেমন পারুলদি, কত ভালো প্লে করে—তবু আজ তার নাম চাপা দিয়ে সবাই রত্না-রত্না করছে!"

সুশীল প্রশ্ন করিল, "অনিল কেমন প্লে করলে? সে তো বিক্রম৷ সেজেছিল?"

কল্পনা কহিল, "ভালোই।" বলিয়া অমিয়র পানে তাকাইয়া কহিল, "আপনার অর্জ্জুনের মত সাকসেস্‌ফুল কেউ হতে পারে নি কিন্তু!"

সুশীল সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। যেমন উর্ব্বশী, তেমনি অর্জ্জুন! অনেক অভিনয় আমি দেখেছি অমিয়, কিন্তু এমন জীবন্ত অভিনয় অতি অল্পই দেখেছি। অভিসারে উর্ব্বশীর ব্যর্থতা —তোমরা তার যে-অভিনয় করলে, মনে হলো, কল্পনার রাজ্য ছেড়ে সত্যকার মাটীতে যেন পা দিলে! মিষ্টার বাক্‌চিকে তো ধরে রাখা দায়! ষ্টেজের দিকে ছুটেছে—বলে, দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো আমি। মিসেস্ গোস্বামীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।"

ইভা কহিল, "বাস্তবিক উর্ব্বশীর অভিসারে অর্জ্জুনের মুখের ছবি যেন জলদ-জালে ঢাকা আকাশ! কবিরা যেমন বর্ণনা করেন! আর সে-মেঘে বিদ্যুৎ ওই উর্ব্বশী! উঃ, আমার বুকখানা কেঁপে উঠেছিল!"

সুশীল সোল্লাসে কহিল, "ব্রাভো ইভা, তোমার উপমার আমি তারিফ করি। সত্যই একটা জল-ভরা মেঘ! যেমন স্নিগ্ধ কোমল— সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, তেমনি ভয়ানক ভীষণ—সব লয় করে! আর তারই বুকের শোভা সৌদামিনী! কি চঞ্চল, কি দীপ্তিময়ী! ধ্বংসকারী অথচ কত মনোরম!

অমিয় হাসিল; কহিল, "ভাগ্যে আদালত বন্ধ সুশীল! না হলে এমনি কাব্য-উচ্ছ্বাস নিয়ে যদি রায় লিখতে!"

হাসিয়া সুশীল কহিল, "যেমন কেউ কেউ রায়ও লেখেন আবার নাটকও রচনা করেন।"

উভয় বন্ধু হাসিয়া উঠিল।

ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া কল্পনা কহিল, "বৌদি, তুমিও কি দাদার সঙ্গে শীকার করতে যাবে ?"

ইভা কহিল, "না ভাই! দ্বিপদই আমি শীকার করি! তোমাদের মত চতুষ্পদ শীকার করতে গেলে আমার বুক কাঁপে। অমন করে তোমার মত বন্দুক ধরবার আগেই আমি মূর্চ্ছা যাবো।"

অমিয় কহিল, "কল্পনাও যাবে নাকি ?"

বিদ্রূপের স্বরে কল্পনা কহিল, "তবে কি এখানে থিয়েটার দেখতে এসেছি ?"

অমিয় হাসিল। কহিল, "না, তা আসো নি! আমি ভেবেছিলুম, দাদার কাছে বুঝি নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা ভোগ করতে এলে!"

হাসিয়া ইভা কহিল, "ঠিক বলেছেন! রাণী সেজে বিক্রমকে উর্ব্বশীর হাতে দিয়ে এলেন! মিষ্টার গোস্বামী যদি বলেন, ভাঙা মন জোড়া দেবার জন্য বনৌষধি খুঁজতে এসেছ, তাহলেও দোষ দেওয়া যায় না।"

কল্পনার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল।

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। বন্ধুর পানে চাহিয়া কহিল, "চলো, ওদিককার ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।"

সুশীল কহিল, "চলো, দু'টো হাতীও জোগাড় করা গেছে! এবার আমরা দলে হয়েছি আট জন। দলটি মন্দ হয় নি, কি বলো ?"

কল্পনা ইভাকে অভিবাদন জানাইয়া বন্ধুদ্বয় উঠিয়া গেল।

শীকারের সরঞ্জাম নাড়াচাড়া করিতে করিতে অমিয় সুশীলকে প্রশ্ন করিল, "কল্পনা কখনো বাঘ মেরেছে ?"

সুশীল উত্তর দিল, "না। নীল গাই মেরেছে, হরিণও অনেক মেরেছে! খুব ছোট বেলা থেকে ওর এদিকে ঝোঁক।" বলিয়া বন্ধুকে নীরব দেখিয়া পরক্ষণে কহিল, "তুমি বুঝি আবার মেয়েদের শীকার পছন্দ করো না ?"

অমিয় কহিল, "আমার জন্ম ভাবনা নেই! অনিল ভালোবাসে।"

সুশীল কহিল, "অনিল থাকলে বেশ হ'ত! অনিল যাবে বল্লেই আমি কল্পনাকে আসতে লিখেছিলুম।"

অমিয় কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "তোমার ইভা বেশ।"

সুশীল হাসিল। হাসিভরা মুখে কহিল, "হ্যাঁ, ওর মধ্যে বিত্তের ঝাঁজ নেই! আর মনটা খুব নরম। আমার হাতে পড়ে মেম সেজেছে, না হলে দেশী। আর হবেই বা কি করে? ওর বাবা মা ছিলেন একেবারে সেকেলে। আমার বিলেত যাবার আগেই বিয়ে হয়েছিল। তখন দু'জনেই ছিলুম ছোট। ইস্, ফিরে এসে সে কি গণ্ডগোল! ওর ঠাকুরদা বলেন, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো! আমি বলি, দায়ে পড়েছে—রইলো আপনার নাতনি!" কথাটা বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তার পর কহিল, "কিন্তু তোমাদের তেমন দুর্ভোগে পড়তে হবে না! তোমাদের সংসার বেশ! আমার আনন্দ হয়, হিংসাও হয়!"

অমিয় কোন উত্তর দিল না। অলক্ষ্যে শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। মনে হইল, যেখানে অপরের তৃপ্তি অনুভব করে, সেইখানেই সে বিড়ম্বনা ভোগ করে! কেন এমন হয়? কাহার দোষ? তাহার? না, যে বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার?

অমিয় বন্দুকগুলা খুলিয়া পরাইতে লাগিল।

৩৬

সারা গ্রামে দু'খানি মাত্র প্রতিমা উঠিত। একখানি জমিদার-বাড়ীতে; অপরখানি মধু নন্দী আড়তদারের গৃহে। তথাপি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে মা আসিবেন বলিয়া আনন্দ-উৎসাহের সীমা থাকিত না! সারা বৎসরের প্রতীক্ষিত মাতৃ-আগমন—বাঙ্গলা দেশের পর্ণ-কুটীরে

পর্য্যন্ত উল্লাস জাগে—আনন্দের কল্লোল বহিয়া যায়। যাহারা প্রবাসে থাকিয়া স্নেহ-মুখগুলি স্মরণ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই পূজাবকাশে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহার যেমন সাধ্য তেমনি উপচার দিয়া স্নেহ-ভাজনদের আনন্দ, প্রিয়জন ও গুরুজনদের তুষ্টি সাধন করিতেছে। যাহার ঘরে কিছু নাই, সেও মাগিয়া পাতিয়া এই ক'টা দিনের জন্য গৃহে ভালো-মন্দ কিছু করিতেছে! তাহাদের দুঃখ-মলিন মুখেও আজ একটু আনন্দের আলো ফুটিয়াছে।

রত্না পূজার ছুটিতে দেশে ফিরিয়াছে।

রমেশের ক'দিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত হইয়াছিল। কন্যাকে আনিতে যাইতে পারেন নাই। গোস্বামী সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়া রত্নাকে দেশে পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি বাধিত হইবেন।

চিঠি পড়িয়া অনিল কহিল, "বেশ তো বাবা, আমি রত্নাকে রেখে আসছি। আমাদের মোটরে যাবো, ওদের দেশ-শুদ্ধ লোকের তাক লাগবে'খন।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বেশ, তাই যাও। অমনি আমার মামার বাড়ীটাও ঘুরে এসো। মা আর বড়মামা—ছ'মাসের ব্যবধানে গত হবার পর আমি আর সেখানে যাই নি।"

উৎসাহে অনিল লাফাইয়া উঠিল, এমনি কলকণ্ঠে কহিল, "তাই যাবো। কিন্তু তাঁরা কি আমায় চিন্‌তে পারবেন?"

গোস্বামী সাহেব উত্তর দিলেন, "না চিন্‌তে পারলেও আমার নাম হবে তোমার পরিচয়।"

কথাটা রত্নার কানেও উঠিল। কিন্তু মন তাহাতে আনন্দে ভরিল না। সে দ্বিধায় পড়িল। এই সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে সে তার পিতৃ-গৃহ দেখাইবে কি করিয়া? লজ্জা হয়! তাই ম্লান, ম্রিয়মাণ মুখে সে মৌন রহিল।

অনিল মহা কৌতুকে রত্নার মুখের পানে চাহিয়া ছিল—রত্নার এই কুণ্ঠায় সে আনন্দ বোধ করিল। সহাস্যে কহিল, “বেশ, আমার সঙ্গে না যাও, বাবাকে বলছি। কিন্তু তুমি সারা পথ গাড়ী চালাতে পেতে। নতুন বিদ্যা শিখেছ—কতটুকুই বা! ভুলতে দেরী হবে না।”

গাড়ী চালানোর লোভ রত্নার পক্ষে সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। মাতালের কাছে সুরা যেমন লোভনীয়, সব দ্বিধা সঙ্কোচ ভুলিয়া সে যেমন সুরা-পাত্রের লোভে হাত বাড়ায়, রত্নার মনের অবস্থা তেমনি!

অন্তরের সমস্ত অনিচ্ছা বাতাসে-উবিয়া-যাওয়া কর্পূরের ন্যায় মনের গহনে মিলাইয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছ, দেশের ভাই-বোনদের জন্য কিছু কিনেছ?”

গ্রীবা হেলাইয়া রত্না জানাইল, “না।”

স্নেহ-হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, “অনিলের সঙ্গে বাজারে গিয়ে কিছু খেলনাপত্র কিনো—পূজোর সময় যাচ্ছ!”

বোধ করি, পূজা বলিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় কোনো পুরানো স্মৃতির দোলায় বিচলিত হইতেছিল। তাই তিনি অকস্মাৎ অত্যন্ত সদয় হইয়া রত্নার প্রতি সহসা উদার হইয়া পড়িলেন।

আনন্দে বিভোর রত্না সুদীর্ঘ পথে পাড়ি দিয়া মোটর হাঁকাইল। গ্রামে ঢুকিবামাত্র অনিল কহিল, “রত্না, তুমি ভিতরে এসো এবার আমি গাড়ী হাঁকাই। কারণ, এটা তোমাদের পাড়াগাঁ।”

রত্না বুঝিল, কথাটা সঙ্গত। বিনা-প্রতিবাদে গাড়ী থামাইয়া শীট বদলের জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সহসা অনিল রত্নার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। আবেগের স্বরে ডাকিল, "রত্না!"

রত্নার চোখ-কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া আসিল! খপ্ করিয়া সে অনিলের পাশে বসিয়া পড়িল।

রত্নার হাতখানার উপর মৃদু চাপ দিয়া অনিল কহিল, "কত দিন তোমায় দেখতে পাবো না রত্না! কে জানে, এই আমাদের শেষ দেখা কি না!" অনিলের দৃষ্টি মলিন।

সেই মলিন দৃষ্টির পানে চাহিয়া আবিষ্টের মত রত্না অনিলের কাঁধের উপর মাথা রাখিল।

সেই মুহূর্ত্তে দু'টি পল্লী-বালক অদম্য কৌতূহল লইয়া সহরের হাওয়া-গাড়ীকে অচল দেখিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সেই নিশ্চল গাড়ীখানার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার রূপসুধা পান করিতে গিয়া সজ্জিত দুইটি মনোরম নর-নারীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি রত্নার উপর নিবদ্ধ হইল। এক জন অপরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখ্ ভাই, মেম্সাহেবের মুখখানা ঠিক হেড-মাষ্টার মশায়ের মেয়ের মত।"

ত্রস্তে অনিল ও রত্না নিজেদের সম্বৃত করিল।

অনিল নামিয়া গাড়ীর পিছনের দরজা খুলিয়া দিল; এবং রত্না পিছনের শীটে বসিবামাত্র দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সোফারের আসনে বসিয়া সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

বিস্ময়-ব্যাকুল ছেলে দু'টো কি বলাবলি করিতে লাগিল। সে দিকে কান না দিয়া অনিল গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

গাড়ীর অভ্যন্তরে সুকোমল গদির উপর মাথা রাখিয়া আগুনের তাপ-লাগা বিবর্ণ ফুলের মত ম্লান মুখে চক্ষু মুদিয়া রত্না আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া

রহিল। সমস্ত মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। কানে গিয়াছিল সেই কথা "হেড্‌মাষ্টার মশায়ের মেয়ের মত না?" এই একটি কথা তাহার সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল। অবসাদের মত দুর্নিবার লজ্জা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে ক্ষুব্ধতার মধ্যেও রত্নার মনে জাগিল অমিয়র পিঠের উপর যে-দিন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়াছিল, চিত্ত ব্যথিত হইলেও মন সে-দিন নিমেষের জন্য এতখানি লজ্জা অনুভব করে নাই! নির্জ্জন কক্ষে একা বসিয়া যতই সে ভাবিয়াছে, অমিয়র স্কন্ধে মাথা রাখিয়াছে, তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে—সে মধুর স্পর্শ ততই সারা দেহে পুলক শিহরণ জাগাইয়াছে! কিন্তু আজ নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত অনিলের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া তাহার তপ্ত ঘন শ্বাস নিজের মুখের উপর অনুভব-মাত্র বাহ্য-জ্ঞান-হারার ন্যায় আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিতেছিল! সে মুহূর্ত্তে "হেড্‌মাষ্টার মশায়ের মেয়ে"—এই কথাটুকু সপাৎ করিয়া চাবুকের মত পলকে তাহার সম্বিত ফিরাইয়া দিল! তখন ক্লেদসিক্ত দেহের মত অন্তর-বাহির শুধু গ্লানির অস্বস্তিতে পীড়িত হইতে লাগিল! কেন? কেন?

গাড়ী ছুটিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া অনিল কহিল, "রত্না, তোমাদের পাড়াটা?"

ঝাঁকানি খাইয়া ঘুম-ভাঙ্গার মত রত্না চকিত হইয়া কহিল, "এই পুকুর-পাড়ের পাশ ধরে যাও। ওই শিব-মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটে ছাড়িয়ে তার পর আমাদের বাড়ী।"

রত্নার নির্দ্দেশ-মত গাড়ীর গতি হ্রাস করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রত্নাদের গৃহদ্বারে আসিয়া অনিল থামিল।

হরিশের ছেলেমেয়েরা অঙ্গনে ছুটাছুটি করিয়া চোর চোর খেলিতে-ছিল। ভিতরে রান্নাঘরে বসিয়া অমলা নারিকেল নাড়ুর তাড়া নাড়িতেছিলেন।

দরজার সামনে একখানা ঝক্‌ঝকে বড় গাড়ী দেখিয়া বালকের দল ছুটিয়া আসিল। অনিল তখন গাড়ী হইতে নামিয়া রত্নার দিক্‌কার দরজা খুলিতেছে।

"ও মা, রত্নাদি! ও জ্যাঠাইমা, রত্নাদি এসেছে।"

মহা হট্টগোলে সংবাদটা জ্যাঠাইমার কর্ণ-গোচর করিতে তাঁহারই উদ্দেশে সকলে ছুটিল। এবং অমলা হুম্ করিয়া কড়া নামাইয়া মাথায় কাপড় তুলিতে তুলিতে সদর অন্দরের মধ্যস্থলে আসিয়া থমকিয়া গেলেন।

মোটরের দরজা খুলিয়া কে এক জন সাহেববেশী অপরিচিত লোক মেয়ের হাত ধরিয়া তাকে নামাইল।

"অনিলদা, ভিতরে এসো। বাঃ!" বলিয়া অঙ্গনে পা দিয়া থামের আড়ালে মাকে দেখিয়া রত্না ছুটিয়া সেই দিকে গেল এবং দুই হাতে হত-বাক্ মাকে জড়াইয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে কহিল, "আমি এসেছি মা। অনিলদা এসেছে। বাবা কোথায়?"

চাপা গলায় মা কহিলেন, "হাটে গেছেন সব কিনতে।" বলিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া মেয়েকে কহিলেন, "হ্যাঁ রে, গোস্বামী সাহেবের ছেলে?"

"হ্যাঁ মা!" বলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া রত্না প্রশ্ন করিল, "তুমি সামনে বেরুবে না?"

মা দ্বিধায় পড়িলেন, কহিলেন, "বেরুনো ঠিক হবে?"

জিদের স্বরে রত্না কহিল, "কেন হবে না? মাসিমা তো বাবার সামনে বার হন, কথা কন।"

ব্যস্ত হইয়া অমলা কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ততক্ষণ ওকে বাইরের ঘরে বসা। আমি চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করি।" বলিয়া ত্বরিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রত্না ফিরিল, অনিলের কাছে আসিতেই অনিল কপট অনুযোগের

স্বরে কহিল, "তুমি বেশ রত্না! আমাকে সদরে দাঁড় করিয়ে রেখে চোঁ-চা দৌড়!"

লজ্জা-রাঙা মুখে আমতা আমতা করিয়া রত্না কহিল, "মার সঙ্গে কথা কইছিলুম!"

"মা! মাসিমা বুঝি আমার সামনে বার হবেন না?" অনিল হাসিল।

রত্না অপ্রতিভ হইল। কহিল, "বাঃ, তাই কি বলেছি?" বলিয়া পিতার বসিবার ঘরে অনিলকে লইয়া আসিল।

বাড়ীর মধ্যে এই ঘরখানিই উত্তমরূপে সাজানো থাকিত। ঘরখানি খুব বড় নয়। দু'টি আলমারি আছে বইয়ে ঠাশা, একটি লিখিবার সরঞ্জাম সাজানো টেবল, কাঠের খান-দুই চেয়ার এবং তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চিতে চাদর বিছানো, তার উপর গোটা দুই তাকিয়া। রমেশের বৈঠকখানা। মান্যবর অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে এ-ঘর গৌরবান্বিত হয়। এই ঘরে অনিলকে বসাইয়া রত্নার মাথা যেন লজ্জায় কাটা যাইতেছিল।

অনিল রত্নার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিল। নিজেদের গৃহস্থ সংসারে অনিলকে টানিয়া সে নিজেকে যেন অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিতেছে। এই সঙ্কোচ দূর করিতে সহাস্যে অনিল কহিল, "এক কাপ চায়ের চেষ্টা ছাখো! না, নিজের ঘরে কাঠের পুতুলটি হয়ে থাকবে! আমাকে আবার একবার বাবার মামার বাড়ী ঘুরে আসতে হবে।"

টেবলের উপর হইতে একখানা মাসিক-পত্র অনিলের হাতে দিয়া রত্না বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মুটের মাথায় বাজারের জিনিষ চাপাইয়া নিজের দু'হাতে কতকগুলা সামগ্রী লইয়া রমেশ গৃহে ফিরিলেন। বৈঠকখানা-

ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া সাহেব-বেশি মনুষ্য-মূর্ত্তিকে চেয়ারে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

রমেশের গৃহ-প্রবেশের সাড়া পাইয়া অনিল হাতের বই নামাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল। রমেশের হতভম্ব মূর্ত্তি চোখে পড়িলে মৃদু হাস্যে সে কহিল, "আমি! আমি অনিল। ভালো আছেন রমেশবাবু?"

রমেশ যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ্যাঁ, তুমি—অনিল! তুমি এসেছ এই গরীবের কুঁড়েয়! ওরে, কে আছিস্? ও, তুমি বুঝি রত্নাকে নিয়ে এলে! আমার এই সর্দ্দির জ্বর! ভয়ানক দুর্ব্বল করেছে কি না—তবে বুঝছ কি না, আজ হাট-বার।" বলিতে বলিতে হাতের জিনিষগুলা সেইখানে নামাইয়া মুটেকে ভিতর-বাড়ীর পথ দেখাইয়া উড়ানীতে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কতক্ষণ এসেছ বাবা? একা বসে!"

আনন্দের আতিশয্যে কোন কথাই রমেশ গুছাইয়া শেষ করিতে পারিতেছিলেন না। কথাগুলা শুধু মনের মধ্যে ভীড় করিয়া তালগোল পাকাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মত ঠেলাঠেলি করিতেছিল এবং চাপা-চাপি করিয়া যে যেটুকু পারে বাহির হইতেছিল।

অনিল কহিল, "বেশীক্ষণ আমি আসি নি। রত্না চা আনতে গেছে।"

রমেশ ব্যস্ত স্বরে কহিলেন, "তা হোক! তুমি একা এমন চুপ করে বসে আছো। একটু যদি আক্কেল—"

কথা শেষ হইল না। রত্না এক হাতে চা অন্য হাতে জলখাবারের রেকাবী লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অনিল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাহার হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া কহিল, "অমন করে দু'হাতে দু'টো জিনিষ আনে! গরম চা!"

এ অনুযোগে রত্নার মুখ আরক্ত হইল। অনিল যে তাহার মুখের ঘর্ম্মবিন্দু লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা সে বুঝিল। বুঝিলেন না কেবল রমেশ। কোন কিছু না বুঝিয়া সায় দিয়া তিনি কহিলেন, "ঠিক বলেছো! ওর কি এ সব অভ্যাস আছে! তোমার মা তো এ সব পারতো। সে কি কাছারীতে বসে আছে যে তুমি অনিলকে একা ফেলে—"

রত্না লজ্জিত হইল। পিতার আল্গা মুখে কথার কোন হিসাব থাকে না; হয় তো আরও কত কি অনর্গল বকিয়া যাইবেন, তাই বাধা দিতে সে কহিল, না আমিই ছিলুম, কেবল খাবারটা আন্‌তে গিয়েছিলুম। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা—তোমাকেও চা দেবো।"

রমেশ কিন্তু সে-ধার দিয়াও গেলেন না। কহিলেন, "অতিথি নারায়ণ জানো, তাকে কি রকম করে সেবা করতে হয় তুষ্ট করতে হয়!"

"হ্যাঁ বাবা, জানি। সে আমি জানি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে এসো। মা কচুরি ভেজে আনচে। অনিলদা তুমি আরম্ভ করো।"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! নাও বাবা, তুমি ওটুকু খেয়ে ফেলো। আমি আসছি। কাল অবশ্য ডাক্তার দু' আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল—" বলিয়া তিনি ত্বরিতে বাহির হইয়া গেলেন।

অনিল কহিল, "কি করেছো রত্না! এই এক থালা লুচি-তরকারী খাবে কে?"

হাসিয়া রত্না কহিল, "কেন, তুমি! আমি ওই জন্যেই ভয় পেয়েছিলুম অনিলদা, তুমি কি এ সব খেতে পারবে?"

"ইস্ তাই নাকি? এগুলো কি অখাদ্য? না, বাড়ীতে আমরা এ সব খাই না?" বলিয়া অনিল খাবারের থালাখানা টানিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে রমেশ আসিলেন। কহিলেন, "এই যে বাবা খাচ্ছো! হ্যাঁ, এমন দিনে গাছে চড়ে সত্যকে নারকোল পেড়ে খাইয়েছি! সে

কি আনন্দ! গরম মুড়ি আর নারকোল—আমাদের বকুলতলার রোয়াকে আড্ডা! তোমাদের ক্লাবের মত আর কি! আজ সে সুরেন অধিকারীও মরেছে, দেশের আনন্দও গেছে!"

রহস্য-ভরে অনিল কহিল, "দেশের যায় নি! আপনাদের গেছে!" বলিয়া ভোজ্যগুলি নিঃশেষ করিতে সে মনোযোগী হইল।

৩৭

জমিদার-বাড়ী যাইতে অনিল রমেশের নিকট বিদায় চাহিল। রমেশ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "তুমি গিয়ে একখানা চিঠি দিয়ো বাবা।"

হাসিয়া অনিল কহিল, "দেবো।"

অনিল চলিয়া গেলে অমলা জানালার পাশ হইতে সরিয়া আসিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীকে কহিলেন, "দিব্বি ছেলে! যেন রাজ-পুত্তুর!" বলিয়া মেয়েকে কহিলেন, "হ্যাঁ রে রত্না, বিয়ে-থা হয়েছে?"

রত্নার মুখ সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "না।"

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর রত্না তাহার তোরঙ্গ খুলিল। ভাই-বোনদের জন্য সে উপহার আনিয়াছিল, সব বাহির করিতে বসিল।

অমলা দেবরের পুত্র-কন্যাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুত্র-কন্যাদের পশ্চাতে তাহাদের পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বপ্রথম বাহির হইল পারুলের খোকা। সেলুলয়েডের পুতুল। দেখিয়া সকলে হাসিয়া খুন। অমলা কহিলেন, "ওমা রত্না, এ যে তোর কাকিমার বাঘার মত রে!"

বাঘা হরিশের কনিষ্ঠ পুত্র! ছ'মাসের শিশু।

মণির জন্য পকেট-ক্যামেরা বাহির হইল। মণি লাফাইয়া উঠিল—"ইস্ রত্নাদি, ভাগ্যিস তুমি কলকাতা গেছলে ভাই!" কিন্তু তাহার চেয়ে লোভনীয় বাহির হইল, টুনুর উড়ো জাহাজ। সেটা দেখিয়া সকলে অবাক্। আনন্দিত হইল। দম দিলে ভূমি ছাড়িয়া শূন্যে উঠে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া দম ফুরাইয়া গেলে আবার মাটীতে নামে। সকলের তাক লাগিয়া গেল।

প্রফুল্ল মুখে হরিশ কহিলেন, "এটায় ক'টাকা পড়লো?"

পুলকিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "দশ টাকা!"

বিস্ময়ে হাঁ করিয়া হরিশ খানিকক্ষণ ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর টানিয়া টানিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দ-শ টাকা! এঁ্যা, একটা খেলনার জন্য!"

রত্নার খুব মজা লাগিতেছিল। সে কহিল, "এগুলোর দাম আরো বেশী কাকামণি! মণির ক্যামেরাটা পড়েছে পঁচিশ টাকা।"

"এঁ্যা, বলিস্ কি রত্না! এমন করে টাকাগুলো ছিনিমিনি করে খরচ করেছিস্? খেলনা পুতুল কিনে! বেটী আমার দিল-দার মেজাজী!" বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

সগর্ব্বে রত্না কহিল, "এতেই তোমাদের তাক লাগছে কাকামণি—সব অবাক হচ্ছো, কিন্তু খেলনার দোকানে গেলে সত্যি অবাক্ হতে। কি ভীড়! সাহেব-মেমেরা সব মটরে করে আসচে—কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ টাকা দামের খেলনা কিনছে সব। এতো আমাদের মত নয় যে, দু'পয়সার মাটীর পুতুল দিলেই ঢের হলো!"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিশ কহিলেন, "তা বটে! তা বটে! পয়সার মায়া ওরা জানে না। মানে, দুঃখও তো ওদের পোয়াতে হয় না।"

প্রতিবাদ তুলিয়া রমেশ কহিলেন, "না হে তা নয়! ছেলেমেয়েকে

ভালোবাসতে মানুষ করতে ওরাই জানে। ওরাই বোঝে তাদের কি রকম করে রাখতে হয়। শুধু আমাদের মত সোনার গোপাল, ননী খা —বল্লে হয় না! আমরা ছেলের হাতে চুষি-কাঠি দিয়ে খালাস! ওই চুষিতেই জন্ম গেল। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত বাড়বে, সভ্যতার বিকাশ বিজ্ঞানের উন্নতি হবে তত বেশী। হ্যাঁ রে রত্না, ওই যে সেবারে কি খেলনা এনেছিলি?"

হাসিয়া রত্না কহিল, "বিল্ডিং ব্লক্স্।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! বালকের বুদ্ধির বিকাশ করাতে কি সুন্দর খেলনা, বলো দিকি!"

হরিশ কহিলেন, "তা বটে! মানুষ যত দেখবে, তত শিখবে তো।"

রত্না কহিল, "কাকামণি হরিমতীর জন্য কিছু আনি নি। তাকে একখানা শাড়ী দেবো।"

হাসি-মুখে হরিশ কহিলেন, "সে তুমি তোমার ভাই-বোনদের জন্য যেমন যা বুঝবে মা!"

রাত্রে কন্যাকে একা পাইয়া অমলা কহিলেন, "হাঁ রে খুকী, তোকে যে টাকা পাঠাতেন মাসে মাসে, সব খরচ হতো?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেয়ে কহিল, "বলো কি মা? বলে, মাসের শেষে একটা পাই-পয়সা হাতে থাকতো না।"

আশ্চর্য্য স্বরে মা কহিলেন, "তবে?"

রত্না হাসিল। কহিল, "এ সব খেলনা মিষ্টার গোস্বামী কিনে দিলেন। বল্লেন, বাড়ী যাচ্ছো, নিয়ে যাও। তাঁর সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছিলুম কি না।"

পিতা শুইয়া তামাক টানিতে ছিলেন। কহিলেন, "সত্য নিয়ে গেছলো বুঝি?"

"না! তাঁর ছোট ছেলে। মাসিমা বল্‌লেন কি না, পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছ, কিছু নিয়ে যেতে হয়। ওদেরও সব মুশৌরী যাবার বাজার হচ্ছে।"

"কাকে মাসিমা বলিস্? সত্যর স্ত্রীকে তো?"

"হাঁ, মিসেস্ গোস্বামীকে তিনি তাই বলতে বলে দিয়েছেন।"

চোখে মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ মাখাইয়া রমেশ কহিলেন, "আমার কথাটা খুব রেখেছে, না! রে? ওরা সবাই তোকে খুব ভালোবাসে! আচ্ছা, বড় ছেলে হাকিম, সে কেমন?"

রত্নার মুখ ঈষৎ রক্তিম হইল! সে কহিল, "সবাই ভালো। এই তো অনিলদা বল্‌লে, আমাদের সঙ্গে মুশৌরী যাবে রত্না?"

অমলা প্রশ্ন করিলেন, "তুই তাতে কি বললি?"

মেয়ে কহিল, "আমি আর কি বলবো? মেসোমশাই বল্‌লেন, "সে হয় না! পূজোর সময় মা-বাপের কাছে থাকবে রত্না, ওর মা পথ চেয়ে আছেন!"

সায় দিয়া অমলা কহিলেন, "তা সত্যি! আমি বলে, ধড়-ফড করে মরছি এখানে!"

উষ্ণ-স্বরে রমেশ কহিলেন, "রাখো তোমার ধড়-ফড়ানি! কত দেশ দেখতো। ওদের সঙ্গে থাকলে সাহেবদের মত থাকতো! কত আদব-কায়দা শিখতো!

স্বামীর কথায় বিরক্ত হইয়া অমলা কহিলেন, "শিখে কি হবে? ও তো আর সত্যিকারের মেম-সাহেব হবে না, এই গেরস্ত-ঘরই তো করতে হবে ওকে।"

শ্লেষ-ভরে রমেশ প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাই নাকি? সেই জন্যেই মেয়েকে আমি এত করে মানুষ করছি! ঘটে বুদ্ধি থাকলে এমন পাড়াগাঁয়ে থাকতে না।"

"কি করতুম ? সহরে গিয়ে বায়স্কোপ ?"

"ঢের, ঢের ভালো ! সিনেমায় যারা নামে, তাদের কত নাম, জানো ? ফিল্ম-ষ্টার বললে লোকে চম্‌কে ওঠে। হুঁঃ! এ জন্মটাই বৃথা গেল।"

স্বামীর দুরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ আপশোষ এবং মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া অমলার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিক্ততার পাত্র এখন উপ্‌চাইয়া পড়িল! রাগে মুখ ঘুরাইয়া অমলা কহিল, "কি করবে, বলো ? কপাল! মনের খেদ আর-জন্মে মিটিয়ো! মেয়েকে হাজার চোখের সামনে নাচিয়েছ, তাতেও সাধ মেটে নি ?"

খড়ের গাদায় আগুন লাগিল! তিক্ত স্বরে রমেশ কহিল, "বেশ করেছি—যারা হিংসেয় জ্বলে মরে, যাদের মেয়েরা পেত্নী জুজুবুড়ী, তারা অমন মিথ্যে করে বলে বেড়ায়! জানো, চার দিকে রত্না বোস, রত্না বোস নাম। এ কম কথা ! এই যে সত্য আমায় অত করে নেমন্তন্ন করেছিল—সে এই রত্নার জন্যই তো! আমি গেলুম না, তাই !"

মুখ তুলিয়া রত্না কহিল, "ত্মাখো বাবা, তুমি যদি ওদের নেমন্তন্নে যাও, স্যুট পরে যেয়ো। থিয়েটারের দিন দেখলুম সবাই স্যুট পরে এসেছিল।"

মৃদু হাস্য করিয়া পিতা কহিলেন, "আমি যদি যেতুম হরিশকে দিয়ে চাঁদনীর বাজার থেকে কোট-প্যাণ্ট সব কিনে তাই পরেই যেতুম-রে।"

ব্যস্ত হইয়া রত্না কহিল, "না, না, তা করো না বাবা, তাহলে সবাই ওখানে হাসবে! মনে মনে আমোদ পাবে। তুমি কিন্তু কিছু টেরও পাবে না! ওরা তোমায় সং ভাববে! তুমি আমায় টাকা দিয়ো, আমি র‍্যাংকেনের বাড়ী থেকে তোমায় পোষাক তৈরী করিয়ে দেবো! তারা খুব ভালো টেলর। গোস্বামী সাহেবের সব ওইখান থেকে তৈরী হয়ে আসে।"

মা কহিলেন, "তুই কি পরেছিলি ?"

"আমি ?" বলিয়া রত্না হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আমায় একখানা

একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন মাসিমা। আর আমার এই চুড়ি-হারে চললো না। সব খুলে ফেলতে হলো। মাসিমা তাঁর মুক্তোর ব্রেসলেট আর মুক্তোর কণ্ঠি আমায় পরতে দিলেন। দু'-আঙুলে দু'টো হীরে পান্নার আংটী দিলেন। এমন চমৎকার আমায় দেখাচ্ছিল, তুমি দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে! যত মেয়ে এসেছিল, সকলের চেয়ে আমাকেই স্থন্দর দেখাচ্ছিল! অমিয়দা বললে, কি আশ্চর্য্য, যারা গয়না পরবার জন্য দুনিয়ায় এসেছে, অভাব তাদেরই! আমায় বললে, তোমায় দেখে মডেল করতে ইচ্ছে হচ্ছে রত্না।"

অমলা এ সকল কথার কোন উত্তর দিলেন না।

স্নেহাপ্লুত দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, "অমিয় কিছু মিছে বলে নি! আমার পয়সাই নেই। কিন্তু মেয়ে আমার লক্ষ্মী প্রতিমা! সত্য কি অমনি অমনি মেয়ের মত ওকে ভালোবাসে, কি বলো?" বলিয়া যাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি হাস্য করিলেন, তিনি তখন অনাসক্ত স্বরে রত্নাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "রাত হয়েছে রে খুকী, শুয়ে পড়্।"

৩৮

ঘুমাইয়া রত্না স্বপ্ন দেখিতেছিল, মুশৌরীর পাহাড়! সে যেন মুশৌরী গিয়াছে! প্রকৃতির কি বিচিত্র শোভা চারি দিকে! সজ্জিত একটি বাড়ীর স্থরম্য শয়ন-কক্ষে স্প্রিংয়ের খাটে কোমল শয্যায় শুইয়া আছে! বয়-খানসামা, আয়া প্রভৃতি ঘুরিতেছে! নিমীলিত চোখের সামনে ইন্দ্রজালের মত যেন ভাসিয়া উঠিতেছে, গাড়ীর কামরা—প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সে। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই প্লাটফরমের সকলের উৎস্থক নয়নের কৌতূহলভরা দৃষ্টি তাহাদের কামরায় নিবদ্ধ হইতেছে। কেল্‌নারের

খানসামা ছুটিয়া আসিতেছে কি কি চাই, জানিবার জন্য। অনিল হাস্য-পরিহাস করিতেছে! মিসেস্ গোস্বামী উপদেশ দিতেছেন এবং গোস্বামী সাহেব এক কোণে বসিয়া পাইপ মুখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ডুবিয়া আছেন।

ঘুমের ঘোরে রত্না দেখিতেছিল, অনিল তাহাকে লইয়া পাহাড়-পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! হঠাৎ এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল টুনুর ডাকে!

টুনু ডাকিতেছিল, "ও রত্নাদি, ওঠো, জ্যাঠাইমা যে ডাকছে। ঠাকুর দেখতে যাবে না?"

ঘুমের মধ্যেও যে-হাতখানা ধরিয়া অনিল রত্নার সহিত কথা কহিতেছিল, টুনুর ধাক্কায় চোখ চাহিয়া রত্না দেখিল, সেই হাতখানাই টানিয়া টুনু অত্যাচার স্বরু করিয়াছে।

বিরক্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, "তুই বড় জ্বালাতন করিস্ টুনু!" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

টুনু অবাক হইয়া গেল! কহিল, "ও কি, আবার ফিরে শুলে কি রত্নাদি! ঠাকুর দেখতে যাবে কখন? ওই শোনো, পূজো-বাড়ীর বাজনা বাজছে।"

"হ্যাঁ, দু'টো খ্যানখেঁনে কাঁসি আর ঢ্যাপ্‌ঢেপে ঢোলের আওয়াজ শুনতে আমাকে এই সকালে উঠতে হবে! তুই যা!"

অমলা কি কাজে দ্বারের কাছে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে তখনও পাশ-বালিশ জড়াইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "বাপ রে বাপ, এখনও ঘুম! এ যে বাদশাহী ঘুম রে!"

মায়ের কথায় রত্নার রাগ হইল। কোন কথা না বলিয়া বিছানা ছাড়িয়া তক্তাপোষ হইতে নামিয়া পড়িল! দড়ির আন্‌লা হইতে গামছাখানা টানিয়া কাঁধে লইয়া বারান্দায় আসিল।

ভাঁড়ার-ঘর হইতে মা কহিলেন, "পুকুরে যেয়ো না, গোপাল জল তুলে রেখে গেছে, ঐখানে হাত-মুখ ধোও।"

"না, দরকার নেই! আমি ঘাট থেকে একেবারে স্নান করে আসবো। তুমি তেল দাও।"

মেয়ের অসন্তোষের কারণ মা বুঝিলেন, কোন সাড়া না দিয়া তেলের বাটিটা শুধু মেয়ের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সিক্ত বসনে আর্দ্র চুলের খোঁপাটা কুণ্ডলী করিয়া ঘাড়ের উপর জড়াইয়া রত্না যখন গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া পা দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে ভেজানো সদর খুলিয়া অনিল আসিয়া উঠানে প্রবেশ করিল; এবং রত্নাকে সে-বেশে দেখিয়া ত্রস্তপদে যে-পথ দিয়া ঢুকিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রত্নাও ছুটিয়া মায়ের ঘরে ঢুকিয়া সেখান হইতে চেঁচাইয়া কহিল, "বাবাকে বলো মা, অনিলদা বাবাকে ডাকচে।"

"এ্যাঁ!" বলিয়া হুঁকা-হাতে রমেশ বহির্বাটীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। একটা দরমার বেড়ায় এ-বাড়ীর সদর-অন্দরের ব্যবধান। গ্রামের মেয়েরা কোন দিনই নিজেদের অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবেন না বলিয়া সিক্ত বসনে ঘাটের পথে যাইতে তাঁহাদের লজ্জা নাই এবং তাহা দৃষ্টি-কটু ঠেকে না। কিন্তু সহরে-বর্দ্ধিত যে সভ্য মানুষটি গ্রাম্য রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আনাড়ী, এটুকু তাহার চোখে চরম নির্লজ্জতার মত দৃষ্টি-কটু লাগে।

পথে নিম-গাছের নীচে দাঁড়াইয়া অনিল ভাবিতেছিল, এমন করিয়া হয় তো ইহাদের গৃহে ঢোকা উচিত হয় নাই। পাঁচজনে তাহার সম্বন্ধে বিশ্রী ধারণা করিয়া বসিবে। এমনি একটা লজ্জার মেঘ তাহার মনের আকাশকে কালো করিয়া দিল এবং সেই মেঘের গায়ে আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ক্ষণে ক্ষণে রত্নার সিক্ত বসন ভেদ করিয়া তনুর যে

লাবণ্যচ্ছটা বিকশিত হইতেছিল, সেই লাবণ্য তাহার মনকে উচ্চকিত করিয়া তুলিল।

অনিলকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অন্বেষণে রমেশ সদর হইতে গলাটা রাস্তার দিকে বাহির করিতেই দেখিল, সাহেব-বেশী বন্ধু-পুত্র নিম-গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঘন ঘন সিগারেটের ধূমে স্থানটাকে ভরপূর করিয়া তুলিয়াছে।

রমেশ আপনার অভ্যাস অনুযায়ী সম্ভাষণে ডাক দিলেন, "এই যে বাবাজী! এসো এসো, অমন পরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি বাবা-ঘরের ছেলে।"

শিষ্টাচারের প্রতীক হইয়া অনিল হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটীতে ফেলিয়া জুতা দিয়া চাপিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, আপনি বাড়ীতে ছিলেন কি না জানি না তো।" বলিয়া অগ্রসর হইল।

"না বাবা, সকালে এমন সময়ে বাড়ী থেকে বেরুই না।" বলিয়া অনিলকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাক দিয়া কহিলেন, "ওরে রত্না, তোর অনিলদার জন্যে চা নিয়ে আয়!" বলিয়া অনিলের পানে ফিরিয়া তিনি কহিলেন, "আমি মনে করেছিলুম, তুমি কালই ফিরে গেছ। আছো জানলে আজ তোমায় খাবার নিমন্ত্রণ করতুম বাবা।"

অনিল হাসিল। কহিল, "না, ওঁরা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বাবার মাসিমা বড্ড পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আজও ছাড়তে চাইছিলেন না। বলছিলেন, খাওয়া-দাওয়া করে যেয়ো। কিন্তু আমার আর থাকবার জো নেই।"

"ওঃ, বড় গিন্নিমা! তিনি চমৎকার মানুষ! আমরা তাঁকে তো এ গাঁয়ের অন্নপূর্ণা জানি। জ্যোতি কাকাও সদাশিব ছিলেন। তবু

তো বাবার মামার বাড়ীটা দেখা হলো। সে রাম না থাকলেও সেই অযোধ্যা তো! কি বলো বাবাজী?"

"ঠিক!" বলিয়া অনিল কহিল, "আবার যদি কখনো আসা হয় তো আপনাদের বকুলতলাটা বাঁধিয়ে দিয়ে যাবো।"

রমেশ আহ্লাদে কহিলেন, "বেশ! বেশ! পুরীতে যেমন সিদ্ধ-বকুল! এ তোমার মত যোগ্য ছেলেরই কথা বাবা।"

রত্না চা লইয়া আসিল। তার পরনে সাদাসিধা একখানা ডুরে শাড়ী। নিবিড় ঘন-কুন্তলদাম এলোমেলো হইয়া কপালে পিঠে হাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে চিরুণী পড়ে নাই! দুই ভ্রূর মধ্যে লাল একটি টিপ অর্কের মত শোভা পাইতেছে।

এই প্রসাধনবর্জ্জিত সরল মূর্ত্তি অনিলের চোখে বড ভালো লাগিল। সৌন্দর্য্যকে শত রকমে বিকশিত করিয়া তুলিবার আয়াসহীনতায় তনুর লাবণ্য তাহার চোখে সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখার মত মধুর বোধ হইল।

আত্মবিস্মৃতের ন্যায় অনিল ক্ষণকাল রত্নার সেই রূপ-মাধুরীর পানে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল; মুখে কথা সরিল না! কাছে রমেশ বসিয়া আছেন, তাহাও যেন মনে রহিল না! এবং মনের এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সৌন্দর্য্যের চরণে অকপট স্তুতির মত হয় তো কোন কথা বাহির হইয়া পড়িত।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে রত্না চা ও জলখাবারের রেকাব টেবলের উপর রাখিয়া কহিল, "কাল তোমার যাওয়া হয় নি অনিলদা?"

অনিলের হুঁস্ হইল, এ সহর বা তাহাদের সমাজ নয়। এমন ভাবে দেখায় সেখানে কেহ মাথা ঘামাইবে না। কিন্তু গ্রামের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার লোকজন এবং সভ্যতা-বোধ অন্য রকম! এখানে আর্দ্র বসনে মেয়েরা পথে হাঁটিয়া গেলে অশোভন হয় না; কিন্তু

কাহারো বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিমেষের জন্য তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকিলে হয় তো ইহাতে বিষম দোষ হয়। তাই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ওরা ছেড়ে দিলে না! এখন যাচ্ছি। তাই একবার দেখা করতে এলুম!" জবাব-দিহির মত কণ্ঠ।

ত্বরিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "এ তো আমাদের সৌভাগ্য বাবা! তোমার পায়ের ধূলো আমার বাড়ীতে পড়লো!"

অনিল হাসিল। কহিল, "না, না, কি বলচেন! তবে আপনারা এই সকালে আসার দরুণ অত্যাচার ভাবলেন।"

বিস্মিত রমেশ বিমূঢ় স্বরে কহিলেন, অত্যাচার!"

সহাস্যে অনিল কহিল, "নয়? সকালে এতগুলো দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও বাস্তবিক আমি 'দামোদর' নই। আবার কিছু না খেলে আপনারা ক্ষুণ্ণ হবেন! হয় তো আমার উপর রাগ করে বসবেন।" বলিয়া সে বক্র কটাক্ষে রত্নার পানে চাহিয়া দেখিল। অবনমিত মুখে মৃন্ময় প্রতিমার মত রত্না দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশ কহিল, "না, না, এ তো যৎসামান্য!"

দ্বিরুক্তি না করিয়া অনিল আহার্য্যগুলার সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং এ কাজ শেষ করিয়া রমেশকে অভিবাদন জানাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রত্নার দিকে চাহিয়া কহিল, "আসি রত্না।"

কোন উত্তর না দিয়া রত্না নিঃশব্দে এক দিকে মাথা হেলাইল।

উঠানে পা দিয়া অনিল কহিল, "মুশৌরী গিয়ে তোমাকে চিঠি দেবো।"

অনিলের পিছনে রত্না ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল, সে নীরব রহিল; সাড়া দিল না।

অনিলকে মোটরে তুলিয়া দিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া অমলার কাছে গিয়া বড়-গলায় কহিলেন, "দেখলে বড়বৌ, কেমন খাশা ছেলে! বড়-

মানুষির এতটুকু অহঙ্কার নেই! কেমন বিনয়-নম্র! ওদের তো চুরুট খাওয়া লজ্জার নয়! তবু আমায় দেখে কি রকম করে ফেলে দিলে! একেই বলে ভদ্র! যাদের বাড়ী যেমন, তেমনি ওরা চলতে জানে। সভ্য তো একেই বলে! বুঝলে?"

বড়বধূ এ সকল কি, কতটুকু বুঝিলেন, বলা দুরূহ! তিনি শুধু বলিলেন, "রত্না কোথা গেলি রে?"

আঙুলে অলকগুচ্ছ জড়াইতে জড়াইতে রত্না অন্যমনস্কের মত কি ভাবিতেছিল! হরিমতি আসিয়া তাহার পিঠে একটা ঠেলা দিয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা ডাকচে যে!" বলিয়া হাসিয়া কহিল, "বাবা, ওই সাহেব-সাজা মানুষটা তোমায় যেন দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল ভাই! কিন্তু খুব চমৎকার দেখতে, না রত্নাদি?"

কোন উত্তর না দিয়া রত্না মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

৩৯

বাড়ীতে পা দিয়া হরিমতী কহিল, "রত্নাদির সেই সাহেব-সাজা লোককে দেখে এলুম মা।"

মণি তাহার সদ্য-পাওয়া নূতন ক্যামেরা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। কহিল, "কাকে রে? মিষ্টার গোস্বামীকে তো?"

প্রতিভা তরকারী কুটিতেছিলেন, কহিলেন, "তুই দেখলি কোথা থেকে?"

"কেন, আজ যে জ্যাঠামশায়ের বাড়ী এসেছিল! রত্নাদি তাকে চা দিলে।"

মা কহিল, "কেমন দেখতে?"

মণি তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "খুব সুন্দর! একেবারে সাহেবদের মতো দেখতে।"

হরিমতী অবজ্ঞা-সূচক কণ্ঠে কহিল, "সাহেবদের মত না হাতী।

রঙটাই খালি ফর্শা। বাবা, রত্নাদির দিকে এমন করে চেয়ে ছিল, যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে।”

মণির হাতে তখন রত্নার প্রদত্ত ক্যামেরা। মন তাহার খুশীতে ভরা! সতেজে ভগিনীর কথায় প্রতিবাদ তুলিয়া সে কহিল, “না মা, দিদির সব মিথ্যে কথা! সব অমনি বাড়িয়ে বলে। চোখ তার খুব ভালো। রং একেবারে সাহেবদের মত।”

হরিমতী তখনও কোন উপহার-দ্রব্য পায় নাই! মন প্রসন্ন নয়। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে কহিল, “তোর যত খোসামুদে কথা। হ্যাঁ মা, ক্যাঁট ক্যাঁট করে চেয়ে ছিল—আমি নিজে দেখেছি।”

মণি রুখিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দেখেছিস্! বল দিকি গাড়ীখানা কি রকম? মোটর যখন খালের ওপারে দাঁড়ালো, আমি আর ভোলা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে।”

হরিমতী কহিল, “তবেই দেখতে পেলি না কি?” তাহার স্বরে এক রাশ অবজ্ঞা।

মণি তৃপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “না! পেলুম না! তোর মত কপাটের আড়ালে আমরা অমন দেখি না! দস্তুরমত বুক ফুলিয়ে গিয়ে সাম্‌নে দাঁড়ালুম—রত্নাদি তখন গোস্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বসে রয়েছে!”

চমকিত কণ্ঠে প্রতিভা কহিলেন, “কি হয়েছিল?”

মণি কহিল, “ওই যে গাড়ীটা যখন খালের ওখানে দাঁড়ালো, আমরা পদ্মপুকুরে যাচ্ছিলুম, গাড়ীটাকে দেখতে দাঁড়ালুম। গোস্বামী তখন রত্নাদিকে কি বলছিল। রত্নাদি তার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে বসে ছিল—বিশ্বাস না হয় ভোলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো।”

প্রতিভা নির্ব্বাক্।

ছেলে ভাবিল, মেয়ের কথাই মা বিশ্বাস করিতেছেন ; মণির কথায় প্রত্যয় হইতেছে না, তাই সত্য প্রমাণ করিতে সে কহিল, "আচ্ছা, আমি ভোলাকে ডেকে আনচি—সে বললে, হেড্ মাষ্টার মশায়ের মেয়ের মত মুখ! তখন সাহেব দরজা খুলে দিলে আর রত্নাদি নেমে গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলো! আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।"

প্রতিভা কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা চুপ করো।" বলিয়া তিনি গৃহান্তরে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে উঠানের বেড়ার দরজা ঠেলিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া রত্না ডাক দিল, "কাকিমা কোথা গো?"

মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিভা কহিলেন, "এই যে মা, আয়!"

রত্না আসিয়া প্রতিভাকে প্রণাম করিল। কহিল, "সকলকে সব দিয়েছি, হরিমতীকে কিছু দিই নি। ও ভাবছে,দিদি আমায় ফাঁকি দিলে।"

সলজ্জ চোখে হরিমতী কহিল, "বাঃ, তাই বুঝি?"

কাকিমা হাসিলেন। কহিলেন, "তা বাছা, তুমি বড় বোন! বোনের মত বোন!"

রত্নার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। রত্না কহিল, "এই ছাখ হরিমতী, তোর জন্য কি এনেছি।" বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা শাড়ী বাহির করিল।

পলকে হরিমতীর আঁধার-মুখে শরতের সোনালী আলোর ঝলক আসিয়া পড়িল। শাড়ীখানার উপর মুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল, "এখানা কি শাড়ী রত্নাদি? ভারী চমৎকার তো এই শাড়ীগুলো।"

হাসিয়া রত্না কহিল, "পেন্টিং সিল্কের শাড়ী! রংটা বেশ হাল্কা আসমানী, তাই তোর জন্যে তুলে রেখেছিলুম।"

"এ্যাঁ, এ কাপড় তুমি আমায় দেবে?" বিস্ফারিত নেত্রে হরিমতী চাহিয়া রহিল।

মণি, টুনু, পারুল সবাই কাপড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; মুগ্ধ নয়নে রঙিন পাখীগুলো নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

প্রতিভা কহিল, "অনেক টাকা দাম পড়ল বোধ হয়?"

রত্না কহিল, "কিনি নি কাকিমা। গোস্বামী সাহেবদের বাড়ীতে বিকেলে সব এমনি শাড়ী পরে। মাসিমা আমাকে তাই ক'খানা পাঁচ রকমের শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। এখানা আমি একদম তুলে রেখেছিলুম, বাড়ী এসে হরিমতীকে দেবো বলে। আজ পরিস্, বুঝেছিস্ হরিমতী।"

প্রতিভা কহিলেন, "এত দামী শাড়ী পূজোর সময় পরে পুরানো করতে হবে না, তুলে রাখি, বিয়ের সময় দেবো। পূজোর কাপড় তো কেনা হয়ে গেছে।"

হাসিয়া রত্না কহিল, "না কাকিমা, অমন করে রেখো না, পরতে দিয়ো! বিয়ের সময় ওকে আমি এর চেয়ে ভালো শাড়ী দেবো।"

দুপুরবেলায় সকলে সাজিযা-গুজিয়া দল বাঁধিয়া নন্দী-বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে গেল। জমিদারের বাড়ী একটু দূরে, বিশেষতঃ সে ধনীর গৃহ। গৃহস্থ-ঘরের বধূরা সব সময়ে যাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। নন্দী-গৃহিণী নিজে আসিয়া বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া যান। পূজার ক'দিন প্রসাদ পাইবার জন্য সকলকে বিশেষ অনুরোধ করেন। না গেলে খোঁজ করেন, ক্ষুণ্ণ হন।

পথে চলিতে চলিতে প্রতিভা ও অমলা দুই জায়ে সেই কথাই হইতেছিল—মধুর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে! আহা, বৌটি মরে গেল! একটা ছেলে অবধি নেই। ঘর-দোর খাঁ খাঁ করছে।

প্রতিভা কহিলেন, "কোন্ মেয়ের ভাগ্য খুললো ভাখো! মধুর ঘরে মা লক্ষ্মী এখন উথলে উঠেছেন।"

অমলা সায় দিলেন, "তা ঠিক। নন্দী-গিন্নীও ভারী অমায়িক, বউটিকে বড্ড ভালো বাসতো!"

এমনি পাঁচ কথার আলোচনা করিতে করিতে সকলে পূজা-বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পদার্পণের সঙ্গে রত্নাকে লইয়া পূজাবাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যেন মহামায়া সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। এমনি বিস্ময়ে আনন্দে সকলে রত্নাকে ঘিরিয়া ধরিল। নন্দী-গৃহিণী নিজে আসিয়া রত্নার হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া পিঠ চাপ্ড়াইলেন। আদর করিলেন। শেষে কহিলেন, "এক দিন তোর গান শুন্‌তে যাব। শুনছি, বাপের গুণ ষোল-আনা পেয়েছিস্! মধুকে তাই বলি, রমেশ কি সুন্দর যাত্রা করতো! মেয়েমানুষের মত কি মিষ্টি গলা—কীর্ত্তন গাইত চমৎকার ঐ সুরেন অধিকারীর দলে। বোসজা কত রাগ করেছেন, মার-ধোর অবধি করেছেন ছাড়াতে পারেন নি! শেষে কলকাতায় পড়তে গিয়ে, সুরেন অধিকারী মরে গেল। দল ভেঙ্গে গেল; যাত্রার নেশাও ছাড়লে।"

পূজাবাড়ী হইতে প্রসাদ পাইয়া ফিরিতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নের ছায়া-পাত হইল।

সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসিয়া চা খাইতে খাইতে রত্না কহিল, "পূজোবাড়ী যেমন উৎসবে ভরে থাকে, এমন আর কিছুতে থাকে না।"

মেয়ের কথার সমর্থন করিয়া রমেশ কহিলেন, "তা বটে!"

পেয়ালাতে একটা চুমুক দিয়া রত্না কহিল, "জানলে মা, কলকাতাতে আবার আজকাল সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার হিড়িক হয়েছে। সে ভারী ধুম! আমি একজিবিসন্ সাজানো দেখে এসেছি, সে যা ভিড় হয়!"

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া রমেশ কহিলেন, "আরে কিসে, আর কিসে! সে হলো কলকাতা, আর এ তো ধান-জলা! সুমুদ্দর আর ডোবা!"

অপ্রসন্ন মুখে অমলা কহিলেন, "ধান-জলা হলেও এ তো আমাদের। ওগো রত্নাকে নন্দী-গিন্নীর খুব মনে ধরেছে দেখলুম। কত আদর-অপ্যায়ন করলে; মা, মা করে কাছে বসালে! আমায় ডেকে বললেন, তোমাকে আর দেনা-পাওনার কথা কি বলবো ভাই? রত্নাকে আমায় দাও, তাহলে এ অঘ্রাণের গোড়াতেই—"

বাধা দিয়া তিক্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "মধু কি কলকাতাতে বাড়ী কিনেছে?"

অমলা থতমত খাইয়া গেলেন, ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, "নাই বা কিন্‌লে। পয়সার ওর অভাব কি? বাড়ী, বাগান, পুকুর, দু'শো বিঘে ধান-জমি! অত বড় চালের আড়ৎ—দুধের ব্যবসা! মা তো ওইখানেই বিরাজ করছেন! মধুর সে-বৌয়ের গায়ে দেখেছি—ষোল বছরে মারা গেল, কিন্তু একটি গা-ঠাসা গয়না! কি সব ভারী ভারী! যেন গিনি সোনার তাল!"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "থামো থামো, তোমার মধুর ঐশ্বর্য্য আর কানে শুন্‌তে চাই না! এইটুকু জেনে রেখো, আমার মেয়ে আড়ৎদারের বৌ হ'তে জন্মায় নি, তা তার যত পয়সাই থাক। পাড়া-গাঁয়ের সম্পত্তি আবার সম্পত্তি! আরে ছ্যাঃ!"

অমলার ভয়ানক রাগ হইল। এত বড় লোভনীয় সম্বন্ধকে এতখানি অবজ্ঞা! অথচ প্রতিমার কাছে যুক্তকরে অমলা এই সম্বন্ধের জন্যই মনে মনে প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন।

শ্লেষের সহিত অমলা কহিল, "বলি, অত ছ্যা ছ্যা কিসের? তোমার তো তাও নেই।"

"না থাক্, আমি ও চাই না!" বলিয়া রমেশ উঠিয়া সদর্প পদ-নিক্ষেপে প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টার মত রুদ্ধ নিশ্বাসে অমলা কহিলেন, "দেখো ছোটবৌ যদি হরিমতীর সঙ্গে কথা তোলে, ঠাকুরপো চেপে ধরলেই হবে! আর হরিমতী মেয়েও নিরেস নয়।"

পত্নীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমেশ জবাব দিলেন, "হরিমতীর সঙ্গে হয়, জানবো, হরিমতীর বরাত ভালো! মধুর মত ঘর-বর পেলে! তা বলে আমার রত্নার পায়ের নখের যুগ্যিও ও নয়, এ স্পষ্ট বলে দিলুম।"

মেয়ের বাপ হইয়া এত বড় দম্ভোক্তি অমলাকে নিমেষের জন্য আড়ষ্ট করিয়া দিল! মুহূর্ত্ত-পরে জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে অমলা কহিল, "তা হলে তোমার মত নেই?"

সুদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর হইল, "না! একশ' বার না! হাজার বার না! আরো শুনতে চাও?" রমেশের স্বর তপ্ত।

হাত জোড় করিয়া অমলা কহিল, "আমার ঘাট হয়েছে। বেশ বাবু, তোমার মেয়ের বিয়ে তুমি দিয়ো! আমি আজ থেকে কোন কথা কই তো ঝকমারী! কিন্তু আমিও দেখবো!"

সগর্ব্ব হাস্যে রমেশ উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, দেখে নিয়ো।"

৪০

মৃগয়ার অভিযান শেষ হইল।

অমিয়র গুলির আঘাতে যে ব্যাঘ্রপুঙ্গব ভবলীলা সম্বরণ করিল, সেই শার্দ্দূলপ্রবরের পিঠে বীর-দম্ভে একটা পা রাখিয়া অমিয় বন্দুক হাতে

বিজয়-গর্ব্বে দাঁড়াইল ; পাশে দাঁড়াইল হাস্যময়ী কল্পনা—শুভ্র মুক্তার মত কুন্দদন্ত বিকশিত—ডান হাতখানা অমিয়র কাঁধের উপর রাখিয়া ! এবং তাহাদের ঘিরিয়া বাকী সঙ্গীরা দাঁড়াইল। সকলেরই হাতে আয়ুধ, মুখে উল্লাসের হাসি।

ফটো লওয়া হইল।

সুশীলের বাংলোয় ফিরিয়া অমিয় এক কপি ফটো মায়ের নামে পাঠাইয়া দিল। সুশীলকে কহিল, "আজ আমি তলপি গুটোচ্ছি।"

সুশীল কহিল "আজই ! বড্ড শীগ্‌গির হলো না।"

অমিয় হাসিল। কহিল, "হ্যাঁ, যে দিন বলবো ওই কথাই হবে!" বলিয়া কল্পনার পানে চাহিয়া কহিল, "কল্পনারও তো কলেজ খুলছে ! তুমি ফিরছো কবে ?"

কল্পনা খবরের কাগজ পড়িতেছিল—তাহাতে শীকার-অভিযানের বিবৃতি বাহির হইয়াছে। কোন্ কোন্ রথীবৃন্দে দলটি গঠিত লেখা আছে এবং তাহাদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। নিজের নামটি পড়িয়া কল্পনা ভারি খুশী হইয়াছিল। অমিয়র প্রশ্নে মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, "আমি কাল যাবো মনে করছি।"

অমিয় হাসিল। কহিল, "এক কপি কাগজ নিয়ে যাও, আর একখানা ফটো। বোর্ডিংয়ের মেয়েদের দেখাবে।"

অমিয়র এ কথা কল্পনা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বলিয়া মনে করিল। শীকার-কাহিনীর বিবৃতি সে-ই কাগজে পাঠাইয়াছিল এবং মৃগয়া-অভিযানে তাহার বিশেষ কিছু সাফল্যও ছিল না। তাই অঙ্কুশের মত রহস্যটা তাহাকে বিঁধিল।

পাল্টা আক্রমণে পরিহাসের শোধটা ফিরাইয়া দিতে সহাস্যে সে কহিল, "হ্যাঁ, রত্নাকে দেখাবো না, এ প্রতিশ্রুতি হয় তো আমি দিতে পারি।"

অমিয় চমকিত হইল। রত্নার ভাবপ্রবণ হৃদয়, সদা-অভিমানীচিত্ত, একটুতেই কতখানি আঘাত পায়, অমিয় তাহা জানে। এবং কল্পনার এই ফটোখানা রত্নাকে কি নিদারুণ মর্ম্মাহত করিবে তাহা অনুভূতির সঙ্গে অমিয় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। ছায়াবাজির মত নিমেষে অমিয়র মনে রত্নার হৃদয়ের ক্ষত-শোণিতাক্ত চেহারা সুস্পষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। রত্নার ব্যথিত অন্তরের যাতনা পলকে নিজের মনে সে অনুভব করিল। রত্নার চোখের জলের উৎস যে অমিয়রও বুকের মাঝে অশ্রু-নদীর সৃষ্টি করিয়া চলে! বড় ভয়ে অমিয় পলাইয়া আসিয়াছে! সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, সেই তরুণ বুকে যে ঝড় উঠিয়াছে, শ্রাবণের সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন এক দিন ধুইয়া মুছিয়া শরতের নির্ম্মল আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে! সে দিন সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিবে! অমিয় বোঝে, মানুষের যাহা কিছু কাম্য, তরুণ জীবনের যত কিছু আকাঙ্ক্ষা, কুমারীর যত কিছু লোভনীয়, সমস্তই সেই পরী-বালিকার সম্মুখে থরে-বিথরে সজ্জিত হইয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে! তাই অমিয়র মন রত্নার জন্য সর্ব্বক্ষণ যাতনা বোধ করে।

হৃদয়ের নিভৃত গহনে যে ভালোবাসা এক দিন রত্নাকে কেন্দ্র করিয়া জাগিয়াছিল, সেই স্নেহ-মমতা-প্রীতিকে সে যত রকমেই গোপন করিয়া রাখুক, সে প্রীতিপ্রদের কল্যাণ চিন্তায় হৃদয় কাতর হয়।

অমিয়কে হঠাৎ নীরব দেখিয়া কল্পনার মনটাও বিশেষ প্রফুল্ল রহিল না। একটা শুষ্ক হাস্যরেখা অধরে টানিয়া সে কহিল, "ভয় হচ্ছে রত্নার জন্য, না?"

অমিয় কল্পনার মুখের পানে তাকাইল। সহজ সুরে কহিল, "হ্যাঁ।"

সুশীল উঠিয়া ইভার খোঁজে গেল।

কল্পনার মনে কে যেন অঙ্গার চাপিয়া ধরিল! মনে সহসা এমনি

জালা! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিল, "ও! আমাদের অনুমান তাহলে ভুল নয়!"

অমিয় উত্তর দিল, "না।"

কল্পনাও আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। অন্য কেহ হইলে, কথা ছিল না! কিন্তু অমিয়! সে যে এমন করিয়া একটা কথা সুস্পষ্ট স্বীকার করিবে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত! প্রচণ্ড বিস্ময়ে মানুষ নির্ব্বাক্ হইয়া থাকে! কল্পনা চুপ করিয়া রহিল।

অমিয়ও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পরে কহিল, "আমার একটা কথা রাখবে কল্পনা?" কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

কল্পনা যেন হেঁয়ালীর মধ্যে পড়িয়াছে! অমিয় তাহাকে পরিহাস করিতেছে কি না, সে বুঝিতে পারিল না। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু কহিল, "কি?"

অমিয় থামিল। একবার ইতস্ততঃ করিল। তার পর মিনতি-স্বরে কহিল, "এ ফটো তুমি রত্নাকে কখনও দেখিয়ো না!" অমিয়র স্বরে ব্যাকুলতা।

কল্পনা চমকিয়া উঠিল। আকাশের বিদ্যুৎ যেমন অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া বর্ষণ-সিক্ত ধরিত্রীর রূপটা নিমেষে দেখাইয়া দেয়, পলকে তেমনি কল্পনার চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল রত্নার প্রতি অমিয়র সুগভীর ভালোবাসা! সংশয়ের এতটুকু আব্রু আর কোথাও রহিল না।

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া শ্লেষের সহিত কল্পনা কহিল, "রত্না তাহলে আপনার কি করবে?"

মন যখন অনুতাপে আচ্ছন্ন থাকে, অপরের ব্যঙ্গ বা ভৎ‌র্সনা তখন আর মনে বাজে না।

যন্ত্রচালিতের মত অমিয় কহিল, "আমার? না, আমার সে কিছুই করতে পারবে না! কিন্তু নিজের হয় তো সাংঘাতিক ক্ষতি করে বসবে!

শূলের মত সেইটেই আমার ভয়ানক বাজবে। না কল্পনা, তোমরা পাঁচ জনে তার উপর অত্যাচার করো না।”

ব্যঙ্গের হাসিতে কল্পনার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। সে কহিল, “রত্নাকে এতই যদি আপনার ভয়, তবে এমন করে ছবি তোলালেন কেন?”

অমিয় নীরব রহিল। কল্পনা ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ছিল। শীকারের বিজয়-উল্লাসে মাতোয়ারা চিত্তে অমিয় কোন সঙ্কোচ বোধ করে নাই! এখনও কুণ্ঠা জাগিত না, যদি না রত্নার কথা দপ করিয়া স্মৃতিপথে উদিত হইত।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটিল। অবশেষে কল্পনা মুখ তুলিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “আপনি যার জন্য এতখানি উতলা, সে কিন্তু এর জন্যে এতটুকু ভাবিত নয়, জানবেন। সে এখন এতটুকু ব্যাকুল হবে না! পুরূরবার জন্য সে এখন পাগল।”

অমিয় কোন উত্তর দিল না। এ প্রসঙ্গ আর যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কল্পনার মনের কুটিলতা তাহার চোখে এমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত মন কল্পনার প্রতি তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল।

অপরাহ্ণের দিকে অমিয় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেখা দিল।

সুশীল ও ইভাকে সাদর বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল।

কল্পনা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না।

অমিয় কহিল, “কল্পনা কোথায়?”

“ওই যে ঘরে!” বলিয়া সুশীল ডাক দিল, “কল্পনা!”

ইভা কহিল, “আচ্ছা নভেল্ পড়ার ঝোঁক!”

ভ্রাতার আহ্বানে কল্পনা দর্শন দিল। অমিয়র পানে চাহিয়া কহিল, “চললেন?”

“হ্যাঁ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি!” বলিয়া বন্ধু-দম্পতির করমর্দন

করিয়া কল্পনার দিকে বাহু প্রসারিত করিল। এবং তাহার করপল্লব গ্রহণ করিয়া ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, "মনে রেখো।"

উহ্য অনুরোধটা একমাত্র কল্পনা ছাড়া আর কেহই বুঝিল না। প্রত্যুত্তরে ঔদাস্য সহকারে কল্পনা কহিল, "চেষ্টা করবো।"

একথার সঠিক অর্থ কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না। সুশীল ও ইভার কাছে সবটাই হেঁয়ালীর মত ঠেকিল।

অমিয় চলিয়া গেল।

কল্পনাকে একা পাইয়া ইভা এক সময়ে কহিল, "তুই তো বরাবর অমিয়কে পছন্দ করতিস্! আমরা মনে করতুম, ভালোও বাসতিস্! হঠাৎ তবে অনিলের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক হলো কেন?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া কল্পনা উত্তর দিল, "তার আমি কি জানি? তোমরাই জানো।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইভা কহিল, "তা অনিল খুব ভালো! ওকে পাওয়ার জন্য তপস্যা করতে হবে। রঙও তার অমিয়র চেয়ে ঢের বেশী ফর্শা। যেন ইংরেজের গায়ের রং! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আসবো বলে অমন করে কথা দিয়েও সে এলো না!"

এ সব কথার উত্তর না দিয়া কল্পনা কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক'মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সেদিন নিজের বাংলোতে বসিয়া অমিয় চা খাইবার পর উঠি উঠি করিতেছে, বেয়ারা আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

প্রয়োজন কি জানিতে চাহিতেই দ্বিতীয় দফা সেলামে সে হুজুরের কাছে ছুটীর দরখাস্ত পেশ করিল।

এই বেয়ারাটিকে না হইলে অমিয়কে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

ছুটী কি বাবদ এবং কত দিনের জন্য অমিয় জানিতে চাহিল।

বিনীত কণ্ঠে হুজুরের কাছে নিবেদন জানাইল, সাদির সব ঠিক হইয়া গিয়াছে! পনেরো টাকা লইয়া বাপ তাহাকে যাইতে আদেশ করিয়াছে। অন্যথায় বাপুজীর বিশেষ গোসা হইবে।

অমিয় হাসিল। কহিল, "আবার সাদি! এবার নিয়ে ক'বার হলো?"

লজ্জিত ভৃত্য মাথা চুলকাইয়া নীরব রহিল।

একটু চিন্তা করিয়া অমিয় কহিল, আচ্ছা, আমি রতনপুর যাবো, সেখানে সব গুছিয়ে দিয়ে নতুন চাপরাসীকে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে তালিম দিয়ে দিলে তবে ছুটী মঞ্জুর হবে!"

আর এক দফা সেলাম দিয়া লছমন্ জানাইল, অপেক্ষা এখন সে দু'মাস করিতে পারে। কেবল সময় থাকিতে হুজুরের কর্ণগোচর করিল, পাছে পরে হুজুরের গোসা হয়।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। শুধু মনে মনে একটুকু হাসিল। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবার অর্থ—হুজুরের নিকট হইতে পনেরো টাকা সংগ্রহ, তাহা সে জানিত।

৪১

আই-এ পরীক্ষায় রত্না কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। এ শুভ সংবাদ রমেশ পাড়ায় প্রচার করিয়া ফিরিলেন। ইচ্ছা, গ্রামের পাঁচ জন মাতব্বর মিলিয়া রত্নার এই কৃতিত্বের জন্য তাহাকে একটা অভিনন্দন প্রদান করুক। তাহাদের চাঁদার অর্দ্ধেকের উপর রমেশ একাই না হয় বহন করিবে। অবশ্য স্বার্থ তাহার কিছু নাই; কন্যা তাহার বিদূষী।

কলিকাতার সমাজের মুকুটমণি। কিন্তু এটা স্ত্রী-শিক্ষার যুগ। দেশের আরও পাঁচটা মেয়ের যদি উৎসাহ জাগে! রত্নার মত না হোক, অর্থাৎ রত্নার সমকক্ষ কেহ হোক, রমেশ তাহা পছন্দ করে না; তবে লেখাপড়া শিখিবে তো। নারী-শিক্ষার প্রচার এমনি করিয়াই সমাজে করিতে হয়।

স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ও থার্ড মাষ্টারকে দলে ভিড়াইয়া রমেশ একটি ছোট সভা ডাকিয়া এমনিতর একটা আবেদন জানাইলেন। একটা কমিটী গঠনেরও ব্যবস্থা হইল।

বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে কহিলেন, "দেখ্‌লে, দেশময় একটা সাড়া পড়ে গেছে। রত্নার নামে আজ গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল! হুঃ! এ কি সহজ কথা। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ নিলে, আই-এ-তেও নিলে—তার নামে হরিশ বড্ড না পাঁচ কথা বলেছিল। আরে সে হলো ক্ষণজন্মা, সরস্বতী আমার ঘরে এসেছে। তাকে তোরা কি চিনবি। ছোটবৌ তার নামে দশখানা বলেছিল। এবার সে দেখলে তো। মেয়েকে তো কখনো আসতে লিখবো না। সত্যপ্রসাদকে লিখে দেবো, ছুটীটা সে যেন তোমার কাছে কাটায়। তার কলেজে ভর্ত্তি হবার ব্যবস্থাও তুমি করে দেবে।"

অমলা এ সকল কথার কোন উত্তরই দিলেন না। মেয়ের এতখানি প্রশংসা কানে শুনিলেও মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিল না। মুখের চেহারায় বরং ম্লানিমা দেখা গেল।

এবার মেয়েকে বোর্ডিংয়ে থাকিবার জন্য স্বামি-স্ত্রীর তর্ক তুমুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। তার কারণ, ছোটবৌ একটা সাংঘাতিক কথা অমলার কানে তুলিয়াছিল।

এখন শুধু মনে হইল, হয়তো স্বামীর কথাই সত্য! ছোটবধূ হয়তো হিংসা করিয়াই মেয়ের নামে মিথ্যা রটনা করিয়াছে। না হইলে

দুই মাসের উপর গোস্বামি-দম্পতি তাহাকে কন্যার মত কাছে রাখিয়াছেন!

বাৎসল্য দুর্ব্বল মন স্নেহাস্পদের অন্যায়কে এমনি যুক্তি-বিচারেই লঘু করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চায়। বিশেষ মায়ের মন।

প্রতিভা এক দিন বড়জাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "একটা কথা বলবো মনে করি দিদি, কিন্তু বলতে পারি না। কিছু যদি মনে না করো তো বলি।"

একটু অবাক হইয়াই অমলা কহিলেন, "কি কথা ছোটবৌ।"

চারিদিকে চাহিয়া ঢোঁক গিলিয়া ছোটবৌ বলিল, "আমরা গেরস্থ মানুষ দিদি, ওসব কি আমাদের ভালো দেখায়, চোখে কেমন ঠেকে।"

ঈষৎ বিচলিত হইয়া অমলা কহিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে?"

বড়জার আর একটু গা ঘেঁষিয়া বসিয়া প্রতিভা কহিল, "কথাটা কানে এলো—হাজার হোক, রত্না তো পেটের মেয়ের মতই, হরিমতী আর রত্না কি আলাদা। আমার হরিমতী যদি একটা অন্যায় করে তুমি বলবে না ভাই!"

মাথা পাতিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "সে তো নিশ্চয়। ওরা এখন ছেলেমানুষ, কতটুকু বা বুদ্ধি! আমরাই তো ওদের রক্ষক; ওদের ভালো-মন্দর জন্য দায়ী।"

সায় দিয়া প্রতিভা কহিল, "তুমিই বলো দিদি, দেওর তোমার একেবারে রেগে মার-মুখী আমার ওপর। বলে, ও-সব কথায় তুমি থাকবে না; জানো, রত্না কত দিয়েছে তোমার ছেলেমেয়েদের। আচ্ছা তোমাকেই জিজ্ঞেস করি দিদি, আমরা মেয়েমানুষ; এ সব কথা কি আমরা চেপে রাখতে পারি, না তা রাখা উচিত? আর দেওয়াতে কি কারু মুখ চাপা থাকে? কি বলো?"

অমলার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল কি কথা বলিবার জন্ম ছোটবধূ এত ভণিতা করিতেছে?

অমলার কণ্ঠ-তালু সব যেন শুকাইয়া মুখের ভিতরটা মরুভূমি হইয়া গেল। ছোটবৌয়ের দিকে তিনি কেবল চাহিয়াই রহিলেন।

চাপা-গলায় ছোটবধূ কহিল, "বড়ঠাকুরের কানে যেন না ওঠে। তুমি ওই গোস্বামী সাহেবদের সঙ্গে রত্নাকে মিশতে দিয়ো না।"

ব্যাকুল কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "কেন, কি হয়েছে?" তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতেছিল।

প্রতিভা কহিল, "তবে বলি শোন—কথাটা হলো ইয়ে—বুঝছো কি না, যাকে বলে, ভাব—ভালোবাসা—মাখামাখি।"

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া অমলা ছোটজায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ছোটবধূ বড়জায়ের বাহুমূলে একটা চিমটি কাটিয়া মুচকী হাসিল। কহিল, "আমিও অমনি অবাক হয়েছিলুম বড়দি!" বলিয়া কহিল, "এটা তো সত্যি, আগুনের কাছে ঘী থাকলে সেটাকে গলাতেই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না; দু'জনের সোমত্ত বয়স, সুন্দর, আইবুড়ো। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। ওদের কি দোষ! কথায় বলে, যে বয়সের যা ধর্ম্ম।"

বিমূঢ়ার মত অমলা চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া একটা শব্দও বাহির হইল না।

প্রতিভা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "এ কি আর বুঝতে বাকী থাকে, টান্ না হলে কেউ সঙ্গে করে আনে? ছাড়তে মন চায় না; তাই অত আদর, অত জিনিষ কিনে দেওয়া। কথায় বলে, মন না মতি! পাপ-পুণ্যির জ্ঞান কি তখন থাকে। ছেলেমানুষ, সংসারের কোন ঘা খায় নি—কিসে কি হয় জানেও না।"

ছোটবধূ থামিলেন। কিন্তু তাঁহার সদুপদেশমালায় অমলার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর যেন ভূমিকম্প হইতেছিল। প্রতিভা তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে যেন কোন অন্ধকূপের ধারে লইয়া যাইতেছে। অমলার এখুনি তাহাতে নিমজ্জন ঘটিবে; কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

অমলার ব্যথিত চোখ, পাংশু মুখ প্রতিভার মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দের সঞ্চার করিল। মন যেন নিভৃতে তৃপ্তি পাইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে শুনিয়া আসিতেছে, পরের মেয়ের হাজার স্তুতি! তার তুলনায় প্রতিভার ছেলেমেয়েরা কত হীন! আজ তাহার সমতার দিন আসিয়াছে—পাল্লা বুঝি বা এবার তাহার দিকে ঝুঁকিবে। কে ভালো কে মন্দ, তাহার একটা বুঝাপড়ার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে! এ সুযোগ কি উপেক্ষা করা যায়?

ছদ্ম সহানুভূতি-মাখানো কণ্ঠে প্রতিভা কহিল, "তা দিদি, আমিও শুনে প্রথমে অমনি আঁৎকে উঠেছিলুম। মণি যখন বল্লে, দিদি ওই গোঁসাই সাহেবের বুকে মাথা রেখে মোটর গাড়ীতে বসেছিল মা, আর সাহেব তাকে কি বলছিল।"

মূর্চ্ছাতুর যেমন সম্বিতের প্রথম উন্মেষে কথা কয়, তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে অমলা কহিল, "কখন?"

"ওই যে গো! খালের কাছে যখন গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, দু'জনে সামনের দিকেই বসেছিল। মণি বললে, 'ওদের দেখে নাকি রত্না গিয়ে গাড়ীর ভিতরে বসলো!' মণি তো ছেলেমানুষ, অত বোঝে না। ভোলা ডাগর হয়েছে সে বললে, হেড্‌মাষ্টারের মেয়ের মত না? বুঝছো না, সারা পথ দু'জনে পাশাপাশি বসে এসেছে! কি বলেছে, কি করেছে, কে জানে—আর ভোলাও কি বাড়ী

গিয়ে মার কাছে গল্প করে নি ভাবো?—তাই তো তাঁতি-গিন্নী বললে—

দেখবো কত শুনবো কত আরও বেঁচে যদি থাকি,
কায়েতের মেয়ের মাথায় বামুনে ধরবে ছাতি।"

নিষ্পলক নেত্রে জড় পুতুলের মত চাহিয়া অমলা বসিয়া রহিলেন। কি প্রতিবাদ করিবেন, কি বলিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবেন? তিনি যে নিজের চোখে দেখিয়াছেন, রত্নার হাত ধরিয়া অনিল তাকে গাড়ী হইতে নামাইল। স্বামীকে এইটুকু বলিতেই উত্তপ্ত স্বরে তিনি জবাব দিয়াছেন, ওটা হলো মহিলা-সম্মান। সভ্য সমাজের রীতিই ওই; ওদের পুরুষরা মেয়েদের সম্মান করে বলেই লক্ষ্মী আজ ওদের ঘরে অচঞ্চল। আর আমরা করি না—অলক্ষ্মীর দশা আমাদের। তোমাদের ছোট মন কি না—সব জিনিষের খালি কদর্থ করো।

স্বামী এখন কি বলিয়া, কি করিয়া দেশশুদ্ধ লোকের মুখে চাপা দিবেন। ভোলা হয় তো মায়ের কাছে সবই বলিয়াছে, এবং তাঁতিগিন্নী তাহাই বাড়াইয়া সাজাইয়া শতখান করিয়া গ্রামময় টিট্‌কারি তুলিবে।

হঠাৎ অমলার মনে হইল, এত বড় কলঙ্ক রটিবার পূর্ব্বে যেন রত্নার মৃত্যু ঘটে। তখনি চমকিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন! ষাট! ষাট!

মৃত্যু-শোকই প্রবল নয়। পৃথিবীতে মাই শুধু সন্তানের মৃত্যু কামনা করিতে পারে। সন্তানের চরম দুর্গতির দুঃখ, বিষাক্ত অজগরের নিশ্বাসের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবার পূর্ব্বে গর্ভধারিণী শুধু বলিতে পারে, মৃত্যু ঘটুক। মায়ের চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষিণী বিশ্বে আর কেহ নাই।

রাত্রে স্বামীর পায়ের উপর অমলা উপুড় হইয়া পড়িল—"ওগো, তোমার পায়ে ধরি, আমার একটা কথা রাখো।"

ব্যস্ত-সমস্ত রমেশ দুই হাতে পত্নীকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কেন কি হয়েছে ?"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "মেয়েকে আর পড়িয়ো না।"

বিমূঢ় কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "মানে ?"

অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে অমলা কহিলেন, "নিন্দেয় যে দেশ ভরে গেল। তুমি ওর বিয়ে দাও।"

তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া রমেশ কহিলেন, "কেন, কে কি বলেছে শুনি ?"

কথাটা ঘুরাইয়া অমলা কহিলেন, "আমরা জেলেডিঙি, কাজ কি জাহাজের সঙ্গে টক্কর দিয়ে।"

গভীর অবজ্ঞাভরে রমেশ কহিলেন, "ওঃ, সেই পুরোনো কাসুন্দি। কিন্তু বড়বৌ, কাকে পূজো করে ওকে পেয়েছিলে—সে কথা মনে আছে ?"

ভীত কণ্ঠে অমলা কহিলেন, "সবাই বলছে, তাই !"

ভর্ৎসনার স্বরে রমেশ কহিলেন, "ফের সবাই ! আবার লক্ষ্মী-ছাড়া ঐ পাড়া-পড়সীর কথা।"

থতমত খাইয়া অমলা বলিলেন, "কিন্তু ছোটবৌ যে বললে, রত্না আর ভালো নেই।"

রমেশ তড়াক করিয়া খাট হইতে নামিলেন, কহিলেন, "বলেছে ? হুঁ, তাকে দেখে নেবো।"

অমলা ছুটিয়া গেল। স্বামী দ্বারের খিল খুলিবার পূর্ব্বেই সে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল।

অগ্নিচক্ষে পত্নীর পানে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, "ছেড়ে দাও, আমি ছোটবৌয়ের কারচুপী, শয়তানী ভাঙ্গবো।"

অমলা কহিল, "চুপ! চুপ! তুমি না ভাসুর! এত রাত্রে ভায়ের বাড়ী যাবে হল্লা করতে। লোকে যে মুখে চুণ-কালি দেবে।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তা বলে সয়ে থাকবো? সে ছোট-লোক আমার মেয়ের নামে যা তা রটাবে? নেমকহারাম বেইমান, বাবার জন্মে দেখেছে—রত্না ওর ছেলেমেয়েদের যে-সব জিনিষ দিয়েছে?"

অমলা আকুল হইয়া স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া কহিলেন; "পাগল নাকি?"

জীবনে এমন ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, ভ্রাতৃবধূর উদ্দেশ্যে এমন কটূক্তি রমেশ কখনো করেন নাই। কন্যার কুৎসা রটনায় আজ ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে তাহাই বুঝিয়া অমলা কহিলেন, "তা আমি বুঝেছি, ওরা মিথ্যে বলেছে। কিন্তু তবু দরকার কি?"

একটু শান্ত হইয়া রমেশ কহিলেন, "তাই বলো! আমি তো তোমায় একশো বার বলেছি বড়বৌ, রত্নার হিংসেতে সব জ্বলে মরে। যখন আমি যাত্রা করতুম, কি কথাই না তখন সকলে বলেছিল আমার নামে। বলো, আমার গা ছুঁয়ে বলো।"

অমলা কহিলেন, "হ্যাঁ, ও-বাড়ীর মেজদি বলেছিল বটে, রমেশ ঠাকুরপো মদ খায়—সুরেন অধিকারীর সঙ্গে।"

রমেশ উৎসাহিত স্বরে কহিলেন, "তবে? বাবাকে অবধি বলেছিল, রমেশটা মাতাল, জুয়াড়ি—লাঠির বাড়ি মেরে বাবা আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। এক মাস আমি বিছানায় পড়ে! কিন্তু তুমিই বলো, কখনো আমি নেশা-ভাঙ কিছু করেছি? না, খারাপ ছিলুম?"

অমলা কহিলেন, "হাঁ, পরে ধরা পড়লো—সুরেন অধিকারীকে জব্দ করতে।"

পত্নীর দিকে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, "তবে? ভুক্তভোগীই বুঝতে পারে। আমি এক আঁচড়ে ওদের মনের কথা বুঝি।"

স্বামীর কথা অমলাও বুঝিল। লজ্জায় সে রত্নার নিকটে কোন কথাই পাড়িতে পারিল না। আভাসে ইঙ্গিতেও না। মেয়ে কত ব্যথা পাইবে।

পরীক্ষার পর অমলা যখন কন্যাকে দেশে আনিবার কথা বলিল, রমেশ উত্তর দিলেন, "বাপ, এই শত্রুপুরীতে আনছি না! ব্যবস্থা আগেই করেছি। সত্যকে চিঠি দিয়েছি—রত্না তার ওখানেই থাকবে।"

৪২

মধু নন্দীর সহিত হরিমতীর বিবাহের পাকাপাকি হইয়া আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

প্রতিভা কহিল, "বাঁচা গেল বড়দি! আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখা আর কালসাপ গলায় ঝুলিয়ে রাখা! বাবা! গায়ে কাঁটা দিতে থাকে।"

হরিশ কহিল, "তুমি বৌদি অমন করে মধুর মাকে না ধরলে হতো না।"

রমেশ উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতার কথা কানে গিয়াছিল, সহাস্যে কহিলেন, "আরে, সে যে আমার রত্নার টাঁক করেছিল। বামনের চাঁদ ধরবার সাধ! কি বলো?" বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এই হোল, যোগ্যে যোগ্য!"

ছোটবধূ পূর্ব্বাহ্নেই ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গিয়াছিল। হরিশের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। সে কহিল, "হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা।"

অমলা দেবরের ক্ষুণ্ণতার অর্থ বুঝিলেন। কথাটা চাপা দিয়া কহিলেন, "হারছড়া খুব ভারি, ভরি ষোল সোণার কম নয়।"

হরিশের মুখ প্রসন্ন হইল। কহিল, "সোণার দাম তো আজকাল জানো—আশীর্ব্বাদে দিলে।"

মণি জ্যেষ্ঠতাতকে ধরিল, "জ্যাঠামণি, রত্নাদিকে নিয়ে এসো! রত্নাদি এলে খুব আমোদ হবে।"

অসঙ্কোচে মাথা নাড়িয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া রমেশ জবাব দিলেন, "সে কি করে হবে? তার আসা অসম্ভব।"

হরিশ কহিল, "বাড়ীর বড়মেয়ে! আমার প্রথম কাজ, এক সপ্তাহও যদি—"

রমেশ তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট উত্তর দান করিলেন, "বাড়ীর কাজ ব'লে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'তে দিতে পারি না! কলেজে এখন সে ভর্ত্তি হবে; বি-এ ক্লাশ হলো।"

"তা বটে!" বলিয়া হরিশ চুপ করিয়া রহিল।

মণিকে দিয়া প্রতিভা ভাসুরকে বলাইল, "হরিমতীর ইচ্ছে, দিদি এসে কাপড়-চোপড় পছন্দ করে। আর সে জানে-শোনেও বেশী।"

রমেশ সায় দিয়া কহিলেন, "তা জানে; বুঝছো না ছোটবৌমা, সহরের সব বড়ঘরেই ও মেশে! তারা সব বিলেত-ফেরতের দল!"

মণি কহিল, "মা তাই বলছে; রত্নাদি তিন দিনের জন্যও একবার আসুক!"

আহ্লাদের স্বরে রমেশ কহিলেন, "না, না, ছোটবৌমা, তোমরা ভারী ফ্যাসাদে পড়বে; তার পছন্দ-মত জিনিষ তো তোমরা কিনতে পারবে না! আর আড়ৎদারের ঘরে অত ফ্যাশানেরই বা দরকার কি? যা দেবে পছন্দ হবে।"

প্রতিভা গিয়া বড়জাকে কহিল, "বড়দি, তোমাকে আর কি বলবো,

রত্নার বিয়ে আর হরিমতীর বিয়ে আলাদা ভেবো না, দেখাশোনা সব করো গিয়ে।"

অমলা রন্ধন ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। স্বামীর কথাগুলা কানে গিয়াছিল। এখন বাহির হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয় যাবো! অত করে তোমায় বলতে হবে কেন ছোটবৌ? যে ভাগ্যবতী, সেই জামায়ের মুখ, নাতির মুখ দেখতে পাবে।"

বিবাহের দিন বাহিরে কন্যা-কর্ত্তা হইয়া রমেশ ঘুরিতে লাগিলেন এবং নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে জানাইয়া দিলেন, "তাঁহার বিদুষী কন্যা আই-এ-তে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে।"

ছান্‌লাতলায় হরিমতীর বরকে বরণ করিতে অমলা নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মনে জাগিল, রত্না হরিমতীর চেয়ে দু'বছরের বড়। একটা মেয়ে! তবু বাড়ীর এত বড় একটা শুভ কাজে সে দূরে রহিল। অন্তরে ব্যথার মোচড় দিল।

বাসর-ঘরে রমেশ একবার দেখা দিলেন। কন্যা-জামাতার পানে চাহিয়া কহিলেন, "বাঃ, দিব্যি মানিয়েছে; যেন হর-পার্ব্বতী। দ্যাখো বাবা মধু, তোমার শালী যদি থাকতো—এই আমার মেয়ে রত্না, তাহলে উর্ব্বশীর নাচটা তোমাকে দেখাতে বলতুম। বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবে কি না; তাই আসতে পারলে না। কুড়িটাকা বৃত্তি পেয়েছে। ম্যাট্রিকেও পেয়েছিল।"

মধু নীরব রহিল।

রমেশ পারুলের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "তা পারুল, কি করবি মা, তোরা যেমন পারিস আমোদ কর! এই বেশ।" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি ফিরিয়া গেলেন।

মধুকে অমলার ভারী ভাল লাগিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষ। বয়স

তিরিশ—তা হোক! বিনম্র আচরণ; কথাগুলা মিষ্ট, সহানুভূতি মাখানো। শ্বশুরবাড়ীর হীন অবস্থার জন্য সে এতটুকু ক্ষুণ্ণ নয়।

অমলা মনে মনে শতবার ভাবিল, "রত্নার চেয়ে কোন অংশেই মধু নীরেস হইত না! বিদ্যার জাহাজ হইলেই কি সব সার্থক হয়?"

বিবাহ চুকিয়া গেল। বর-বধূ গৃহে গমন করিল। অমলা নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এক সময়ে কহিলেন, "আমার বড় ভয়—'অতি বড় সুন্দরী' শ্রীমতী কত দুঃখ পেয়েছেন। সীতার দুঃখে প্রাণ গলে যায়! কি জানি রত্না!" বলিয়া তিনি থামিলেন।

বিরক্ত স্বরে রমেশ জবাব করিলেন, "দেখ বড়বৌ, অমন করে মেয়েটার অমঙ্গল টেনে এনো না।"

চমকিয়া অমলা কহিলেন, "বালাই! আমি তো সারাক্ষণ দেবতাকে ডাকচি, তার শুভবুদ্ধি হোক! তার কল্যাণ হোক!" বলিতে বলিতে একরাশ অশ্রু চক্ষু-পল্লব হইতে ঝরিয়া পড়িল।

বোধ করি, প্রতিভার কথাগুলাই রহিয়া রহিয়া মাতৃ-হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে! কে জানে—

বিহ্বলের মত রমেশ পত্নীর মুখপানে কয়েক দণ্ড তাকাইয়া রহিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মনে এই প্রথম একটা অভাব গুমরিয়া উঠিল; আচম্বিতে মনে হইল, আজ যদি রত্নার বিয়ে হইত।

সহসা কণ্ঠস্বর নামাইয়া রমেশ কহিলেন, "রত্নাকে বিয়েতে আনলুম না বলে তুমি কাঁদচ বড়বৌ! কিন্তু রত্না হরিমতীর চেয়ে বড়, যদি তার মনে দুঃখ হয় তার বিয়ে হলো না বলে, সেটা ভাবো।"

যুক্তি দিয়া কথা কাটা যায় না। অমলা কহিল, "কিন্তু রত্নার তুমি বিয়ে দিতে পারতে তো।"

অন্যমনস্ক ভাবে রমেশ উত্তর দিলেন, "হুঁ! কাল থেকে তাই ভাবচি, দেখি সত্যকে বলে, যদি একটা—"

কথাটা শেষ না করিয়াই রমেশ উঠিয়া গেলেন।

পত্নীর পানে চাহিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বল্‌টুর চিঠি।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কি লিখেছে?"

দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনও কমে নি, তাই রত্নাকে নিয়ে যেতে পারলেন না। আমাকে অনুরোধ করেছে, রত্নাকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিতে! টাকা-কড়ি অবশ্য সে-ই পাঠাবে।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্না রয়েছে। কলেজে না হয় ভর্ত্তি করে দিলুম। কিন্তু ভাবি, রমেশবাবু মেয়েকে এ ভাবে তৈরী কচ্ছেন কেন? এর অর্থ কি?"

স্ত্রীর পানে চাহিয়া গোস্বামী সাহেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। কহিলেন, "এ তো সোজা কথা। এমন সুন্দরী মেয়ে—সে আভাসও দিয়েছেন! তা ছাড়া এটাও তো স্বীকার করতে হবে, রত্নার প্রতিভা যথেষ্ট।"

অন্যমনস্ক ভাবে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তা আছে, এই নাচলে, গাইলে, থিয়েটার করলে, আবার পরীক্ষায় পাশ হ'ল কি রকম! অমিয় ওকে গাড়ী চালানো শেখাতে নিয়ে গিয়ে আমাকে তাই বলছিল। কিন্তু—"

"কিন্তু কি লীলা?"

মৃদু হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "বুদ্ধিটি ওর কি রকম, ও যেন কিছু সইতে পারে না! কেউ ওকে জিতে যাবে, এ ভাবতে গেলেই ওর যেন মাথা খারাপ হয়! সময় সময় আমার কাছে ভয়ানক আব্দারে হয়, আবার কখনো দেখি, মন-মরার মত চুপ করে বসে আছে। চোখ দু'টি ছল ছল করছে। তখন মায়া হয়, কাছে টেনে নিই।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বাপ-মায়ের একটি মেয়ে কি না, আদরে মানুষ হয়েছে। আর বল্টুরও মেজাজ ছিল ওই ধরণের। বড্ড ঝোঁকের মানুষ ছিল।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "থাক গে ও কথা। ভাবছিলুম, কল্পনার মাকে বলি, আই-এ তো পাশ করলে, আর অত অপেক্ষা করতে আমার ভাল লাগছে না।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তুমি ভাবো, কল্পনা কখনো বি-এ পাশ করতে পারবে? ওই আই-এটি টেনে-টুনে যা হয়েছে যথেষ্ট।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তা, হোক, মেয়েটি বেশ! আমার সব কাজে ডান হাতের মত দাঁড়াতে পারে। কোন কিছু পরামর্শ করে ওর সঙ্গে তৃপ্তি পাই।"

গোস্বামী সাহেব অল্প হাস্য করিলেন। কহিলেন, "তা ঠিক। এ দিকে খুব চালাক্ চতুর। সব দিকে হুঁসিয়ার।"

গোস্বামি-দম্পতি যখন এমনি বাক্যালাপে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় ড্রইংরুমে বসিয়া রত্না নিবিষ্ট মনে পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতেছিল—

সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে,
কে তারে বাঁধ্ল অকারণে?

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "ও কথা ছাড়ো! যা হবার নয়, তা নিয়ে আপশোষ অকারণ। শুধু মন খারাপ করা।"

রত্না গাহিতেছিল—

গতি-রাগের সে ছিল গান
আলো-ছায়ার সে ছিল প্রাণ
আকাশকে সে চম্‌কে দিত বনে॥

গোস্বামী সাহেব পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন, "রত্না নিজের ছবি আঁকছে!"

মিসেস্ গোস্বামী হাসিলেন। সুরের ছায়া তাঁহার চোখে-মুখে পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ মনে হইল, রত্না বড় মধুর—বড় সুন্দর! সকলের সঙ্গে থাকিয়াও সাধারণের মাপকাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না!

গোস্বামী সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া পত্নীর কৌচে গিয়া বসিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন, "কি ভাবচো?"

স্বামীর গায়ের উপর হেলিয়া পত্নী কহিলেন, "এমন কিছু না। অমিয়র জন্য মনটা কেমন করে। অভিমান করে সে চলে গেল।"

গোস্বামী সাহেব নীরব রহিলেন। সে দিনের ঘটনা—পত্নীর সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি! অমিয়র আঁধার-করা মুখচ্ছবি নিমেষে স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। সে দিন তিনি নির্ব্বাক্ ছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। পত্নী কঠিন অভিযোগ তুলিয়াছিল, এমন সন্দেহের অবকাশই বা অমিয় কেন দিয়াছিল! সেইটেই ছিল গোস্বামী সাহেবের বিরক্তির কারণ। তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শুনিবামাত্র মনটা তাঁহার বিকল হইল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "অনিলের বিয়ে আমি দেবো। সে সময় প্রশ্ন উঠ্বে, অমিয় কেন বিয়ে কর্লে না?"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তুমি বলে দেবে প্রশ্নটা তাকে করতে।"

"কিন্তু তাতে কি আমাদের গৌরব বাড়বে? না মুখ উজ্জ্বল হবে?"

মাথা চুলকাইয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তা ঠিক বলতে পারি না। তবে উত্তর দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।"

মিসেস্ গোস্বামী উঠিয়া বসিলেন, স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি যদি অমিয়কে ধরো—"

সবিস্ময়ে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "আমি কি ধরবো।"

মিসেস্ গোস্বামী উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তাকে বিয়ে করতে বলো। রাজী না হয় কারণ বলুক।"

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ও বাবা, হাকিমের কাছে কৈফিয়ৎ তলব! না, অতটা পেরে উঠ্‌ব না। আমি হলুম কৌশুলি।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি অমন করে কথা এড়াতে চেয়ো না —তা হবে না। অমিয় তোমার ছেলে; সে তোমার কথা শুনতে বাধ্য।"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "কারুর প্রিন্সিপলের উপর আমি কোনা কথা কইতে রাজি নই।

৪৩

গোস্বামি-দম্পতি যখন এইরূপ কথাবার্ত্তায় তন্ময়, তখন অন্য কক্ষে অপর দুটি নর-নারীর জীবনে কেমন করিয়া প্রলয়ের কালরাত্রি সমুপস্থিত হইল, উপমা-রহিত সেই দুঃসহতা ধুমকেতুর পুচ্ছাঘাতের মত দুটি মানুষকে দিকভ্রষ্ট বিভ্রান্ত করিয়া কক্ষচ্যুত করিল, তাহাদের বহু দূরে খেদাইয়া দিল, এবার সে-কাহিনী বলি।

ঘটনা এই—আজ সারাদিন রত্না উন্মনা ছিল। গোস্বামি-প্রাসাদে আজ তাহার শেষ রাত্রি, কাল কলেজ খুলিবে। এখানকার হর্ষ-বিষাদ এইখানে ফেলিয়া কাল হইতে সে নূতন করিয়া লেখা-পড়ায় মন দিবে। তাহার পরীক্ষার কৃতিত্বে পিতা আনন্দিত, মাতা পুলকিত। গোস্বামি-দম্পতিও তাই। অনিলও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। তবু যেন রত্নার এ আনন্দ তাল-কাটা গানের মত ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে; কেবল মনে হয়, তাহার এত শ্রম সকলই ব্যর্থ! যদি এই কৃতিত্বের গৌরব কোন নয়ন-কোণ হইতে আনন্দ ঝরিত, অধর-পুটে অতি-সামান্য একটু

প্রশংসার বাণী নিঃসৃত হইত, তবে অমূল্য সম্পদের মত সমগ্র জীবনে তাহা বিরাজমান রহিত। কিন্তু সেই সুদূর-প্রবাসী কি—

ভয়ে রত্না সে চিন্তার মুখ রোধ করে। আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যকে কলসির মধ্যে আবদ্ধ করার মত হৃদয়ের গোপন গুহায় নিহিত বাসনাকে মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সে সংযত করিয়া ফেলে।

গোস্বামি-দম্পতি লাইব্রেরী-ঘরে; অনিল ক্লাবে, সন্ধ্যাটা রত্নার যেন কোন মতে কাটিতে চাহিতেছিল না। বিমনা মন লইয়া সে আসিয়া বসিল ড্রইংরুমে, পিয়ানোর সম্মুখে।

বাজনা খুলিতেই সহসা অতীতের কথা মনের দ্বারে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পিয়ানো শিক্ষা সে অনিলের কাছে লাভ করিয়াছে। অনিল হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যে এর মধ্যে আমার চেয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠেছো রত্না। ছুটিতে আসিয়া রত্না তখন অনুক্ষণ পিয়ানো লইয়া সময় কাটাইত। গোস্বামী সাহেব তাহার বাজনা শুনিয়া বহু প্রশংসা করিতেন। আর একজন সে গীতমুগ্ধ কুরঙ্গের মত আবিষ্ট থাকিত।

রত্নার মনে পড়িল—যে ক'দিন অমিয় ছিল, প্রত্যেক দিন সে রত্নার বাজনা শুনিত। এমন মুগ্ধ নিবিষ্ট শ্রোতা পাইয়া রত্নাও সমস্ত অন্তর ঢালিয়া নিত্য সুরের জাল রচনা করিত। আর গৃহে যেন তখন আনন্দের ঝর্ণা বহিত!

প্রবাস-প্রত্যাগত সেই মানুষটির কাছে কত লোক আসিত কত রকমের অভিলাষ, প্রয়োজন, সংবাদ লইয়া দেখা-শোনা করিতে! সমস্ত গৃহ যেন অমিয়র জন্য গম্ গম্ করিত।

অমিয় পিয়ানো বাজাইতে জানিত না। অথচ এত অল্প দিনে রত্না এমন করিয়া এ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছে জানিয়া মাঝে মাঝে কনিষ্ঠের নিকট শিক্ষানবিশী করিত। কখন রত্নাকে ডাকিয়া বলিত, অনিল

বলেছে, তোমার চেয়ে আমাকে ভাল করে শেখাবে। দেখবে, তখন আমার বাজনায় তুমি অবাক হবে।

রত্না একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রীড্‌গুলাতে তাহার চম্পক-পেলব অঙ্গুলির তাড়না দিয়া সুরের ঝঙ্কার তুলিত।

মন আজ কেবলই অবসাদে ঝিমাইয়া পড়িতেছিল। মধ্যাহ্নে মায়ের চিঠি আসিয়াছিল—মা হরিমতীর বিবাহের কথা লিখিয়াছে। কাকিমা, কাকামণির বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা মত করেন নাই। উপসংহারে লিখিয়াছেন, মানুষ সংসার করিবার জন্যই পুত্রকন্যা কামনা করে। তা ছোটবৌয়ের বরাত ভাল; তাহার সে আকাঙ্ক্ষা সার্থক হইবে। মধু ছেলেটিও বেশ! চমৎকার আচার-ব্যবহার! জামাই করিতে আনন্দ। নিরভিমানী—অমায়িক।

রত্না হিসাব করিয়া দেখিল, আজ হরিমতীর ফুলশয্যা—বসনে-ভূষণে তাহাকে কেমন মানাইল, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। চন্দন-চিত্রিত সরস-রাঙা মুখে নিশ্চয় শুধু হাসি খেলিতেছে। মধুর সুখ্যাতিতে গৃহ যখন মুখর, তখন নিশ্চয় হরিমতী নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী ভাবিতেছে। গর্ব্বও বোধ করিতেছে। পিতার পত্রে অবগত হইল, বিবাহে মধু পণ গ্রহণ করে নাই। নিজেই সমস্ত অলঙ্কার-বস্ত্র দিয়াছে। হরিশ খুব খুশী!

রত্না ভাবিল, যে ব্যক্তি পিতাকে এত বড় দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দান করে, মন তাহার প্রতি আপনিই শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। মধুর বদান্যতায় হরিমতী মুগ্ধা। নিজেকে সে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী ভাবিয়া পুলকিত। অথচ এই মধুকেই রত্না প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মাথার সেই ছোট ছোট চুল কাটা হইতে গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ের চটি—সব মিলাইয়া দেখিলে হাসি পায়। মনে হয়, একটা উজবুক

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোমরে টাকার ছোট থলিটা পর্য্যন্ত কৌতুক উৎস জাগায়। রত্নার কাছে এই মধু কত তুচ্ছ! মধুর মা রত্নাকেই চাহিয়াছিল, মাও তাই চাহিয়াছিলেন। রক্ষা করিয়াছে পিতা। মন চকিতে মধুর পাশে অমিয়কে দাঁড় করাইল। চমকিয়া উঠিল। কাহার সঙ্গে কাহার তুলনা করিতেছে? সহসা মনে হইল, অনিল! হরিমতী তো তাহাকে দেখিয়াছে। রত্নাকে বলিয়াছে নিজেই স্বীকার করিয়াছে, —কত সুন্দর অনিল! ভগবানের দেওয়া চোখ যাহার আছে, সেই অনিলের মনোহর মূর্ত্তির প্রশংসা করিবে।

রত্না ভাবিতে লাগিল নিজের কথা, অনিলের কথা—অনেক কথা। ভাবনার শেষে নিশ্বাস যেন বদ্ধ হইবে! তাড়াতাড়ি সে পিয়ানোয় ঝঙ্কার তুলিল—সুরের রাজ্যে গিয়া এ ভাবনার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া।

ক্লাব হইতে অনিল গৃহে ফিরিল। পিয়ানোর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নিজের ঘরে না গিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল। সে অনেক বার রত্নার গান শুনিয়াছে; কিন্তু অবাধ জলপ্রপাতের ন্যায় ঝরিয়া পড়া সুরলহরী এ যেন অশ্রুত স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত তাহার কানে ঠেকিল। একেবারে পাশের কৌচটায় গিয়া সে বসিল।

অনিলকে দেখিয়া গান থামাইয়া রত্না কহিল, "এই ফিরছো?"

"হ্যাঁ! না, না, তুমি থেমো না, গেয়ে যাও!" বলিয়া সে কৌচের উপর হেলিয়া পড়িল।

রত্না গাহিতেছিল—

কবে তুমি আসবে বলে,
আমি রইব না বসে
আমি চলব বাহিরে।

শুক্‌নো ফলের পাতাগুলি পড়তেছে ঝরে,
আর সময় নাহি রে ॥
বাতাস দিল দোল দিল দোল,
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল—ও তুই খোল,
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে,
আর সময় নাহি রে।
আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী,
গগন পারাপারে খেয়া একলা চালায় বসি,
ও সে একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাই বা জানা নাই,
ও তোর মনের মানা নাই, ও তোর নাই,
সবার সাথে চললি রাতে
সামনে চাহি রে,
আর সময় নাহি রে ॥

অনিলের চোখে-মুখে অনির্ব্বচনীয় ঔদাস্যের ছাপ আসিয়া পড়িল। রত্নার মুখের পানে চাহিয়া সে আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল।

গান শেষ হইল। পিয়ানোর রীড্‌গুলার উপর দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে রত্না কহিল, "কি ভাবচো?"

রত্নার পানে চাহিয়া অনিল শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রত্না কহিল, "ক্লাব থেকে ফিরতে এত দেরী যে আজ? ব্রীজের কম্‌পিটিসন চল্‌ছে বুঝি?"

অনিল কহিল, "হ্যাঁ।"

কল্পনা তোমায় ফোন করছিল। সেখানে কেন যাও নি? বললে, ছবির কথা তোমায় বলতে বলেছে।

অনিল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল, "সকালে গেছলুম, বলেছিলুম তো ছবি কাল পাবে—তবু ফোন কচ্ছিল।

রত্না কহিল, "কি ছবি? সে অত তাগাদা কচ্ছে—তাকে নিয়ে তুমি বুঝি ফটো তুলেছ?" রত্নার অধরে মৃদু হাসি।

অনিল কহিল, "আমার ফটো নয়। তুমি দেখ নি, ওদের শীকারের গ্রুপ।"

রত্না কহিল, "কই না, আমি তো দেখি নি।"

অনিল কহিল, "দেখো নি? তা তো জানতুম না। কল্পনা তারখানা এনলার্জ করতে আমায় দিয়েছিল, এসেছে। আচ্ছা, আন্‌ছি তোমায় দেখাচ্ছি।" বলিয়া অনিল উঠিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমিয়দের মৃগয়া অভিযানের আলোকচিত্র হাতে লইয়া অনিল ফিরিল। টেবলের উপর রাখিয়া কহিল, "বাঘটা মস্ত বড়। এখন আপশোষ হচ্ছে যাই নি বলে?

রত্না ফটোর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দুই চোখ যেন টর্চ লাইটের মত প্রদীপ্ত হইয়া আলোকচিত্রের উপর পড়িতে লাগিল। সমস্ত মুখ কেমন কঠিন হইয়া উঠিল!

নির্ণিমেষ নেত্রে রত্না দেখিতেছিল, শীকার উল্লাসে অমিয়র প্রদীপ্ত মুখ, তাহারই গা ঘেঁষিয়া কাঁধে হাত দিয়া হাস্যমুখী কল্পনা দাঁড়াইয়া আছে। এবং তাহাদের দু'পাশে অপরিচিত বিজয়ীবৃন্দের সামনে মৃত বাঘ।

রত্নার মুখ নীল হইয়া উঠিল। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল একটা তীব্র বিদ্বেষ। প্রচণ্ড ঈর্ষা! শিরায় শিরায় যেন অগ্নিপ্রবাহ বহিতে লাগিল। হত্যার পূর্ব্বে মানুষের যে ক্রোধ গর্জিয়া ওঠে, তেমনি ভীষণ ক্ষীপ্ততায় অন্তর যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কল্পনা!

কল্পনা! সর্ব্বদা এই কল্পনার বিজয়-কেতন উড়িতেছে। সমুদয়ের উপর যেন কল্পনার নাম অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

রত্নার মনে হইল, তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এমনি বিবর্ণ মুখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি তুলিয়া সে অনিলের দিকে চাহিল।

অনিল চমকিয়া উঠিল। রত্নার পাংশু-পাণ্ডুর মুখ—শোণিত-রাগহীন অধরপুট।

ত্বরিত-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "কি হলো?"

রত্না কোন কথা কহিতে পারিল না। কাঠ হইয়া রহিল।

অনিল ব্যস্ত ভাবে রত্নার কাঁধে হাত রাখিয়া বিচলিত স্বরে কহিল, "কি হলো রত্না? ও কি? তুমি কাঁদছ নাকি? কি হয়েছে?"

বহু দিন পূর্ব্বেকার কথা দপ্‌ করিয়া রত্নার স্মৃতিপথে ভাসিল। গোস্বামি-গৃহে তখন নূতন যাতায়াত করিত—অনিল লইয়া যাইত বলিয়া কল্পনা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। সেই অভিমানে রত্না কাঁদিয়াছিল, কিন্তু মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহার সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কল্পনা ঈর্ষায় কাতর—অনিলকে দেখিয়া হিংসায় সে জ্বলিয়া মরে। তাই দুঃখের মধ্যেও সুখ ছিল। কিন্তু আজ কল্পনা বিজয়িনী—আর রত্না?

একটি উচ্ছ্বসিত কান্না রত্নার কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিল। নিমেষে সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভালো মন্দ বোধ লুপ্ত হইল, হঠাৎ সে ঝাঁপাইয়া অনিলের বুকের উপর পড়িয়া দু'হাতে অনিলের কণ্ঠ ধরিয়া পাংশু ওষ্ঠাধর অনিলের দিকে তুলিয়া ধরিল।

কেন এমন করিল, ইহাতে কল্পনার উপর কি প্রতিশোধ লওয়া হইবে, বিকৃত মস্তিষ্কের মত কিছুই সে নির্ণয় করিতে পারিল না। টাইফয়েডের রোগী যেমন বিকারের ঘোরে কি করিতেছে, প্রলাপে কি

বলিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারে না, উষ্ণ মস্তিষ্কের একটা ঝোঁক তাহাকে চাপিয়া ধরে, রত্নার মানসিক অবস্থা ঠিক তেমনি।

পলকে অনিলের শিরায় যেন তপ্ত রক্তস্রোত বহিল। নিজেকে সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইল। এমনি নিবিড় স্পর্শ—তাহার মনে হইল, সে যেন যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কামনা করিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ দুর্জয় বাসনা তাহার বিবেক ভদ্রতা-বোধ সব লুপ্ত করিয়া মস্তিষ্কে আগুন জ্বালিয়া দিল। নিজের তপ্ত তৃষিত ওষ্ঠাধর রত্নার সেই শবের মত শোণিতলেশ-হীন মুখে স্থাপিত করিল।

কোন দিন যাহা হয় নাই—ভবিষ্যতে কোন দিন হয় তো হইতে পারিত না—এমনি একটি ক্ষণ, একটি মাত্র মুহূর্ত্ত, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাহার কালি সমগ্র জীবনে লেপিয়া যায়, মুছিবার জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়। সেই পলকপাতের ক্ষণে দু'টি নর-নারী কি জটিলতার আবর্ত্তে ডুবিল, কি দুরূহ অবস্থার যে সৃষ্টি করিল—দু'জনে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চেতন।

কল্পনার জ্বালা-ভরা কণ্ঠের ব্যঙ্গোক্তিতে চেতনা ফিরিল। কল্পনা কহিল, "চমৎকার! একেবারে সিনেমা-ষ্টুডিয়ো।"

তড়িৎস্পর্শের মত রত্না নিজেকে অনিলের বাহুমুক্ত করিয়া ঠিকরাইয়া এক পাশে সরিয়া গেল। অনিল বিমূঢ়ের মত কল্পনার পানে চাহিল।

কল্পনা যে সেই মুহূর্ত্তে ঘরে পা দিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দরজার নিকটে কার্পেটে দাঁড়াইয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।

অগ্নিচক্ষে চাহিয়া অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "এই রাসলীলার জন্যই বোধ করি মিষ্টার গোস্বামী শীকার-পার্টিতে যেতে পার্লে'ন না। এই জরুরী কাজ ছিল এখানে, না?" কল্পনার অধরপুটে শ্লেষের হাসি।

রত্না মাথা তুলিতে পারিল না। নতমুখে সে টেবলের কোণে নিঃশব্দে চেয়ারে বসিয়া রহিল।

মুখ তুলিল অনিল। ধীর কণ্ঠে কহিল, "যদি আমি সে জবাবদিহি না করি ?"

বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "নিশ্চয় করবে না—জবাবদিহির যদি কিছু না থাকে! কিন্তু মিষ্টার গোস্বামী, আমি জানতুম, এটা শ্রীবৃন্দাবন নয়। অবশ্য আপনি হলেন গোঁসাইজী!"

অনিলের সুগৌর মুখ নিমেষে রাঙা হইল। নিগূঢ় ক্রোধে ভিতরটা আগুনে পোড়া লোহার মত তপ্ত হইয়া উঠিল। কষ্টে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরেই সে কহিল, "মিস চ্যাটার্জির মনের সংশয় ঘুচলো তো। এবার আর বিবেচনার অসুবিধা হবে না বোধ করি।"

তিক্ত কণ্ঠে কল্পনা প্রত্যুত্তর করিল, "তা হবে না! এবং সেটা যথাযথ স্থানে, যথাভাবেই হবে।" বলিয়া কল্পনা রত্নার দিকে চাহিয়া কুটিল হাস্যে কহিল, "অসময়ে এসে বিঘ্ন উৎপাদন কল্লুম রত্না, আমায় মাপ করো।" বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রত্না এতক্ষণ পাষাণ-প্রতিমার মত নিস্পন্দ বসিয়াছিল; তাহার বুদ্ধি আড়ষ্ট, ক্ষণেকের জন্য সব অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দুর্জয় ক্রোধ লইয়া কল্পনা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেই দণ্ডে যেন লুপ্ত সম্বিত ফিরিয়া আসিল। পলকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের ন্যায় এক লহমায় তাহার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল, নিজের নিদারুণ লজ্জাকর ছবি। অতি-রুষ্ট কল্পনা এই মুহূর্ত্তে গিয়া গোস্বামি-দম্পতির গোচরীভূত করিবে এমন একটা জঘন্য কুৎসা—যাহা অতিরঞ্জন ও অসত্য হইলেও স্খালন করিতে রত্না কোন মতেই পারিবে না। এবং মিসেস্ গোস্বামীর ক্রোধের কথা ভাবিতে তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

আততায়ীর হাতে নিষ্কৃতি পাইতে মানুষ পলায়নে যেমন সমস্ত বন্ধুর পথই সহজ বোধে ছুটিয়া যায়, সেখানকার প্রতি পদবিক্ষেপে মৃত্যু-যন্ত্রণা সে যেমন মনে আনিতে পারে না, কেবল সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া খুঁজিতে থাকে অবরুদ্ধ প্রাণের মুক্তি, সে মুক্তির বিভীষিকা তখন তাহাকে চঞ্চল করে না, তেমনি করিয়া রত্না উঠিয়া অনিলের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আকুল স্পন্দনে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "তুমি যেমন করে পারো, আমায় এই দণ্ডে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! আমি ওদের সামনে বেরুতে পারবো না।"

হতভম্বের মত অনিল কহিল, "কি বলছো রত্না?"

"না, না, কোন কথা নয়! তুমি যেমন করে পার, আমাকে ঢেকে ফেলো! ওগো তোমার পায়ে পড়ি! না হয় আমায় বন্দুকের গুলীতে মেরে ফেল।"

অনিল এতক্ষণ পাষাণ-ক্ষোদিতের মত স্তব্ধ হইয়া রত্নার ক্রন্দন-বিবশা মূর্ত্তির পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়াছিল। সহসা রত্নার শেষ কথায় সুপ্ত আগ্নেয়-গিরির ঘুমভাঙার ন্যায় আকস্মিক প্রবল উত্তেজনায় জাগিয়া উঠিল।

অনিল কহিল, "তাই হবে রত্না।"

৪৪

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ব্যাপার কেহ ভাবিতে পারে নাই, অসম্ভবের চেয়েও যাহা অসম্ভব ছিল—এক নিমেষে ভোজবাজির মত তাহাই ঘটিয়া গেল। মিথ্যা সত্যের মুখোশ আঁটিয়া প্রকাশ পাইল।

এমনি হয়! অনন্ত-প্রবহমান কাল-স্রোতের বুকে একটি নিমেষ

এমনি কঠোর মূর্ত্তিতে উদিত হয়! তাহার বুকে মানুষের ভালো-মন্দ শিলালিপির মত যুগ যুগ ধরিয়া ভবিষ্যতের বিচারে গৌরব কিংবা গ্লানি অর্জ্জন করে।

রত্নাকে লইয়া অনিল যখন নিজের মোটরে উঠিল, তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চপলার পলক-বিকাশের মত একটি কথা মনে জাগিল। রহস্যচ্ছলে একদিন সে বলিয়াছিল, "চলো, নিরুদ্দেশে পাড়ি দিই।" আজ সেই পরিহাসকে অদৃশ্য-দেবতা এমন নিদারুণ সত্য করিয়া তুলিলেন, কে ভাবিয়াছিল!

অনিলের গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিতেছিল। আঁধার রাত্রে পথের নিশানা আলোগুলাকে পিছনে ফেলিতে ফেলিতে রেল লাইনের চিহ্ন দেখিয়া অনিল গাড়ী চালাইতেছিল। রত্না আজ গাড়ী চালাইবার জন্য উৎপাত করে নাই! পিছনের আসনে আচ্ছন্নের মত বসিয়া আছে—হঠাৎ দু'পাশের নিবিড় অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

নিস্পৃহ কণ্ঠে অনিল উত্তর দিল, "অজানার দেশে।"

রত্না নীরব রহিল। জড়তায় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শূন্যে দৃষ্টি মেলিয়া বিমূঢ়ের মত সে সীমাহীন অন্ধকার-রাশির পানে চাহিয়া রহিল। দু'জনের কেহই চিন্তা করিতে পারিল না, যে গৃহ তাহারা এইমাত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, দুর্য্যোগভরা তিমির-রাত্রে অশনি-পাতের মত সেখানে কি বিভ্রাটের সৃষ্টি হইতেছে!

কল্পনার অবমানিত চিত্তে প্রচণ্ড রাগ তাহাকে যেন হত্যার নেশায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

বিনা প্রশ্নে সে যখন চঞ্চল চরণে গোস্বামী সাহেবের কক্ষে প্রবেশ

করিল, তখন তাহার দীপ্ত-দৃষ্টি ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে ?"

পাগলের মত ক্ষিপ্ত চরণে কল্পনা গোস্বামী সাহেবের কাছে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া রুদ্ধ শ্বাসে কহিল, "আমি—আমি শুধু আপনার কাছে নালিশ জানাতে এসেছি।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কল্পনার রোষাগ্নি-রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "কি হয়েছে? বসো! বসো!" বলিয়া কল্পনার হাত ধরিয়া নিজের পাশে তিনি তাহাকে বসাইলেন।

কল্পনা হাঁপাইতেছিল। অনিলের আচরণ তাহাকে মর্ম্মাহত নয়, কশাহতের মত লাঞ্ছিত করিয়াছিল। সে আঘাত সে-ও ফিরাইয়া দিবে, এই নিদারুণ সঙ্কল্প লইয়া এ-ঘরে পা দিয়াছিল। নতুবা গোস্বামি-প্রাসাদের সকল সৌহার্দ্দ সে উচ্ছেদ করিবে! কল্পনার কাছে কৃত-কর্ম্মের জন্য অনিল যদি ক্ষমা চাহিতে লজ্জা প্রকাশ করিত, কিম্বা মিনতি করিত, অন্ততঃ অনুনয় করিত, তাহা হইলে সে এতখানি উগ্র হইত না। অনিলকে চরম দণ্ড দিতে হয় তো সে বদ্ধপরিকর হইত না। কিন্তু অনিল তার কিছুই করে নাই, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহারে কল্পনাকে অবহেলা করিয়াছে, যেন অতি নগণ্য তুচ্ছ সে! কল্পনা আজ তাহারই বোঝাপড়া করিবে।

মিসেস্ গোস্বামী বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "সত্যি ব্যাপার কি কল্পনা?"

কল্পনা কহিল, "ব্যাপার! মাসিমা, আপনি রত্নাকে ডেকে, মিষ্টার গোস্বামীকে ডেকে জিজ্ঞেসা করুন—শুনুন, তারা কি বলে!"

বিমূঢ় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "কি বলছো এ? তোমার হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বলো।"

সে কণ্ঠস্বরে কল্পনা এতটুকু দমিল না। সমান সাহসে সে কহিল,

"আমি হেঁয়ালি বলি নি মাসিমা। স্পষ্ট কথাই বলছি। আমার কথার দায়িত্ব আমি বুঝি—এইমাত্র আমি ড্রইংরুম থেকে আসচি—সেখানকার মানুষ দু'টি ভুলে গেছে যে, এটা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ী!"

গোস্বামী সাহেবের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

মিসেস্ গোস্বামী বিরক্তিভরে কহিলেন, "অনিল ফিরেছে?" তাঁহার কণ্ঠস্বর তিক্ত।

কল্পনার মনের মধ্যে তখন বোলতা-কামড়ানোর মত অসহ্য জালা ধরিয়াছে। ঈষৎ শ্লেষের সহিত সে কহিল, "অনেকক্ষণ। আমি তাদের বিভোর ভাবে ব্যাঘাত করে অনর্থ করে এসেছি।"

গোস্বামী সাহেবের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কি বলছো কল্পনা! কার সম্বন্ধে বলছো? জানো, রত্নার অভিভাবক আমি! সে আমার বন্ধুর মেয়ে।"

সপ্রতিভ কণ্ঠে কল্পনা উত্তর দিল, "খুব ভালো জানি! আরও বেশী জানি মিষ্টার গোস্বামীর আমি বাক্‌দত্তা। স্বচক্ষে আমি দেখে এসেছি তাদের আচরণ!"

গোস্বামী সাহেব হাঁক দিলেন, "বয়—"

বয় আসিয়া ফরমাস অপেক্ষায় দাঁড়াইল।

গোস্বামী সাহেব জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ছোটসাহেব, বোস মিসিবাবা।"

"বাহার গিয়া হুজুর।"

গোস্বামী সাহেব যেন বোমার মত ফাটিয়া গেলেন। কহিলেন, "দোনো বাহার গিয়া?"

বয় জানাইল, "জী।"

গোস্বামী সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কোন গাড়ী লিয়া? কি ধার গিয়া?"

"নেহি জানতা সাব! ছোটসাহাবকো গাড়ী লিয়া।"

"সোফার গিয়া?"

"নেহি সাব্!

মিসেস্ গোস্বামী পুতুলের মত চাহিয়াছিলেন। কোন অর্থই হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। শুধু কামান দাগার মত প্রত্যেকটি কথা তাঁহার শ্রুতিমূলে আসিয়া সমস্ত মনকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। বলিবার কহিবার সবই যেন তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে। বিসর্পিত অন্ধকার লইয়া কি কাল রাত্রি আসিল! ক্ষণপূর্ব্বে তিনি ইহার বিন্দুমাত্র আভাস পান নাই। স্বামীর দিকে হেলিয়া জীবন-অপরাহ্নের স্বপ্নচিত্র আঁকিতে বিভোর ছিলেন। কানে ভাসিয়া আসিতেছিল রত্নার সুমিষ্ট কণ্ঠের সুরলহরী।

গোস্বামী সাহের পত্নীর পাণ্ডুর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, "যাওয়ার অর্থ আমি কি বুঝবো? পালানো?" সুগভীর ঘৃণায় কাহারও নাম অবধি তিনি উচ্চারণ করিলেন না।

মিসেস্ গোস্বামী কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল কিন্তু কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না।

পত্নীর চোখের দিকে চাহিয়া তীব্র শ্লেষে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "কথাটা এখনো তুমি বিশ্বাস করছো না? না করবারই কথা! তুমি তার মা।"

স্বামীর এই কঠিন বিদ্রূপে মিসেস্ গোস্বামী উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সব কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন, শুধু মা বলিয়াই পুত্র সে সব কথার প্রতিবাদ তোলে নাই, স্বামীও নিরুত্তর ছিলেন। সাংঘাতিক অভিযোগে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। পত্নীর

অসহিষ্ণু মূর্ত্তির পানে শুধু তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখো, কথাগুলো যেন রত্নার কানে না ওঠে।"

এই একটি কথায় যেন গোস্বামী সাহেব তাঁহার সব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন! এমনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। মাতা ও পুত্রের বিরোধ মনোমালিন্যের উদ্দেশও তিনি রাখেন নাই। সেই তিনিই আজ বোমা-বিস্ফোরণের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছেন। মহারুদ্র যেন জটাজাল ছিন্ন করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন।

মিসেস্ গোস্বামী ভয়ে আতঙ্কে পলকে যেন পাথর হইয়া গেলেন।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বুঝেছি লীলা, কিছু বলা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে! আর সে কি ব্যবস্থা, তাও আমি জানি।"

গোস্বামী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস্ গোস্বামী চকিত স্বরে কহিলেন, "কি করবে?"

গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "এখন করবার বিশেষ কিছু নেই! এইটুকু শুধু করবো, যাতে তারা দূরে না পালাতে পারে।"

আকুল কণ্ঠে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্থাৎ?"

শ্লেষ-জড়িত হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "পুলিশের সাহায্য নেবো!"

ব্যাকুল হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "পুলিশ! পুলিশ কি করবে?"

দৃঢ় কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "করবে। পুলিশকে আমি এখনি ফোন্ করবো। তার গাড়ীর নম্বর দিয়ে বলবো দু'জনকে এ্যারেষ্ট করতে।"

গোস্বামী সাহেব পাশের ঘরে গিয়া ফোনের রিসিভার ধরিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "করছো কি! চারি দিকে ঢী ঢী পড়ে যাবে। উঁচু মাথা হেঁট হবে।"

কটু কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তবে কি করতে বলো তুমি?"

মিনতিতে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "তুমি তো জানো না, তারা সত্যি পালিয়েছে কি না!"

ব্যঙ্গ-হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তাই নাকি? তাহলে তোমার পরামর্শ?"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "পরামর্শ নয়। তারা যদি এখনি ফিরে আসে? হয় তো অনিল—"

প্রদীপ্ত কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "তার নাম করো না আমার সামনে!" ক্রোধে গোস্বামী সাহেবের ললাটের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল।

কঠোর কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "ফিরে আসে, নিজের হাতে তাকে গুলী করে মারবো কুকুরের মত। তার পর ফাঁশি যাবো! মানুষের কাছে মাথা নীচু করে থাকার দায় থেকে মুক্তি পাবো।"

মিসেস্ গোস্বামী জ্বলিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "ছেলেকেই শুধু দোষ দিয়ো না। তোমার বন্ধুর মেয়ে—তার বুঝি দোষ নেই? কি সাপই তুমি ঘরে এনেছিলে!"

গোস্বামী সাহেব হতবাক্ হইয়া ক্ষণকাল পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "তোমার যোগ্য উত্তর বটে! গরীব গৃহস্থঘরের একটা মেয়েকে তোমার হাতে মানুষ হতে দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, হাতে দিয়েছি, আমি নিশ্চিন্ত। তার চমৎকার পরিণাম হলো! ছি ছি লীলা, তুমি এমন কথা বলবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!"

মন্ত্রাভিভূত ভুজঙ্গিনী যেমন উদ্যত ফণা মাটিতে লুটাইয়া দেয়, লজ্জায় ধিক্কারে মিসেস্ গোস্বামী তেমনি ভাবে মাথা নীচু করিলেন, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না।

মা হইয়া গর্ভে যাহাকে ধরিয়াছেন, নিজের লাঞ্ছনার মধ্যেও সেই স্নেহনিধিকে শত বাহু-বিস্তারে বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিতে তিনি বাধ্য। রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই! সেখানে বিবেক নাই, ক্ষমা নাই, অধর্ম্ম নাই! বুঝি ভগবানের বিচারও নাই! আছে শুধু মায়ের বুকের উদ্বেলিত স্নেহ! সেই অক্ষয় কবচে স্নেহনিধিকে আবরিত করা মাতৃ-ধর্ম্ম! মায়ের চোখে বিশ্ব-সংসারের মান-অপমান তখন তুচ্ছ!

এতখানি ভর্ৎসনার পর মিসেস্ গোস্বামী কথা কহিলেন, এবং সে কথা ভীরু অনুনয় নয়! কহিলেন, "বিচার পরে করো। কিন্তু পুলিশকে কিছু জানাতে দেবো না!"

শ্লেষ-বিজড়িত স্বরে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "কি করবে?"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "এমন করে তো সে উপায় পাওয়া যায় না। এতে শুধু দু'টো অবুঝ প্রাণীর অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু হবে না।"

"তবে কি এখন চুপ করে থাকতে হবে?"

"হ্যাঁ, তাই। তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক জন মেয়ে তোমার হাতে রেখে গেছে; তোমার এ উত্তেজনা সেখানে কি সঙ্কটের সৃষ্টি করবে, সে দিক্‌টাও ভাবা উচিত।"

গোস্বামী সাহেব উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন স্ত্রীর পানে।

"এঁ কি, তুমি এত ঘামচো? কাঁপচো যে—শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো। কল্পনা—কল্পনা, ফ্যানের রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দাও।"

স্বামীর হাত ধরিয়া মিসেস্ গোস্বামী ত্বরিতে তাঁহাকে কাছে ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া দিলেন।

ফ্যানের রেগুলেটার বাড়াইয়া কল্পনা কহিল, "নার্ভস শক। ডাক্তারকে ফোন করি মাসিমা।"

৪৫

লছমন্ দু'মাসের বেশী ছুটী ভোগ করিতেছে। অমিয়কেও ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। সে দিন সকালে নূতন বেয়ারাকে ডাকিয়া অমিয় কহিল, "রামদীন, লছমনকো কহো, তিন রোজকা অন্দর কাম নেহি উঠানে নোকরী ছুট যায়েগা।" বলিয়া সে আদালতের পোষাক পরিতে লাগিল।

সে দিন একটা নারী-হরণের মকর্দ্দমার রায় দিবার কথা ছিল। সারা রাত ধরিয়া অমিয় সেই মকর্দ্দমার কথা চিন্তা করিয়াছে। মনে মনে যত বার আলোচনা করিয়াছে, মন তত বারই সায় দিয়া বলিয়াছে, কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থায় যদি এ দুষ্কৃতি নিবারণ করা না হয়, তবে এ মহাপাপ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইবে! মানুষের এই বর্ব্বরতা কঠিনতম শাস্তির দ্বারাই সমাজ হইতে দমিত—দূরীকৃত করা উচিত।

সরকারে তাহার সুনাম আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে অমিয়র মনের কোণে নূতন একটা দ্বিধা জাগিতেছিল। মন বলিতেছিল, জীবনটা কেবল মানুষকে দণ্ড দিতেই কাটিল! যে দিন সর্ব্বনিয়ন্তার কাছে তাহার নিজের বিচারের দিন আসিবে, সে দিন অমিয়র বুকের গোপন ভালোবাসা, অন্তরের সুগভীর পিপাসা, চিত্তের একান্ত লুকানো বাসনা তো সেই সর্ব্বদ্রষ্টার দৃষ্টির অগোচর থাকিবে না! কায়িক নয়;

শুধু মানসিক বলিয়া তিনি কি মনুষ্য জীবনের এই অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবেন ?

রত্নার মুখ মনে ফুটিয়া উঠিল। অমিয় ভাবিল, এত দিনে রত্না হয় তো তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। অমিয় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু বুকের বেদনা তবু ভারী হইয়া উঠিল।

অপরাহ্ণে কোর্ট হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে সে লাইব্রেরী-গৃহে প্রবেশ করিল। ক্লাবে যাইতে ইচ্ছা হইল না। ফাল্গুনের পুষ্পসুরভিত সন্ধ্যা মনে কেমন উদাসতা বহিয়া আনিতেছিল। উন্মনা চিত্তের বিনোদনের জন্য সে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে বসিল।

ক'দিন ধরিয়া মনে করিতেছিল, নূতন একখানা বই লিখিবে। এক ফিল্‌ম-ডিরেক্টর বন্ধু ক'খানা পত্রে জোর তাগিদ দিয়া সিনেমার জন্য বই চাহিয়াছে। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী নাটকের সে অভিনয় দেখিয়াছে; দেখিয়া গ্রন্থকারের সৃজনী-প্রতিভা বুঝিয়া বলিয়াছিল, হাকিমী গণ্ডীর বেড়ায় এত বড় প্রতিভা সে নষ্ট হইতে দিবে না।

পুস্তক-রচনায় অমিয মনোনিবেশ করিল। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া সরিয়া আজই মধ্যাহ্নে মকর্দ্দমার যে রায় দিয়াছে, মন সেই রায়ের মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইল।

পাঁচ জনে মিলিয়া কঠিন অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের দুষ্কৃতির তারতম্য এবং অপরাধের গুরুত্ব হিসাব করিয়াতিন জন অপরাধীকে—দুই জন সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবাকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া আসিয়াছে। অমিয়র আক্রোশ খুব বেশী হইয়াছিল, সেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবকদ্বয়ের উপর।

ঘটনা—অভাবগ্রস্ত গৃহের সুন্দরী তরুণীকে অর্থের বিনিময়ে তিনজন

নীচ ব্যক্তির সাহায্যে চুরি করিয়া আনিয়া প্রলোভনে তাহাকে বিপথ-গামিনী করা।

রায়ে অমিয় মন্তব্য করিয়াছিল, যাহারা ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্র সংসর্গে বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্জ্জনে ধনী গৃহের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাহারা যখন গোপনে এত বড় দুষ্কৃতি করে, এত বড় ষড়যন্ত্র-জাল সৃষ্টি করে, নিরীহ অবলার সর্ব্বনাশ-সাধনে মত্ত হয়, তখন বহু বারের দাগী চোর-ডাকাত বা খুনি-আসামীও নীচাশয়তায় তাহাদের সমতুল্য হয় না। সেই জন্যই এই অপরাধীদের পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত ক্ষমা-প্রার্থনা মঞ্জুর করা অসম্ভব! এ স্থলে ক্ষমা করার অর্থ আত্মছলনা! এই সব অপরাধীর সমুচিত শাস্তি প্রয়োজন।"

অমিয় এখন তাহার বিচার-বুদ্ধির সমর্থন করিল। সম্পদ বিভব-সম্মানে লালিত ভাবিয়া বিচার করিতে বসিয়া করুণা প্রদর্শন চরম অবিচার! সেই সুদর্শন-মূর্ত্তি দু'টির পানে চাহিয়া চিত্তকে কোমল করিলে বিশ্ব-বিচারকের কাছে সে অপরাধী হইত।

খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া অমিয় তার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের উপর মন দিল।

সকালের ডাকে-আসা চিঠি বেহারা আনিয়া টেবলের উপর রাখিল। জানাইল, দিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে।

"উল্লুককা মাফিক্ কাম্ কিয়া।" বলিয়া অমিয় পত্র তুলিয়া লইল।

খামের উপর মায়ের হস্তাক্ষর। ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিল। এবার চলিয়া আসিবার পর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, মা তাহাকে একখানাও চিঠি লেখেন নাই। যে ক'খানা চিঠি সে বাড়ী হইতে পাইয়াছে, তাহার কতকগুলা পিতার লেখা, বাকী সহোদরের।

অমিয় চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে দুই চোখ

দীপ্ত হইয়া উঠিল অক্ষরগুলা দৃষ্টিপথে যেন কালো সাপের মত বিসর্পিত হইয়া রহিল।

চশ্‌মা খুলিয়া ভালো করিয়া মুছিয়া আবার চোখে আঁটিয়া অমিয় পত্রখানা আবার পাঠ করিল। কিন্তু সেই একই ভাষা—একটি সাংঘাতিক অর্থ প্রকাশ করিতেছে! কোন মতেই আর তাহার বদল হয় না!

মা লিখিয়াছেন—কালসাপিনী রত্না তাহার গৃহে আসিয়াছিল—দুধ-কলা দিয়া তাহাকে তিনি পুষিয়াছিলেন; অনিল সেই ভুজঙ্গিনীর সহিত অন্তর্হিত! কাহারো উদ্দেশ নাই!

মায়ের পত্রে অমিয় আরও জানিল, পিতার ব্লাড্‌প্রেসার সেই কাল-রাত্রিতে অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়! এখন তিনি শয্যাশায়ী। চিকিৎসা চলিতেছে। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে কল্পনাই শুধু কাণ্ডারীর মত তাঁহার সকল কাজে সহায়তা করিতেছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাহারও কাছে তিনি নিজের কথা বলিতে পারেন না। কল্পনা বলে, অনিলকে আহ্বান করিয়া খবরের কাগজে একটি নোটিশ দেওয়া হোক! কিন্তু তাহা সমীচীন হইবে কি না? উচিত কি না? অমিয়র কাছে তিনি পরামর্শ চাহিয়াছেন।

চিঠি শেষ করিয়া অমিয় কিছুক্ষণ নিশ্চল রহিল।

অনিলের এমন দুর্ম্মতি? এ যে কল্পনাতীত! অনিল আবেগ-প্রিয়, চপল, সবই অমিয় জানে, তবু সে যে ভদ্র, তাহাতে অমিয়র এতটুকু সংশয় ছিল না। আজ বিচার-আসনে বসিয়া অমিয় যে দুরাচারদের শাস্তি দিয়াছে, নিজের ভাই তাহাদের চেয়ে কোন অংশে এতটুকু কম নয়—এ যেন অমিয় কোন মতে আর বলিতে পারে না!

অমিয়র মনে হইল, বুকে যেন জ্বলন্ত শূল বিঁধিয়াছে!

খানসামাকে অমিয় জানাইয়া দিল, আজ ডিনারে বসিবে না।

সকাল সকাল শয়ন-কক্ষে আসিয়া আলো নিবাইয়া অমিয় শুইয়া পড়িল।

বিনিদ্র রজনী! পিতামাতার বেদনাভরা মূর্ত্তি তার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল! অনিলের অধঃপতন ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মত মনে বিদ্ধ হইয়া মনকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট যে আর একটি প্রাণী আছে, তাহার মুখচ্ছবি, তাহার নামটুকু পর্য্যন্ত সে আর স্মরণে আনিতেছিল না! অথচ আজ সকালে ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে রত্নার মুখখানি শুধু স্মৃতিপথে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইয়া অমিয়কে আনমনা করিতেছিল। সে মোহপাশ হইতে মুক্তি পাইতে গৃহের সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, অতীতের সেই সুখময় দিনটিকে কবে কেমন করিয়া আবার ফিরিয়া পাইবে। সেখানে নিদাঘ-মধ্যাহ্নের জ্বালা নাই, শ্রাবণের কাজলা-মেঘ নাই, শরতের অম্লান আলোকোজ্জ্বল দিনের মত তাহার অন্তর-বাহির আলোকময়।

কিন্তু অকস্মাৎ কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা লইয়া রুদ্র যেন তাণ্ডবে মাতিয়া ধূম্রধূসর জটার তাড়নে দিক্‌বিদিক্ আঁধার করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সারা রাত্রি ধরিয়া অমিয়র মাথায় চিন্তার ঝড় বহিয়া চলিল। অস্থির চিত্তে বিছানায় কেবলই এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। রাত্রি-শেষে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় উষ্ণ মস্তিষ্কে শীতলতার স্পর্শ লাগিতেই বিমুখ চিত্তে সহসা রত্নার কথা জাগিয়া উঠিল! সেই প্রথম দিনের দেখা সলজ্জ রক্তিম মুখ, লজ্জানত দৃষ্টি লইয়া মনে দপ্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল, মনে জাগিল—শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের আশ্রয়ে স্নেহচ্ছায়ায় পিতা তাহার

গভীর বিশ্বাসে কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে কন্যার এই পরিণাম। তীব্র আলোক-দ্যুতিতে কাহার না চোখ ঝলসাইয়া যায়? জীবনে যে ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখে নাই, তরুণ যৌবন যখন মনে ভোগের স্পৃহা জাগাইয়া তোলে, সে সময় কে এমন দৃঢ়চেতা আছে যে, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে পদস্খলিত হয় না? হয় তো এমন করিয়া সে গড়াইয়া পড়িত না, যদি অমিয়র তরফ হইতে এতটুকু তাহার বাঁধন থাকিত। অমিয় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া—না থাক সে কথা।

প্রত্যূষে নিত্যকার মত অমিয় বেড়াইতে বাহির হইল। এবং সকালে ফিরিয়া যখন চায়ের টেবলের সম্মুখে বসিল তখন অকস্মাৎ সমস্ত তিক্ত চিন্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া মন প্রসন্ন হইল।

লছমন আসিয়া সেলাম জানাইয়া নত মস্তকে মনিবকে অভিবাদন করিল।

মানুষের শত ভাবনার মধ্যেও ব্যবহারিক জগতের এই দিকটা মানুষ কোন্ মতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষ নিজের প্রয়োজনগুলা পরের সাহায্য ব্যতীত কোন মতে মিটাইতে পারে না! জন্ম হইতে যাহাদের এ অভ্যাস অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া আছে, সেই পরমুখাপেক্ষী দলের নিকট যাহারা সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ অভাব মিটাইয়া সামান্য কাজে অনুক্ষণ শৃঙ্খলা আনিয়া দেয়, তাহারা যে কতখানি প্রিয় হয়, চিত্ত তাহাদের অভাবে যেমন বিরক্তি বোধ করে সম্মুখে পাইলে তেমনি উৎফুল্ল হয়।

সস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল, "ঘরমে আচ্ছি হ্যায়? সাদিওদি হো গিয়া?"

"হ্যাঁ জী।" বলিয়া লছমন্ কহিল, "ছোট সাহেবকো সাদি বি হো চুকা হুজুর?"

ভৃত্যের কথাটি মনিব অবধারণ করিতে না পারিয়া বিস্মিত নেত্রে তার পানে তাকাইল। এবং প্রশ্ন করিয়া পরিচয়ে যাহা জানিল, তাহার মর্ম্ম—

রায়পুরে লছমন্ তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। সেখানে সরকারের ডাক-বাংলার চাপরাশী তাহার নূতন সম্বন্ধী। তাহার অসুস্থতা-হেতু নূতন ভগ্নীপতি শ্যালকের তল্লাসীতে গিয়া ছোট সাহেব এবং বোস্ মিসিবাবাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া অমিয় সব কথা শুনিল। এবং নিজের যাহা জানিবার খুঁটীনাটী প্রশ্নে তাহাও একে একে জানিয়া লইল।

আদালতের পোষাক পরিয়া একখানা টেলিগ্রাম লইয়া অমিয় মাকে টেলিগ্রাম করিল—চিন্তার কারণ নাই, তাহারা আমার কাছে আছে। শীঘ্র দেখা করিব।

মোটরে উঠিয়া অমিয় সোফারকে আদেশ করিল, ষ্টেশন।

৪৬

সারা দিন যে-বৃষ্টি টিপ্ টিপ্ করিয়া দিনের আলোকে পাণ্ডুর করিয়া রাখিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারকে অসময়ে গাঢতর করিয়া সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর বুকে চাপিতে সে নামিয়া আসিল।

রুদ্ধ-বাতায়ন কক্ষে বসিয়া দু'টি নর-নারীর চোখে বাহিরের এই দুর্য্যোগের ভয়ে হৃদয়ের দুর্জ্জয়তা যেন অনেক বেশী করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল।

রত্না কহিল, "যদি আমায় বিয়ে করবে না তো এত দূরে আমায় নিয়ে এলে কেন ?"

রত্নার দুই চোখে অশ্রু উপছাইয়া পড়িল। কিন্তু আজ তাহার চোখের জলে অনিল আর্দ্র হইল না। স্থির চক্ষে রত্নার পানে চাহিয়া সে অবিচল রহিল।

অনিল কহিল, "আমি তোমায় বিয়ে করবো, এমন আশা দিয়ে আনি নি তো। কোন রকমে প্রলুব্ধ করেও তোমায় আনি নি। তুমিই পালাতে চেয়েছিলে, মুক্তি চেয়েছিলে রত্না!"

এমনি হয়! এমনি করিয়াই মন কঠিন নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। মন যখন বিবেকের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিতে থাকে, তখন সে ক্রমে এমনি কঠিন হইয়া ওঠে।

তাহা না হইলে, এই বান্ধবহীন নির্জ্জন প্রবাসে নিভৃত একটি কক্ষে নিশীথ রাত্রে মুখোমুখী দু'টি নর-নারী বসিয়া পরস্পরের দোষ-গুণ বিচারে বসিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝাভরা তিমির রাত্রে অভিশাপগ্রস্তের মত উভয়ের চিত্তই জ্বালাভরা দুঃখময়। সত্য ও সুস্পষ্ট উত্তরে একটা কঠিন শক্তি নিহিত থাকে; এক কথায় প্রকৃত চেহারা চোখের উপর উদ্ঘাটিত হয়!

অনিলের উত্তরে রত্নার বুকের মধ্যে রক্তের স্রোত নিমেষে হিম হইয়া গেল। অবিবাহিত একত্র জীবন-যাপনের কদর্য্য মূর্ত্তি আর কোথাও যেন এতটুকু আব্রু দিয়া নিজেকে গোপন রাখিল না! পাংশু মুখে নির্ব্বোধের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অনিলের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "কি বলছো তুমি?"

অনিল কহিল, "কিছু মিথ্যে বলি নি রত্না। তোমাকে বিবাহ করা নানা কারণে আমার পক্ষে অসম্ভব! আমাদের বর্ণ, সামাজিকতা এক নয়। আমার বাপ-মা—" কথা শেষ না করিয়া অনিল থামিল।

কিন্তু বর্শার সুতীক্ষ্ণ কঠিন ফলা যাহার মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হয়, মৃত্যুযাতনা সেই কাতর মুখেই সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করে। নির্ণিমেষ নয়নে অনিল

সেই শোণিত-লেশহীন পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি ভাবচো, আমি নির্দ্দয়—আমি নিষ্ঠুর?"

অকস্মাৎ রত্না গর্জ্জিয়া উঠিল। কহিল, "তার চেয়ে ঢের বেশী—তুমি আমায় হত্যা অবধি করতে পারো। এমনি নিষ্ঠুর! এমনি রাক্ষস! তোমায় এখন আমি ভাবচি।"

অনিল শিহরিয়া উঠিল। রত্নার মুখে এমন তীব্র ভর্ৎসনা, মর্ম্মান্তিক তিরস্কার কোন মুহূর্ত্তেই সে আশা করে নাই। বুকে দুর্জ্জয় ক্রোধ তরঙ্গিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িল।

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া অনিল কহিল, "আমি তোমায় হত্যা করতে পারি, এই কথা তুমি বলছো!"

দৃঢ় কণ্ঠে রত্না কহিল, "হ্যাঁ, বলছি—মানুষকে বিষ খাইয়ে মারা, গুলী করে মারা, তারই নাম শুধু হত্যা নয়! এই তিল তিল করে মারা, এ কি মরণ নয়? না, যে মারে, সে খুনী নয়? তুমি, তোমার সমাজ, তোমার বাপ-মা—কিন্তু আমারও সেটা আছে, তুমি ভুলে যাচ্ছো!" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় রত্না টেবলের উপর মুখ রাখিল।

অনিল স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার দৃপ্ত দৃষ্টি রত্নার পানে তুলিয়া সকরুণ হইয়া উঠিল। এবং এক সময়ে আসন ছাড়িয়া রত্নার কাছে গিয়া তাহার মাথা তুলিতে গেল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া রত্না মুখ তুলিল। তীব্র স্বরে কহিল, "না, না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না।"

আহতের মত অনিল দু'পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। শ্লেষের সহিত কহিল, "তোমায় ছুঁলে তোমার জাত যাবে! সে জ্ঞান তোমার আছে?"

অনিলের বিদ্রূপে রত্না অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পাইল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল! সত্যই ধর্ম্ম বলিতে স্ত্রীলোকের সব চেয়ে

যাহা শ্লাঘার বিষয় আদরের সামগ্রী, পুরুষের কাছে যাহা শ্রদ্ধার বস্তু! নারীর সেই সবচেয়ে বড় দিকটার কথা রত্না কোন দিনই ভাবিতে শেখে নাই! তাই অনায়াসে এত বড় আঘাত অপরে তাহাকে দিতে পারিল। মুখে ও-কথা বাধিল না। অথচ শুধু নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই না সেই মানুষকে অনুরোধ নয়, মিনতি করিয়াছিল—তাহাকে বিবাহ করিতে।

বাহিরে ঝন্‌ঝনা কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া গেল। রাত্রির মত্ততা যেন সীমাহীন হইয়া বিশ্ব প্লাবিত করিতে চাহিল।

রত্না নিথর! নিস্পন্দ! তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ, থামিয়া গিয়াছে।

অনিল ডাকিল, "রত্না!"

রত্না চাহিয়া দেখিল।

অনিল কহিল, "চলো, আরো দূর-দূরান্তে আমরা চলে যাই—সেখানে গিয়ে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবো।"

রত্না কহিল, "আরো দূরে? সে নির্ব্বান্ধব রাজ্য কোথায়? যেখানে আমাকে নির্ব্বাসন দিয়ে সুনাম নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, তোমাকে মুক্তি দেবো। এখন শুতে যাও!" বলিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে, মর্ম্মদাহে মানুষ যত উগ্র হইয়া উঠুক তবু স্বভাব-কোমল অন্তর ধীরে ধীরে অশ্রুজলে ভরিয়া যায়! আপনার সমস্ত ক্ষতি ভুলিয়া, বিমুখতা ভুলিয়া মর্ম্মান্তিক কাতরতায় বিহ্বল হইয়া পড়ে, অন্তরে মমতা জাগে।

অনিল ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। রত্না তাহাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিল; দু'দণ্ড ভাবিতে অবসর দিল না। তাহার পর সে

অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অনিলের মনের গোপন কোণে যে কলুষিত বাসনা পিপাসাতুর হইয়া উঠিল, হঠাৎ নৈরাশ্যে সে মর্ম্মাহত হইল। রত্না যেন অনিলের কাছে দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মত ফুটিয়া উঠিল। এবং যতই সে তাহার মর্ম্ম অবধারণের চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই সে উপলব্ধি করিল, ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে রত্না তাহার সহিত পলাইয়া আসিল। অনিলের জন্য রত্নার মর্ম্মে এক ফোঁটা ভালোবাসা নাই। চায় না সে অনিলকে। তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া যে-মানুষটি রহিয়াছে, তাহারই উপর প্রচণ্ড অভিমানে সে এমন একটা ভয়ানক ভুল করিয়া বসিয়াছে। এবং এই যে বিবাহের প্রস্তাব—এ শুধু একটা সুনাম রক্ষার বাসনা। নহিলে অনিলের উপর রত্নার এতটুকু স্পৃহা নাই।

মানুষ যখন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে একবিন্দু ভালোবাসা তাহার জন্য কোথাও সঞ্চিত নাই, তখন সেও কঠিন হইয়া ওঠে, নিক্তির মাপে বুঝিয়া লয় আপনার স্বার্থ। সেই জন্যই রত্নাকে বিবাহ করা অনিলের পক্ষে অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব!

কিন্তু তবু সেই রত্নার এ যে কত-বড় মর্ম্মান্তিক ভুলের অনুতাপ-অশ্রু, এটুকু বুঝিয়া অনিলের চিত্ত বিগলিত হইল!

স্নিগ্ধ স্বরে সে ডাকিল, "রত্না, আমরা দু'জনেই ভুল করেছি। কিন্তু—"

মুখ তুলিয়া ঘৃণিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "থাক! তোমার দেওয়া কোন মীমাংসার পথই আমি গ্রহণ করবো না।"

রত্নার এই অবজ্ঞা তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ন্যায় অনিলকে নিপীড়িত করিল, মর্ম্মাহত করিল! অকস্মাৎ বুকের মধ্যে রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। শ্লেষমিশ্রিত হাস্যে সে কহিল, "তাই না কি? আমি এত তুচ্ছ? কিন্তু আমার মাথায় এ আগুন কে জেলে দিয়েছিল? রত্না, তুমি!"

রত্না অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল।

উদ্দীপ্ত স্বরে অনিল বলিতে লাগিল, "স্বীকার করি তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ভালোও বাসতুম। কিন্তু প্রকাশ করতুম না! প্রকাশ করতে সাহস করি নি! কিন্তু আমি কি দেখি নি, আর একজনকে দেখে তুমি কি-রকম বিহ্বল হয়েছিলে! তাকে পাবার জন্যে কি তোমার সাধনা! আমি বুঝতে পারতুম, দাদার জন্য দিনে দিনে তুমি অধীর হয়ে উঠছ। তাই আস্তে আস্তে তোমাদের মাঝখান থেকে সরে যাচ্ছিলুম। পরস্পরকে তোমরা ভালোবেসেছ, বুঝেছিলুম। সরেও যাচ্ছিলুম, কিন্তু শেষে দাদাই তোমার জন্যে চলে গেল। কিন্তু তুমি? নিজে শান্ত হতে পাল্লে না, ঢুকলে অলকের আহ্বানে, থিয়েটার করতে। তাতেও বাধা দিই নি! তার পর এই বুকে তুমিই না এক দিন মাথা রেখে কেঁদেছিলে! এর মধ্যে ভুলে যাচ্ছ! আমার পায়ের উপর পড়েই তুমি মুক্তি চেয়েছিলে! কৈ, সে দিন তো ভাবো নি, আমি তোমায় হত্যাও করতে পারি। এত ঘৃণিত আমি! এত নীচ! আজ আমার উপর চাপাচ্ছ যে কলঙ্ক, এ সব সত্য?"

রত্নার মুখে একটা স্বরও বাহির হইল না। পাষাণ-প্রতিমার মত সে শুধু বসিয়া রহিল।

অনিল কহিল, "তোমার পথ এখনও খোলা আছে! তুমি ফিরতে পারবে। কিন্তু আমি? আমার বাবাকে আমি চিনি—হয় আমাকে জেলে যেতে হবে, না হয় আত্মহত্যা! কিন্তু মুখে চুণকালি মেখে জেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু আমার ঢের বাঞ্ছনীয়।"

চমকিয়া রত্না কহিল, "মৃত্যু!"

দৃঢ় স্বরে অনিল কহিল, "হ্যাঁ, মৃত্যু! এক দিন শীকার করে আনন্দ পেতুম। এখন সেই হাত দিয়ে গুলী চালাবো নিজের এই বুকে। এই

বুকেই তুমি মাথা রেখেছিলে! সে দিন তো এত শুচি-অশুচির জ্ঞান ছিল না!" বলিয়া বিদ্রূপের হাস্যে অনিল কহিল, "শীকার ধরতে চেয়েছিলে, না?"

রত্না চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, অনিল দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কহিল, "না রত্না, আর তোমায় কটু কথা বলবো না। আমিও পাগল হয়ে গেছি! আমার অবস্থাটাও এক বার ভেবে দেখো।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আমি শুতে চললুম। তুমি ভালো করে ভিতর থেকে দোর বন্ধ করে দাও।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অনিল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৪৭

অনিল উঠিয়া পাশের ঘরে শুইতে গেল। এক ঘরে দু'জনে রাত্রি-যাপন করে না। তবু তাহাদের মধ্যে মিথ্যা কলঙ্ক নিবিড় মসীময় হইয়া তাহাদের নামের উপর চিরকালের মত লেপিয়া গেল। এটুকু রত্না নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া রত্না আসিয়া শয্যায় বসিল। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে কোথায় পড়িয়াছিল, উত্তেজনার মুখে কোন কাজ করিতে নাই! তাহাতে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। সে বইখানার নাম ভুলিয়া গিয়াছে! কে লেখক, তা'ও মনে নাই। এই ক'টা লাইন শুধু রত্নার মনের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতে লাগিল।

আবেগের মুখেই সে শিশু-কাল হইতে পরিচালিত—তাহার অভ্যাস। বাধা দিবার কেহ ছিল না। মা রাগ করিলে বাপ বুঝাইতেন—মহাদেবের

কৃপায় যাহাকে পাইয়াছ, শাসনে তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়ো না। দেবতার ক্রোধ হইবে।

দর দর ধারে রত্নার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এবার দেশ হইতে আসিবার সময় মা তার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, রত্না, লক্ষ্মী মা আমার, একটি বারও ভুলিস্ নি, তুই আমাব পেটে জন্মেছিস্, তুই আমারি মেয়ে! মায়ের স্বরে কি গভীর কাকুতি!

সে দিন সে কথার মধ্যে এত বড় ইঙ্গিত ছিল, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত মায়ের চোখ সন্তানের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত চঞ্চল হইয়াছিল—তাই মা ও-কথা বলিয়াছিল। পিতা-পুত্রী বুঝিতে পারে নাই। বাপ শুধু বলিয়াছিল, বড়বৌ খালি ভাবো মেয়ে পর হলো—গোস্বামী সাহেবের ও পুষ্যি-মেয়ে হয়েছে! হাঃ হাঃ! তাও কি হয় কখনো? ওরে বাপু, এ তেল আর জল! আমার মেয়ে আমারই আছে! সেখানে শুধু বড়লোকের কাছে মানুষ হচ্ছে!

তাই! রত্না মানুষই হইতেছিল। মানুষ হইলও ভালো! উৎকট মনোবিকারে ক্ষিপ্তের যেমন হাসি ফোটে, রত্নার অধরে তেমনি অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটিল! অত্যধিক শিরঃপীড়ায় সকালে সে স্নান করিয়াছিল। সারাদিন কেশগুচ্ছের প্রসাধন করে নাই। সেই অবিন্যস্ত রুক্ষ চিকুরজাল এলায়িত হইয়া পিঠের উপর লুটাইতেছে; হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সেগুলাকে সরানো ছাড়া বেণীবন্ধের স্পৃহাও মনে জাগে নাই। এখন ক্রন্দন-রক্তিম নেত্রে মুখে এলায়িত কেশে তাহাকে দেখাইতেছিল যেন মূর্তিমান বিষাদ!

স্নেহময়ী জননীকে স্মরণ করিয়া রত্না মনে মনে শত বার বলিল, কেন তুমি এই অযোগ্য সন্তানকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে মা? দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বহুবার বলিল, তোমার সুন্দর হাতে এই

সুন্দর দেহ যদি রচনা করিয়াছিলে ঐ হাতেই কেন তবে তার ভাগ্য-লিপি এমন নির্ম্মম করিয়া লিখিয়াছিলে? কি কর্ম্মদোষে এমন বিড়ম্বনা তাহাকে সহিতে হইতেছে।

রত্না ভাবিতেছিল, এই তো উনিশ বছর বয়স, ইহার মধ্যে এই তিনটি দিনে মন যেন বার্দ্ধক্যে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেছে! সংসারে সকল ভোগের স্পৃহাতেই তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কেন? কেন? কে তাহার এমন নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘটাইল! কাহাকে সে দায়ী করিবে? অনিলের সঙ্গে রত্না বহু বাক-বিতণ্ডা, তর্ক, কলহ করিয়াছে। বিদ্রূপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনাও উভয় পক্ষে হইয়া গিয়াছে তবু কোন মতেই রত্না নিজের জন্য অনিলকে দায়ী করিতে পারিল না।

এবং এই নির্জ্জন রুদ্ধ কক্ষে বিচারে বসিয়া রত্না এ দুষ্কৃতির জন্য যে-ব্যক্তিকে মনে মনে দায়ী করিতে চাহিল, তাহার নাম স্মৃতিপথ হইতে সরাইতে চাহিতেছিল! এখন সে নাম মনে হইতে কাটা ঘা মাড়াইয়া দিবার মত মনে নিদারুণ জ্বালার সঞ্চার হইল। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য তাহাকে দোষী করিতে গিয়া চিত্ত শিহরিয়া উঠিল! তাহার কানে যখন রত্নার এই দুর্ম্মতি কলঙ্ক-কাহিনী গিয়া পৌছিবে, তখন সে রত্নাকে হীন ভাবিয়া কতখানি অবজ্ঞা করিবে! না, তাহার বুকে রত্নার জন্য ব্যথা বাজিবে? সমস্ত চিন্তাকে ডুবাইয়া সেই চিন্তাই অকস্মাৎ প্রবল হইয়া রত্নাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনিলের কথাও রত্না ভাবিতেছিল, তাহার কত বড় সর্ব্বনাশ রত্না করিয়া বসিল! অনিল নিজের বুকে হাত দিয়া বলিয়াছে, এখানে গুলী চালাইবে! রত্না শিহরিয়া উঠিল! হায় রে, এমন কোন দেবতা নাই, যে অনিলকে রক্ষা করে! বাস্তবিক সে নিরাপদ! রত্নার জন্যই তাহার এ দুর্গতি!

হঠাৎ রত্নার মনে হইল, অনিল আত্মহত্যা করিবে বলিল, রত্না তা পারে না? রত্না কাঁপিয়া উঠিল। মরণ সে কামনা করে। জগতে তাহার আশা করিবার, কামনা করিবার, চাহিবার সব কিছু ফুরাইয়াছে! এই দুর্নিবার লজ্জার বোঝা সে মৃত্যুর পায়ে নামাইতে চায়। তবু না, না, রত্না নিজের হাতে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারিবে না! সে দুঃসাহস হোক, ভীরুতা হোক, রত্না তাহা পারিবে না।

কিন্তু এই দুর্ভর জীবন লইয়াই বা কি করিবে? একটি একটি করিয়া রত্নার মানস-নেত্রে তার পরিচিতের দল আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া রুদ্ধ কপাটের গায়ে লাগিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। রত্নার কানে যেন আত্ম-পরিজনদের রূঢ় কটূক্তিগুলা ঐ মত্ত বায়ুর সহিত মিশিয়া কানে আসিয়া লাগিল!

বিভোর মনে রত্না বসিয়া রহিল। নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ যেমন কত কি শুনিতে পায় দেখিতে পায়, তেমনি তাহারই মধ্যে রত্না দেখিতেছিল হরিমতীর কোলে মাথা রাখিয়া সহাস্যে তাহার স্বামী বলিতেছে, "ইস্, তোমার সেই মেম-বোনের সঙ্গে মা আমার সম্বন্ধ করেছিলেন! ভাগ্যিস্ বিয়ে হয় নি! খুব বেঁচে গেছি।"

পরিহাসে হরিমতী বলিতেছে, "তবু তো সুন্দরী বৌ পেতে, আমার মত তো কালো নয়।"

বাহুপাশে হরিমতীকে বাঁধিয়া তাহার স্বামী বলিতেছে, "চাই না আমি অমন সুন্দর!"

রত্নার মুখ বেদনায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে যাহাদের চিরকাল কৃপার পাত্র ভাবিয়াছে, তাহারাই আজ তাহার নামে বাঁকা কটাক্ষে এমন কথা কহিতেছে। তাহাদের চোখে রত্না আজ কত ছোট!

ধ্যান-নিবিষ্টার মত রত্না দেখিতেছিল, তাহার দুর্মতিতে জননী

মৃতকল্পা, পিতা বিকৃত-মস্তিষ্ক। আকাশের অশনি-পাতে কেন তাহার মৃত্যু হইল না? দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাহাকার ক্রন্দনে রত্না লুটাইয়া পড়িল। তথাপি চিন্তার হাত হইতে—মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মত চিন্তার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ ছুটিয়া আসে। গোস্বামী সাহেবের দুর্জ্জয় ঘৃণা! মিসেস্ গোস্বামীর ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, কল্পনার বিনাইয়া বিনাইয়া সান্ত্বনা দেওয়া—সমস্তই যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অমিয়র কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কল্পনা কহিতেছে, রত্নার ঐ তো স্বভাব! আমি জানতুম! কল্পনার বলিবার ভঙ্গীটুকুও যেন রত্না দেখিতে পাইল।

বিছানা ছাড়িয়া পাগলের মত রত্না ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

কখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব-গগনে ঊষার মৃদু আলোকপাত হইয়াছে, রজনীর মত্ততা থামিয়াছে, মেঘের দল নীল গগনপ্রান্তে পাড়ি দিতেছে, তাহার কিছুই রত্না জানিল না। সে শুধু অস্থির চিত্তে পাদচারণে রত রহিল।

বাহিরে ডাক-বাংলার প্রাঙ্গণে সেই আলো-আঁধার-বিজড়িত প্রত্যূষে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। এবং তাহার মধ্য হইতে বর্ষাতিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা টুপী-মাথায় সাহেব-বেশী এক মনুষ্য-মূর্ত্তি অবতরণ করিল। সে ব্যক্তি সোজা ডাক-বাংলার সোপানশ্রেণী বাহিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং বাহির হইতেই রুদ্ধ একটী কপাটে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাক দিল, অনিল! অনিল!

ঘরের ভিতর অনিল বোধ করি জাগিয়াই ছিল। আহ্বানে সে কপাট খুলিয়া আগন্তুকের পানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

কোন ভূমিকা না করিয়া আগন্তুক কহিল, "রত্না? রত্না কৈ? তাকে ডাক—"

কোন উত্তর না দিয়া অনিল ঘরের বাহিরে আসিল এবং অন্য একটা বন্ধ-দ্বার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "রত্না ঐ ঘরে।"

আগন্তুক কহিল, "ও—তা বেশ, তুমি তৈরী হয়ে নাও! সাতটার গাড়ীতেই আমি তোমাদের নিয়ে ফিরতে চাই!" বলিয়া অনিলের প্রদর্শিত ঘরের কাছে আসিয়া দ্বারে টোকা মারিয়া কহিল, "রত্না, দরজা খোলো।"

দু'জনকে স্বতন্ত্র ঘরে দেখিয়া অমিয়র অন্তরে বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কিন্তু বাহিরে সে বিস্ময় এতটুকু প্রকাশ পাইল না! তাহার সুদৃঢ় মুখে, কণ্ঠের গম্ভীর স্বরে শুধু কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠিল।

অমিয়র আহ্বানে রুদ্ধ কপাট মুক্ত হইল না। ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়াও আসিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অমিয় দ্বারে আবার মৃদু করাঘাত করিল, এবং আদেশের ভঙ্গীতে কহিল, "দরজা খোলো রত্না।"

এবার রত্না আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে! এখন কম্পিত হাতে দ্বারের অর্গল মুক্ত করিল।

খিল খোলার শব্দে অমিয় কপাট ঠেলিল এবং মুক্ত দ্বার-পথে তখনি ঘরের মধ্যে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

খাটের পাশে বিছানার উপর হাত রাখিয়া রত্না দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এলায়িত চিকুর বাতাসে দুলিতেছে। অদৃশ্য তুলি হাতে আয়ত নেত্রকোণে কে যেন নিবিড় কালি লেপিয়া দিয়াছে। অবিরাম ক্রন্দনে আঁখিপল্লব স্ফীত! শ্বেত পলাশ দু'টি রক্তিম! রত্না যেন শুষ্ক ফুলের মত ম্লান!

জ্বলন্ত অনুশোচনা তীব্রতম গ্লানি যেন সে মুখে আঁকা রহিয়াছে! রত্নার চেহারা গভীরতম বেদনায় জমাট মূর্ত্তি বলিয়া নিমেষ দৃষ্টিপাতেই বুঝা যায়!

অমিয় দৃষ্টি ফিরাইল। কহিল, "আমি সাতটার ট্রেণে তোমাদের নিয়ে বাড়ী ফিরবো। হ্যাঁ, চট্ করে হাত মুখ ধুয়ে চুলটুল পরিষ্কার করে তৈরী হয়ে এসো। আমাদের চা করে দেবে! আমি তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছি! একটুও কুড়েমী করবে না।"

অমিয়র স্বরের শেষ দিকটা কেমন স্নিগ্ধ হইয়া গেল! নিজেই সে ইহাতে বিস্মিত হইল। এবং তাহার মধ্য হইতে নিঃশব্দে যে মমতা ঝরিয়া পড়িল, তাহা রত্নার চোখ দু'টিকে নিমেষে অশ্রুপ্লাবিত করিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দুর্নিবার ক্রন্দন-নিবারণে রত্না কাঠ হইয়া রহিল।

অমিয় আসিয়া চায়ের হুকুম দিয়াছিল। বাংলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া সে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন তাহার অনেক কাজ! অনেক ভাবনা! প্রথমে রত্নাকে পিতা-মাতার কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। যে সমাজে যে কুলে সে জন্মিয়াছে, তাহারই অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে জীবনকে সমর্পণ করিতে বলিবে। তাহাতেই শুধু রত্নার মঙ্গল। তার পর সহোদরের সমস্ত দুষ্কৃতি ঢাকিয়া জনক-জননীর বুকে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তার পর সে ফিরিয়া আসিবে নিজের কর্ম্মস্থলে; সেখানে শ্রান্ত চিত্তে অন্তরের জমা-খরচের খাতা খুলিয়া আর এক বার মিলাইবে। দেখিবে, রত্নার জন্য যে-জায়গা খালি পড়িয়া আছে, কি দিয়া তাহা পূরণ করা যায়!

পোষাক পরিয়া অনিল অগ্রজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয় তাহার ঈষৎ লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এসো! তেষ্টা যা পেয়েছে! কিন্তু রত্না কৈ? তাকে ডাকো। চা করবে।"

অনিল নত মুখে কহিল, "রত্নাকে তুমি নিয়ে যাও দাদা। আমায় বিশ্বাস করো, সত্য বলছি, রত্না নির্দোষ! শুধু মনের উত্তেজনায় আমার সঙ্গে সে চলে এসেছে! এই তার অপরাধ! তা ছাড়া আর কোন দোষে ও দোষী নয়।"

নিমেষে যেন অমিয়র বুকের বিশ-মণী পাথরখানা সরিয়া গেল।

কিন্তু ভ্রাতার মতই গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল, "তা হয় না অনিল, তাহলে ওর দুর্নাম ঘুচবে না। ওকে রক্ষা করবার জন্যই বাবার কাছে তোমায় যেতে হবে।" বলিয়া অমিয় হাঁক দিল, "রত্না! নাঃ, চিরকালের নিড়্‌বিড়ে স্বভাব আর তোমার সারলো না।"

অনিল অবাক হইয়া অগ্রজের মুখের পানে চাহিল। এমন শান্ত, এমন স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারিল না।

মন্থর পদবিক্ষেপে রত্না আসিয়া টেবলের নিকট দাঁড়াইল। অমিয় চাহিয়া দেখিল—তাহার কেশ-বেশ সমস্তই পরিচ্ছন্ন। প্রসাধন করিয়াছে! তৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া কহিল, "নাও, চট্ করে চা'টুকু করে লক্ষ্মীর মত আমাদের দিয়ে ফেল। আর পনেরো মিনিট বৈ সময় নেই রত্না।"

৪৮

যে পাঁচটা দিন রত্না গোস্বামি-গৃহে যাপন করিল, তাহার মধ্যে একটি বারও সে অমিয়র সহিত দেখা করে নাই! অধিকাংশ সময় নিজের ঘরে কাটাইত। এবং অমিয় যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, সে সময়ে সে ঘরের বাহিরে পা দিত না। পাছে অমিয়র সহিত চোখো-চোখি হইয়া যায়। এমনি দুর্নিবার লজ্জা তাহাকে অহরহ সঙ্কুচিত রাখিয়াছিল।

সে দিন সকালে অমিয় নিজে আসিয়া তাহার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইল এবং রত্নাকে ডাকিয়া কহিল, "আজ তোমায় দেশে নিয়ে যাবো রত্না—রেডী হয়ে থেকো! ভূষণকে বলে দিয়েছি গাড়ী বার করতে।" বলিয়া অমিয় প্রস্থান করিল।

রত্না দেওয়ালের এক পাশে নত মস্তকে মৌনমুখী দাঁড়াইয়াছিল—নীরব নিস্পন্দ।

লছমন আসিয়া যখন জানাইল হাকিম সাহেব সেলাম দিয়াছেন, তখন চোরের মত নিঃশব্দে সে আসিয়া দাঁড়াইল গোস্বামী সাহেবের ঘরের সামনে। ভিতরে পা দিবে কি না বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ঠিক সেই সময় বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়া অমিয় ঘরের সামনে আসিয়া রত্নাকে স্থাণুর মত দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "এসো। বাবা জেগে আছেন। ঘরে এসো।" বলিয়া দরজার পর্দ্দা সে তুলিয়া ধরিল।

"কে?" বলিয়া মুখ তুলিতেই মিসেস্ গোস্বামী দেখিলেন, অমিয় পর্দ্দা ঠেলিয়া রত্নাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

নত মুখে তিনি স্বামীর হরলিক্স্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গোস্বামী সাহেব বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সস্নেহ আহ্বানে ডাকিলেন, "রত্নাবলী মা—এসো।"

মমতা-সিক্ত কণ্ঠ—যেন নিদাঘের অগ্নি-ভরা দিনের শেষে সজল মেঘের স্নিগ্ধ কোমল ছায়া! এ ছায়ায় অন্তর-বাহির নিমেষে জুড়াইয়া যায়।

রত্না ত্বরিত পদে তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া বালিসের উপর স্থাপিত চরণযুগলে মাথা রাখিল।

"থাক্, থাক্ মা, হয়েছে! আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তোমার ভালো হবে।" গোস্বামী সাহেবের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি রত্নার

নমিত শিরে হাত রাখিলেন। কহিলেন, "যদি কখনো ইচ্ছে হয়, আমার কাছে যেয়ো।"

কথাটার মধ্যে কি উহ্য ইঙ্গিত রহিল, একমাত্র অমিয় ছাড়া আর কেহ বুঝিল না! অমিয় জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গোস্বামীকে প্রণাম করিতে তিনি কহিলেন, "এসো! অমিয় তোমায় নিয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া থামিয়া একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, "মাকে বাবাকে বলো, যত দূরেই থাকি বিয়ের চিঠি যেন পাই।"

ভূষণ গাড়ী আনিল। রত্না অমিয় ভিতরের আসনে বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

গাড়ী যখন তাহাদের গ্রামের সীমান্তে আসিল, তখন রত্না অমিয়র পানে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "আমার কলঙ্ক তুমিও বিশ্বাস করেছো?"

রত্নার দিকে একটু সরিয়া বসিয়া অমিয় তাহার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "না। এই তোমায় ছুঁয়ে আমি বলছি।"

বলিয়া থামিয়া হাতখানার উপর মৃদু চাপ দিয়া কহিল, "আমি সব শুনেছি রত্না, অনিল আমায় সব বলেছে। শীকার-পার্টির গ্রুপ-ছবিখানা তোমায় পাগল করে তুলেছিল! আমি শুনেছি।"

খপ্ করিয়া রত্নার মুখ দিয়া কেমন আপনা হইতে কথা বাহির হইল, "তুমি কল্পনাকে ভালোবাসো?"

সুদৃঢ় স্বরে অমিয় কহিল, "না। জীবনে আমি শুধু এক জনকে ভালোবেসেছি। এবং তাকেই ভালোবাসি।" বলিয়া রত্নার হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

তার পর ধীর-গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল, "তুমি ফিরে যাও রত্না। আমাদের সঙ্গে, সহরের সঙ্গে কোন সংস্রব তুমি রেখো না। এমন

করে নিজের মনের শান্তি হারিয়ো না। নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করো! তুমি তা পারবে।”

অমিয় থামিল। রত্নার মুখের উত্তর শুনিবার ইচ্ছা ছিল। রত্নার মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু সে মূকের মত নিঃশব্দে অমিয়র পানে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিল। অমিয় যেন নিমেষে রত্নার হৃদয়ের সুগভীর ভালোবাসা আর একবার সেই বৃহৎ কৃষ্ণ-তারকা দুইটির মধ্য দিয়া নূতন করিয়া দেখিতে পাইল! বুকে উদ্বেলন জাগিল।

কিন্তু চিরদিনের সংযত প্রকৃতি অমিয় মুহূর্ত্তে নিজেকে শান্ত করিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, “সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো হীনবৃত্তি খোঁজে না রত্না। যাকে ভালোবাসে, তাকে সে চায় বড় করে তুলতে। সেইখানেই তার গর্ব্ব। সেই তার গৌরব। তাতেই জাগে আনন্দ।”

অন্তরের দুর্জ্জয় বাসনাকে নিঃশব্দে দমন করিয়া রত্না নত হইয়া অমিয়র পদধূলি লইল।

রত্নার নির্দ্ধারিত পথে গাড়ী হাঁকাইয়া ভূষণ রমেশের গৃহ-দ্বারে পৌঁছিয়া মোটর থামাইল।

রমেশ বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। কন্যাকে দেখিয়া মাছ-তরকারী ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—“এঁ্যা, রত্না, তুই এমন সময়ে!”

রত্নার মনে পড়িল, এমনি প্রভাতে একদিন সে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল, মাকে প্রণাম করা অবধি হয় নাই! এমনি ছিল সে দিন মানুষ হইবার তাড়া!

পিতাকে প্রণাম করিয়া রত্না মৃদু স্বরে কহিল, “মাসিমার বড় ছেলে, —যিনি হাকিম।” বলিয়া সে মাতৃ-সন্ধানে চলিয়া গেল।

রমেশ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অমিয়র অভ্যর্থনায় মহা কলরব বাধাইলেন— “এসো, এসো বাবা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! এ আমি

ভাবতেও পারি নি, তুমি আসবে আমার বাড়ী ! এ কি কম কথা ! তা সত্য ভালো আছে ? কলেজ এখন বন্ধ ! তোমার কি ছুটি এখন ?"

একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন ! অমিয় বুঝিল উল্লাসে, বিস্ময়ে রমেশের সমস্ত কথা রমেশের মনের দ্বারে ভীড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে।

অমিয় উত্তর দিল, "বাবার অসুখ। তাই আমায় একে নিয়ে আসতে হ'ল।"

"এ্যাঁ, সত্যর অসুখ ? কি হয়েছে তার ! রত্না তো আমায় কিছু লেখে নি চিঠিতে ! আমি জানিও না ! নিশ্চয় তাহলে দেখ্‌তে যেতুম।"

অমিয় উত্তর দিল, "আমিও জানতুম না ! মা'র চিঠি পেয়ে ছুটি নিয়ে এলুম।"

অমিয়কে লইয়া রমেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। শুধাইলেন, "কি অসুখ ?"

"ব্লাড্‌প্রেসার ! হঠাৎ বড় বেড়ে গেছলো—আমরা ভয় পেয়েছিলুম। এখন অবশ্য ভালো আছেন। ডাক্তাররা বলেন, পরিশ্রম আর চলবে না ; প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়তে হবে। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অবসর নিতে হবে। আমাদের ইচ্ছে, প্র্যাক্‌টিস্ আর না করেন।"

অমিয়কে বসাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রমেশ কহিলেন, "তাই তো ! ভারী ভাবনার বিষয় ! মুস্কিল হলো বলো ! হ্যাঁ, তোমাকে চা দিতে বলি বাবা। ওরে রত্না, তোর অমিয়দার চা নিয়ে আয়। হ্যাঁ বাবা অমিয়, অনিল ভালো আছে ? ভারী সুন্দর ছেলে ! কি মিষ্টি ব্যবহার ! কি অমায়িক ! সে ভালো আছে ?"

সংক্ষেপে অমিয় কহিল, "আছে।" বলিয়া কহিল, "বাবাকে ডাক্তার চেঞ্জে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।"

"চেঞ্জে ! তা কোথায় যাওয়া হবে ? তাই বুঝি রত্নাকে নিয়ে

এলে! ওর কলেজ খোলা না থাকলে ওকেও আমি পাঠাতুম সত্যর সঙ্গে। সে মেয়ের মত রত্নাকে ভালোবাসে।”

অমিয় উত্তর দিল, “হ্যাঁ, বাবা উইলে রত্নাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। ওর বিয়ের জন্য! বাবা! শ্রীবৃন্দাবন যাচ্ছেন।”

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, “দশ হা-জা-র টাকা! এ্যাঁ! সত্য বৃন্দাবনে যাবে! কি বলছো বাবা?”

অমিয় হাসিল, কহিল, “প্র্যাকটিস্ যখন ছাড়তে হলো, বাবার ইচ্ছা সেইখানেই থাকেন। বলেন, আমার মাতামহ-মাতামহী শেষ জীবন তাঁদের ওই বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছেই কাটিয়েছিলেন! আমারো নাড়ীর টান বৃন্দাবনের দিকে!”

“তা বটে! তা বটে! আর ওখানকার জল-হাওয়াও ভালো। রক্তের টান নিশ্চয়। চাটুয্যে জেঠিরা পাকা বোষ্টম ছিলেন যে!”

জলখাবার লইয়া মণি ঘরে প্রবেশ করিল।

রমেশ কহিলেন, “তুমি! রত্না?”

“দিদি আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।”

“সে কি, তাকে ডেকে দাও।”

অমিয় ব্যস্ত হইল। কহিল, “থাক্! সে কথাবার্ত্তা কইছে।” বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া মণির নিকট হইতে চায়ের কাপ লইয়া জলখাবারের রেকাবীটা টানিয়া লইল। যেন এইগুলার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল! এবং খানিকটা খাবার গলাধঃকরণ করিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল, “দেখুন রমেশবাবু, আমার মনে হয়, রত্নাকে আর পড়াশোনা করবার প্রয়োজন নেই।”

রমেশ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

অমিয় বলিল, “বাবার সঙ্গে মা-ও যাচ্ছেন। অবশ্য আমার ছোট

ভাইয়ের বিয়ের পর তাঁরা যাবেন। তার আগেই আমি ফিরছি চাকরীতে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আমার কথা হচ্ছে—সব কাজের উদ্দেশ্য থাকে। আমি বলি, রত্না তো যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে, এবার মেয়েরা যা চায়—আপনি তাই করুন, ওর বিয়ে দিন। ওর মত মেয়ের সুপাত্রের অভাব হবে না।"

রমেশ যেন ধাঁধার মধ্যে পড়িলেন! কহিলেন, "তুমি খুব ভালো কথাই বলেছো। কিন্তু—"

অমিয়র খাওয়া শেষ হইয়াছিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তাছাড়া আপনাদেরও বয়স হ'ল, আর কোন সন্তান নেই! বারো মাস ওকে ছেড়ে থাকা কি উচিত?"

স্খলিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তা বটে! তুমি উঠছো অমিয় এর মধ্যে!"

"আজ্ঞে, আমাকে এখনি ফিরতে হবে।"

"রত্নাকে ডাকি। আঃ। তার হলো কি? আসে না কেন?"

রমেশ কন্যাকে ডাকিতে অন্দর-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হরিশের কনিষ্ঠ পুত্র টুকু আসিয়া অমিয়র হাতে এক টুকরা কাগজ দিল।

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল, "কি?"

"দিদি দিলে।"

বাক্যব্যয় না করিয়া অমিয় চিরকুটটি পকেটে পুরিল।

রমেশ বকাবকি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন, "কি বোকা মেয়ে, এমন সময় গেছে খুড়োর বাড়ী; হরিশ আপিস চলে যাবে, তাই দেখা করতে। কেন, সন্ধ্যে-বেলা গেলে হতো না?"

অমিয় হাসিল। কহিল, "দেখা তো হয়েছে। তার সঙ্গে তো একসঙ্গেই এলুম।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

অমিয় পকেট হইতে রত্নার চিরকুট্‌খানা বাহির করিল।

সম্ভাষণ-হীন কয়েকটি ছত্র—

"ভুলে যাওয়া যায় না। শিলালিপির মত যা বুকে ক্ষোদা হয়ে আছে, তা ভুলবো কি করে? না, ভুলতে আমি পারবো না। সে চেষ্টাও করবো না। মেশোমশায়ের কথার অর্থ এখন বুঝেছি।"

কাগজখানা পকেটে পূরিয়া একটা নিশ্বাস মোচনে মুখ তুলিতেই অমিয় দেখিল, একটা ঝোপের আড়ালে বেড়ার পাশে মুখ বাড়াইয়া রত্না তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমিয়কে দেখিয়া রত্না হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মাথা নাড়িয়া অমিয় নীরব সম্ভাষণ জানাইল।

হরিশের বাড়ী ফেলিয়া গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

৪৯

অমিয় ক'মাস কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

জননীর আহ্বান আসিল, অনিলের বিবাহ। তুমি এসো।

গোস্বামী সাহেবের নিকট হইতে সাড়া আসিল না।

অমিয় বিবাহের যৌতুক পাঠাইল। মাকে লিখিল, "বড্ড কাজ। ছুটি পাওয়া অসম্ভব। তাহাকে যেন ক্ষমা করা হয়।"

ভ্রাতার বিবাহে অমিয় উপস্থিত হইল না। সোদরকে লিখিল, "দুঃখ করো না অনিল, আমি আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।"

অমিয়র নূতন বই "বন-বিহগী" রূপালী পর্দ্দায় উঠিয়াছে।

ফিল্‌ম-ডিরেক্‌টর বন্ধু লিখিয়াছে—"ভায়া হে, হাকিমী করে যে খ্যাতি তুমি পাও নি, বায়োস্কোপে বই দিয়ে তার অনেক বেশী পেয়েছ। হাউস-ফুল! মানুষের মুখে মুখে তোমার নাম ঘুরছে। এক বার নিজে এসে দেখে যাও তোমার "বন-বিহগী"কে। হ্যাঁ, বহুমুখী প্রতিভা বটে!

কিন্তু সকল কর্ম্মের শেষে বিশ্রামের জন্য রাত্রে যখন উপাধানে অমিয় মাথা রাখে, তখন কত দিন বন-বিহগীর স্মৃতি তাহার আঁখিপল্লবকে সিক্ত করে। বুক-জোড়া হাহাকার ওঠে—রত্না! রত্না!

পিতা পত্র লিখিয়াছেন—অমিয়, জীবনে এক নূতন আস্বাদ পাচ্ছি, বড় মধুর! নিবিড় আনন্দময়! বৃন্দাবনের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক। পারো তো ছুটিতে এসো।

অমিয় বোঝে তাহার অন্তরের কথা, অন্তর্যামীর মত পিতা যেন জ্ঞান-চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন! তাহার ওষ্ঠাধরে বেদনার হাসি ফোটে।

পিতাকে অমিয় লিখিল, "অনেক কাজ। ছুটি মিলিবে না। অবসর পাইলে নিশ্চয় যাইব।"

চিঠি লেখা শেষ করিয়া অমিয় মুখ তুলিয়া চাহিল, খোলা বাতায়ন-পথে আসন্ন সন্ধ্যার অস্তমান রাঙা রবির পানে। চাহিতেই অমিয়র মনে জাগিয়া উঠিল, পল্লীগৃহে তুলসী-বেদীমূলে সন্ধ্যাদীপ জালিয়া রত্না হয় তো দেবতাকে প্রণাম করিতেছে!

অমিয় ভাবিতে চেষ্টা করিল, দেবতার কাছে সে কি প্রার্থনা করিতেছে? হৃদয়ের শান্তি? অমিয়কে ভুলিবার কামনা? না জন্মান্তরে অমিয়কে পাইবার বাসনায় দেবতাকে মিনতি জানাইতেছে?

কেন এমন হয়? যাহার সহিত মিলন হইবার নয়, অবাধ্য হৃদয় সেই দুষ্প্রাপ্যকে কেন কামনা করিয়া বসে? সে কেন হইয়া ওঠে অভীপ্সিত? ইহার কি উত্তর আছে?

হৃদয়-জোড়া নিশ্বাস উত্থিত হইল। অমিয় জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় রহিল। রত্না! রত্নাকেই চাই! সে-ই অমিয়র একমাত্র অভীপ্সিতা! একটা জন্মের ব্যবধান বৈ তো নয়!

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬